সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত

গুন্টার গ্রাস

বিড়াল ও ইঁদুর

বিড়াল ও ইঁদুর

বিড়াল ও ইঁদুর

গুন্টার গ্রাস

অনুবাদ

বুদ্ধদেব চক্রবর্তী

আনন্দ

এক

আরও একবারের কথা—

তখন আমাদের সবার প্রিয় বন্ধু মালকে সবেমাত্র সাঁতার কাটা শিখেছে, সেই সময়কার একটি সুন্দর গ্রীষ্মের দিনে, আমরা ক'জন বন্ধু আড়াআড়ি হয়ে অলসভাবে আমাদের খেলার মাঠের নরম সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। আমার যদিও ডেন্টিস্টের কাছে যাওয়ার কথা, কিন্তু যেহেতু আমার বিকল্প কোনও খেলোয়াড় পাওয়া মুশকিল, তাই বন্ধুরা আমাকে কোনওমতেই ডাক্তারের কাছে যেতে দিল না। অথচ এদিকে আমার দাঁতগুলি যন্ত্রণায় বলা যায় প্রায় কান্নাকাটি করতে শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে একটি বিড়াল মাঠের ওপর কোনাকুনি ভাবে আপন মনে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, কেউ তাকে ইটপাটকেল ছুড়ে বা অন্য কোনওভাবে বিরক্ত করছে না। বন্ধুদের কেউ কেউ মাঠের ঘাসের ওপরে আরাম করে শুয়ে ঘাসের গোড়া ছিঁড়ে মুখে পুরে চিবোচ্ছে।

বেড়ালটির মালিক হলেন সমগ্র খেলাধুলার অঞ্চলটির তত্ত্বাবধায়ক মশাই স্বয়ং আর বেড়ালটির গায়ের রং একেবারে মিশমিশে কালো।

একটি ছেঁড়া উলের মোজা দিয়ে আমাদের বন্ধু হটন সোনটাগ তার খেলার ব্যাটটি মন দিয়ে পালিশ করছে। আমার দাঁতের যন্ত্রণা আবার সজাগ হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে প্রতিযোগিতার একটি খেলাও শুরু হয়ে গেল আর প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের মতো চলল। আমরা গো-হারান হারলাম আর প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে আবার পরের মোলাকাতের অপেক্ষায় রইলাম।

বিড়াল প্রসঙ্গ: বিড়ালটির বয়স কম হলেও দেখতে কিন্তু মোটেই ছোট্ট বিড়ালছানাটির মতো নয়।

ওদিকে মাঠে খেলাও চলছে। বলটি ক্রমাগত মাঠের দুই প্রান্তের এ গোলে

~ www.amarboi.com ~
আর ও গোলে যাওয়া-আসা করেই চলেছে। আমার দাঁতগুলি তাদের ব্যথার পুনরাবৃত্তি করে আমাকে জানান দিচ্ছে। ওদিকে মাঠের ট্রাকে খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ কেউ কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও, অন্য অনেকেই তাদের অনুশীলনের কাজ যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছে। বিড়ালটি ইতিমধ্যে তার চলার রাস্তাটি পালটে ফেলেছে।

ওপরের আকাশে একটি ছোট তিন-মোটরি উড়োজাহাজ বেশ জোর আওয়াজ ছাড়তে ছাড়তে, ধীর গতিতে উড়ে চলেছে, যদিও এই আওয়াজ আমার দাঁতের ব্যথার আওয়াজকে মোটেই ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। ওদিকে তত্ত্বাবধায়ক মশায়ের কালো বিড়ালটি ঘাসের জঙ্গলের ভিতর থেকে কী একটা সাদা রঙের শিশুদের ছেঁড়া পোশাকের অংশ খুঁজে বার করে, তা নিয়ে খেলা করে সবাইকে মজা করে দেখাচ্ছে।

পুব দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস বইছে আর তারই মধ্যে কবরখানা ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাঝখানে অবস্থিত ক্রেমাটরিয়ামটি তার কাজ ঠিকঠাক করে চলেছে। খেলার শিক্ষক মালেনব্রান্ট মশাই হুইসিল বাজালেন, সাইড চেঞ্জ করো। বিড়াল মহাশয় তাঁর ব্যায়াম অনুশীলন যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছে। মালকে হয় ঘুমোচ্ছে কিংবা ঘুমের ভান করে শুয়ে আছে। আর তার পাশে আমি, এই বেচারা আমি, দাঁতের ব্যথা নিয়ে বসে। বিড়ালটি আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মালকের কণ্ঠনালিটি ছিল আকারে বেশ বড় আর ক্রমাগত গতিশীল।

সেটি বিড়ালটির কাছে বেশ আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠল। আমি, মালকে ও বিড়ালটি এই তিনজন, একটি ত্রিভুজের আকারে বসে আছি। আমার ও মালকের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে বিড়ালটি একটি শিকারি-লাফ মারার জন্যে তৈরি হতে লাগল। মালকের কণ্ঠনালিটি ইতিমধ্যে বিড়ালটির কাছে একটি জীবন্ত ইঁদুরের স্থান নিয়েছে। আর এইসব ব্যাপারস্যাপার দেখে বোধকরি আমার দাঁতগুলি যন্ত্রণাও আপনা আপনি কিছুটা শান্ত হয়ে এল।

একদিকে কমবয়সি দুরন্ত সাহসী বিড়াল আর অন্যদিকে মালকের গতিশীল কণ্ঠনালি, আর যায় কোথায়! বিড়াল লাফ দিলে মালকের গলা বরাবর। আমরাও এই খেলায় যোগ দিলাম; আমাদের মধ্যেই কেউ একজন বেড়ালটি তুলে মালকের গলার কাছে ধরল। আমিও দাঁতের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে বিড়ালকে চেপে ধরে মালকের গলার সামনে তুলে তার প্রিয় ইঁদুরটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দেখাতে লাগলাম। বেড়ালটি মনে হয় মালকের গায়ে একটা সামান্য মাত্র আঁচড় দিল, ব্যাস—আর দেখতে হল না। এতেই মালকে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিল।

আমি বলি: ভাই মালকে, আমাকে, এই হতভাগ্য আমাকেই, যে তোমার চলমান কণ্ঠনালির সঙ্গে বিড়ালটির পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, এখন সেই আমাকেই সব কিছু লিখে রাখতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা দু'জনেই হয়তো কোনও না কোনওভাবে আবিষ্কৃত হয়েছি, তা সত্ত্বেও আমাকেই, হ্যাঁ আমাকেই লিখে রাখতে হবে সব। অথচ অন্য কেউ একজন পিছন থেকে চাবিকাঠি নাড়াচ্ছে, আমার ওপর চাপ দিচ্ছে মালকের কণ্ঠনালি-ইঁদুর আর কালো বিড়ালের লাফালাফি ও হারজিতের খেলাটি সর্বত্র দেখিয়ে বেড়ানোর জন্যে।

অগত্যা আমাকে এই কাজ শুরু করতে হল; প্রথমে একটা স্ক্রুড্রাইভার উঁচু করে হাতে ধরলাম , বিড়ালকে শেখালাম তার ওপর লাফিয়ে উঠতে আর পড়তে। তারপরে একটা মরা মোটাসোটা গাংচিল পাখি অশান্ত ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে উঁচু করে ধরে, মালকের মাথার কিছুটা ওপরে ছুড়ে দিলাম। এখনকার এইসব ঘটনা যেখানে ঘটছিল সেই অঞ্চলটি ছিল, জলে ডুবে থাকা এক পুরনো যুদ্ধজাহাজের নোঙর-বাঁধার যন্ত্রটির কাছাকাছি কোনও এক স্থান।

এদিকে, জলের মধ্যে অনেকক্ষণ থাকার ফলে মালকের সারা শরীরের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত মিহি ও মোটাদানার বালি মেশানো জল, সুতোর আকারে ঝরে পড়তে লাগল। বহুক্ষণ সমুদ্রের জলের মধ্যে থাকার দরুন তার শরীরে হালকা কাঁপুনি দিচ্ছে, যদিও ব্যাপারটা সেরকম ভয়ের ছিল না। এমনকী ঝরন্ত জল তার শরীরটাকে বেশ কিছুটা মসৃণও করে দিয়েছে।

আসলে আমরা, যারা তাদের ক্লান্ত, দুর্বল শরীরে, অলসভাবে হাত ঝুলিয়ে জলের উপরে জেগে থাকা ভাঙা সেতুর অংশটির ওপরে বসে ছিলাম, তাদের মধ্যে কেউই মালককে বলিনি, ডুব দিয়ে জলে ডুবে থাকা মাইন-সুইপার বা তার লাগোয়া ইঞ্জিন-ঘরে প্রবেশ করতে। কেউ তাকে মোটেই অনুরোধ করেনি সেখান থেকে কিছু জিনিসপত্র, যেমন কিছু স্ক্রু, ইস্পাতের ছোট চাকা, বিশেষ আকর্ষণীয় কোনও জিনিস, কিংবা একটা পিতলের প্লেট যার ওপর পোলিশ বা ইংরেজি ভাষায় কোনও এক বিশেষ মেশিন চালানোর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নিয়মাবলি খোদাই করা আছে, এরকম কিছু নিয়ে আসার জন্যে।

সাইকা নামের একটি মাইন-সুইপার-এর বেশিরভাগ অংশটাই ডুবে আছে, আর যেটুকু অংশ জলের ওপর জেগে তার ওপরেই এখন আমরা ক'জন বসে আছি। পোলান্ডের গাডিয়েনা অঞ্চলে তৈরি এই মাইন-সুইপারটি প্রথমে যাত্রা করেছিল মোডলিন বন্দরের দিকে, আর তারপরে বছর খানেক আগে, বন্দরের দক্ষিণ-পুব অঞ্চলে যুদ্ধের সময়ে ডুবে যায়। জাহাজ চলাচলের পথের বেশ কিছুটা দূরে ডুবে যাওয়ার ফলে অন্য জাহাজ যাতায়াতের ব্যাপারে ডুবন্ত সুইপারটি কোনও বাধা সৃষ্টি করেনি।

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেল মাইন-সুইপারটির কাছাকাছি পাইলট-হাউসের ওপরে উড়ন্ত গাংচিলদের বিষ্ঠা নিক্ষেপের কাজ। সব ধরনের আবহাওয়াতেই এই গাংচিলগুলি অতি সহজভাবে, তাদের মুক্তোর মতো চোখগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারিদিক লক্ষ করতে করতে, পাইলট-হাউসটির ঠিক ওপর দিয়ে উড়তে থাকে, আর পুরোপুরি উড়ন্ত অবস্থাতেই এক অতি আশ্চর্য কৌশলে তাদের বিষ্ঠা নিক্ষেপের কাজটি এমন ভাবে সেরে ফেলে যে কখনওই সেই সাদা রঙের হড়হড়ে বস্তুটি জলে কিংবা অন্য কোথাও না পড়ে ঠিক সুইপারটির মরচে-ধরা রেলিংটির ওপরেই পড়ে। এই বিষ্ঠাবিন্দু কখনও সারিভাবে পাশাপাশি, কখনও আবার একটার ওপরে আর একটা জমা হয়ে এক কঠিন, মজবুত সাদা চুনের মতো বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আর আমরা যখনই এই কঠিন সাদা বস্তুটি আমাদের হাত ও পায়ের নখ দিয়ে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করি ঠিক তখনই নিয়ম করে আমাদের মাথার ওপরে এই বিষ্ঠা নিক্ষেপের কর্মটি সমানে চলতে থাকে।

যদিও সমুদ্রের জলে রোজ স্নান করার ফলে মালকের হাতের নখগুলি কিছুটা হলুদ হয়ে গেলেও, আমাদের মধ্যে একমাত্র তার হাতের নখগুলিই ছিল লম্বা আর বেশ মজবুত। কারণ সে তার নখগুলি কখনও আমাদের মতো দাঁত দিয়ে কাটেনি কিংবা তা দিয়ে সামুদ্রিক গাংচিলের পায়খানাও পরিষ্কার করেনি। এ ছাড়া সে-ই একমাত্র মানুষ যে কখনও গাংচিলের শুকনো পায়খানা মুখে দেয়নি। আর অন্য দিকে, যেহেতু এই সাদা শুকনো বস্তুটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত, তাই আমরা প্রায় সবাই মজা করে ওই শুকনো পাথুরে ঢেলাগুলি অনায়াসে চিবোতাম আর তারপরে মুখের মধ্যে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বড় আকারের কুণ্ডলী পাকিয়ে সজোরে নৌকোর ওপরে ছুড়ে দিতাম। ওই বস্তুটির স্বাদ-গন্ধ বলতে কিছুই ছিল না। না প্লাস্টারের স্বাদ, না মাছের কিংবা কোনও যুবতী মেয়ের শরীরের আনন্দ-সুখের গন্ধ অথবা প্রেমময় ঈশ্বরের গন্ধের কিছু স্বাদ-গন্ধের চিহ্ন, কোনও কিছুরই নয়। উইল্টার নামে আমাদের এক বন্ধু, যে ভাল গান করতে পারত, একদিন সবাইকে বলল, ওরে শোন, তোরা কি জানিস যে চড়া পরদার গলার পুরুষ গায়কেরা নিয়মিত গাংচিলের শুকনো পায়খানা খায়।

গাংচিলগুলি আমাদের মুখ থেকে ছোড়া থুতুর কুণ্ডলীগুলি কিছু না বুঝেশুনেই প্রায়ই মুখে পুরে দিত।

যুদ্ধ আরম্ভের ঠিক পরেই, ইওয়াখিম মালকে যখন চোদ্দো বছরে পা দিয়েছিল তখন সে না জানত সাঁতার কাটা, না জানত সাইকেল চালানো। তার মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু গুণই কারও চোখে পড়েনি, এমনকী তার গলার কণ্ঠনালিটিও, যা পরে বেড়ালটিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে, সেটিও সেই সময়ে কারও দৃষ্টিগোচর হয়নি। চালাকি করে সে ডাক্তারের কাছ থেকে শারীরিক অসুস্থতার সারটিফিকেট জোগাড় করে, এবং তা স্কুলে দাখিল করে সাঁতার কাটা ও জিমনাসটিকের ক্লাস থেকে রেহাইয়ের ব্যবস্থা করে ফেলে।

মালকে তার লাল হয়ে যাওয়া দুটি খাড়া কানওলা বিদঘুটে চেহারায়, একগুঁয়ের মতো বাঁকা পায়ে প্যাডেল করতে করতে সাইকেল চালানো শেখার অনেক আগেই শীতকালে নিডারস্টাট শহরে সাঁতার শেখার জন্যে আবেদন করে। সাঁতার শেখার অনুমোদন সে পায় বটে, কিন্তু তা শুধুমাত্র আট-দশ বছরের বাচ্চাদের সঙ্গে জলের বাইরে শুকনো ডাঙায় সাঁতারের প্রস্তুতি অনুশীলন করার।

শীত গড়িয়ে গ্রীষ্মকাল এসে গেল। মালকে সাঁতার শেখায় তেমন কিছু উন্নতি করে উঠতে পারল না। আনস্টাল্ট ব্রোয়েসেনে সাঁতারের পুলের এক বেশ কড়া মেজাজের সাঁতার শিক্ষক সরু লিকলিকে লোমহীন পায়ের ওপরে সাঁতারের পোশাক পরা মালকেকে আদৌ জলে নামানোর আগে শুধু পাড়ের বালিতে দাঁড়িয়ে ওঠানামা করতে শেখাল মাত্র।

কিন্তু তারপরে, আমরা যখন দিনের পর দিন সবাই মিলে সারি দিয়ে তার চোখের সামনে ডুব-সাঁতার দিতে লাগলাম, সাঁতার থেকে ফিরে এসে ডুবন্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মাইন-সুইপারটির ওপরে শুরু করে দিলাম নানান ধরনের বানানো গাল-গল্প তাকে শোনাতে। আর আমাদের এসব বানানো গল্প শুনে সে এতই উৎসাহ পেল, যে মাত্র দু'সপ্তাহর মধ্যেই বেশ ভালমতো সাঁতার শিখে সে আমাদের সবাইকে রীতিমতো তাজ্জব বানিয়ে দিল। মনপ্রাণ আর শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে জলে ঝাঁপ দেওয়ার সিঁড়ি থেকে স্নানের বিচ পর্যন্ত লম্বা পথটি, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে সাঁতার কেটে এপার-ওপার করে ফেলল।

আর সে আমাদের সকলকে প্রমাণ করে দেখাল যে, ইতিমধ্যে সে নিঃসন্দেহে সাঁতার ও ডুব-সাঁতারে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠেছে। সে ডুব দিয়ে তলা থেকে কিছু সামুদ্রিক শামুক আর তারপরে বালি ও জল-ভরা একটি বিয়ারের বোতল তুলে আনল। বোতলটি সজোরে ওপরে ছুড়ে দিয়ে আমাদের সবাইকে হতবাক করে দিল। আমাদের ধারণা হল তার পক্ষে এখন বেশ সহজেই এই ধরনের অনেক বোতলই ডুব দিয়ে তুলে আনা সম্ভব। দেখতে দেখতে সে সত্যিই সাঁতারে অনেক এগিয়ে গেল, মোটেই আর শিক্ষানবিশ রইল না। হায়! মনে পড়ে মাত্র কিছুদিন আগে সে আমাদের সঙ্গে সাঁতার কাটার জন্যে কী বিনীতভাবেই না আমাদের অনুরোধ করেছিল!

আমরা যখন ছ'-সাতজন মিলে নিজেদের নিয়মিত অনুশীলনের জন্যে সবেমাত্র ঠান্ডা জলে ঝাঁপ দেওয়ার আগে আমাদের শরীরকে ঘোলা জল বুলিয়ে প্রস্তুত করছিলাম, আর ঠিক সেই সময়ে আমাদের কাছে এসে সে অনুরোধ করল, আমাকে নাও, আমাকে দয়া করে তোমাদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে নাও, আমি পারব, আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমি সবকিছু ঠিকঠাক করতে পারব। তার গলায় যথারীতি ঝুলছিল তার নিত্যসঙ্গী স্ক্রুড্রাইভারটি আর গলার কণ্ঠনালিটিও ছিল গতিশীল।

তথাস্তু! মালকে স্থান পেয়ে গেল আমাদের দলে। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় সে আমাদের থেকে বেশ এগিয়ে চলল, আমরা তাকে হারিয়ে তার সামনে যেতে চেষ্টা করলাম না। তাকে তার ক্ষমতার শেষ প্রান্তে আসতে দিলাম।

তার সহযোগী স্ক্রুড্রাইভারটিও বড় কাঠের হাতল নিয়ে, যখন সে বুকসাঁতার দিচ্ছিল তখন তার পিঠে দুই কাঁধের মাঝখানে আর যখন চিতসাঁতার দিচ্ছিল তখন বুকের ঠিক মাঝখানে, সমান তালে সাঁতার কাটতে থাকে। স্ক্রুড্রাইভারটির ওই কাঠের হাতলটি কিন্তু কোনও সময়েই সাঁতার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কাটায় রত মালকের কুৎসিত চোয়াল, কার্টিলেজ কিংবা কণ্ঠাস্থিকে ঢেকে রাখতে পারেনি।

মালকে ঘটা করে আমাদের তার বেশ কিছু কসরত দেখাতে লাগল; তার স্ক্রুড্রাইভারটি নিয়ে সে অতি দ্রুত বেশ কয়েকবার জলে ডুব দিল এবং ওই যন্ত্র দিয়ে যা-কিছু খুলে আনা সম্ভব, যেমন, কিছু ঢাকনা, ধাতুর টুকরো অংশ, জেনারেটারের কিছু ভাঙা অংশ, কিছু দড়ি ইত্যাদি ওপরে তুলে আনল। এমনকী শুধুমাত্র একটি পুরনো চাকতির সাহায্যে সে দস্তুরমতো একটি আগুন-নেভানোর যন্ত্র জল থেকে তুলে আনল। জার্মানিতে তৈরি যন্ত্রটি সম্ভবত কার্যক্ষমও ছিল। সগর্বে সে আমাদের সবাইকে দেখাতে লাগল কীভাবে ওই যন্ত্রটির সাহায্যে সামুদ্রিক জলের নোংরা ফেনা পরিষ্কার করা যায়।

এইভাবে রাতারাতি সে সত্যিই আমাদের সবার চেয়ে ওপরে স্থান করে নিল।

এদিকে বালির ওপরে এখনও সামুদ্রিক জলের ফেনা এদিক ওদিক সারি সারি জমা হয়ে আছে। সেগুলি গাংচিলদের কোনওমতেই আকর্ষণ করতে পারছে না। বরঞ্চ উলটো, টক স্বাদের ক্রিমের মতো এই ফেনাগুলি ঢেউয়ের ধাক্কায় পাড়ের ওপর শুধুমাত্র ওঠানামা করছে। মালকে এবার পাওয়ার-হাউসের ছায়ার নীচে গিয়ে বসল। মালকের শরীরের ত্বক আগেই, অর্থাৎ পাড়ের দুরন্ত ধাবমান কুণ্ডলীপাকানো ফেনাগুলি তার শরীরে লাগার অনেক আগেই, শুকনো ও অমসৃণ আকার ধারণ করে।

আর তার পিঠ, ধপধপে সাদা রঙের পিঠটি সূর্যালোকে ঝলসে প্রায় লাল গলদাচিংড়ির মতো রং ধারণ করেছে, এমনকী তার পিঠের শিরদাঁড়ায় দু'পাশের পাঁজরও পুড়ে গিয়ে ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

মালকের ঠোঁট দুটি ছিল হলুদ রঙের, আর ঠোঁটের ধারগুলি ছিল নীল। মাঝেমাঝেই ওই ঠোঁট দুটি খুলে গিয়ে তার কম্পমান দাঁতের পাটি দেখিয়ে দিত। বেশ কষ্ট করেই সে জলে ভেজা দুটি হাত দিয়ে, দু'পায়ের হাঁটুদুটি একত্র করে, কম্পমান শরীর ও দাঁতগুলি কোনওক্রমে আয়ত্তের মধ্যে আনতে চেষ্টা করত।

হটন সোনটাগ না আমি? যাই হোক, আমাদের মধ্যে কেউ একজন একবার তার পিঠটি মালিশ করে দিয়ে তাকে বলেছিল, আর কখনও জলের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তলায় ডুব মারতে যেয়ো না, মনে রেখো আমাদের সবাইকে সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরতে হবে। এ কথা শুনে মনে হল, সে না হলেও, তার স্ক্রুড্রাইভারটি কিছুটা শান্ত হল। ডুবন্ত জাহাজের এই জায়গাটা থেকে তীরে ফিরতে আমাদের লাগে পঁচিশ মিনিট, আর সী-বিচ থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিটের মতো, অর্থাৎ সব মিলিয়ে বাড়ি ফিরতে পাক্কা এক ঘণ্টার মতো সময় লাগত।

এর পর থেকে, মালকে যতই ক্লান্ত বা অবসন্ন থাকুন না কেন, প্রতিবারেই সে সাঁতারে আমাদের থেকে কমপক্ষে এক মিনিট আগে পাড় থেকে জেটি পর্যন্ত অনায়াসে এপার-ওপার করতে লাগল।

প্রথম দিনের সেই জয়ের সুনামটি সে পরবর্তী সময়েও ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিবারেই আমাদের বজরা বা যাকে মাঝেমাঝে মেইন-সুইপারও বলতাম, সেখানে আমাদের পৌঁছোনোর আগেই মালকে সহজেই গিয়ে একবার ডুব দিয়ে আসত। আর আমরা সবাই একসঙ্গে, প্রায় একই সময়ে মরচে-ধরা ও গাংচিলদের দুর্গন্ধময় পায়খানা ছড়ানো সেতুটির কাছে পৌঁছে বেশ অবাক হয়ে যেতাম; ঠান্ডা শরীরে কাঁপুনি সত্ত্বেও, সে আমাদের সবাইকে জলের তলা থেকে তুলে আনা বেশ কিছু জিনিসপত্র, যা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে সহজে খোলা যায়, যেমন টিনের প্লেট, কবজা ইত্যাদি, খুব গর্বসহকারে দেখাত। তারপর কাঁপুনি কমানোর জন্য এবং পরের ডুবটি দেওয়ার আগে, সে তার সারা শরীরে বেশ পুরু করে দামি নিভিয়া ক্রিম মাখিয়ে মালিশ করে নিত— বাড়ি থেকে পাওয়া তার হাত-খরচের পয়সা মনে হয় খুব-একটা কম ছিল না।

মালকে পরিবারের একমাত্র সন্তান।

মালকের পিতা পরলোকগত।

কী শীতে, কী গ্রীষ্মে, সে সম্ভবত তার পিতার কাছ থেকে পাওয়া পুরনো জুতোজোড়াটি সবসময়ে পরে থাকত।

একটি বড়, কালো রঙের লম্বা জুতোর ফিতে দিয়ে তার স্ক্রুড্রাইভারটি বেঁধে সে সবসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখত।

বহুকাল পরে, আজ আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে, যদিও তার স্ক্রুড্রাইভারটিই সবার দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করত, তবুও সে এটি ছাড়াও আরও অন্য একটা কী যেন জিনিস তার গলায় ঝুলিয়ে রাখত।

যদিও আমরা ভালভাবে কখনও লক্ষ করিনি, তবুও মনে হয়, তার সাঁতার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শেখার একেবারে প্রথম পর্ব থেকেই, অর্থাৎ যখন সে সবেমাত্র শুকনো বালির চরে দাঁড়িয়ে সাঁতারের অনুশীলন চালাত, তখন থেকেই সে একটি রুপোলি ধরনের হার গলায় ঝুলিয়ে রাখত। আর ওই হারটিতে একটি ক্যাথলিক-ধর্মীয় কিছু, খুব সম্ভবত কোনও পবিত্র কুমারীর ছবিসহ একটি মেডেল ঝুলত। সে ওই মেডেল ঝোলানো হারটি কখনও, এমনকী জিমন্যাস্টিক করার সময়েও তার গলা থেকে খুলত না।

মালকে নিডারস্টাটের সুইমিংপুলে সাঁতার শেখা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের স্কুলে ভরতি হয়ে যায়। ডাক্তারের লেখা অসুস্থতার কোনও সার্টিফিকেট তাকে আর কখনও দেখাতে হয়নি। মেডেলটি সবসময় দেখা যেত না, কারণ হয়তো সেটি তার সাদা জিমন্যাসটিক-শার্টের তলায় কিংবা তার গলার লাল দাগটির ঠিক ওপরে লুকানো অবস্থায় ঝুলে থাকত।

মালকের কাছে প্যারালেল-বারের ব্যায়াম মোটেই কষ্টকর ছিল না। এমনকী ঘোড়ায় চড়ার যে ব্যায়ামটি, আমাদের দলের মাত্র তিন-চারজন খেলোয়াড় বস্তু পারত, সেটিও সে রপ্ত করে ফেলল অনায়াসে; বেঁকাচোরা শরীর নিয়ে সজোরে সে স্প্রিং-বোর্ড থেকে, এক লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে পড়ত ঘোড়ার পিঠের ওপরে, তারপর মেডেলের সেই হারটি গলায় ঝুলিয়ে আর প্রবল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে পড়ত এসে মাটিতে। আর হরাইজেন্টাল-বারে উঠে যখন সে হাঁটু ভাঁজ করত তখন তাকে যদিও সত্যিই রুগ্‌ণ ও দুর্দশাগ্রস্তের মতো দেখাত, তা সত্ত্বেও সে আমাদের দলের সব সেরা পালোয়ান হটন সোনটাগের থেকে দু'-তিন বারেরও বেশি শরীর ভাঁজ করতে পারত। যখন সে দমবন্ধ করে একের পর এক সাঁইত্রিশবার তার হাঁটুগুলি ভাঁজ করে ওঠা-নামা করত, তখন প্রতিবারই তার গলার মেডেলটি চিচি আওয়াজ করে তার চুলের সামনে এ পাশে-ওপাশে দুলত। সে কিন্তু কোনওভাবেই তার দীর্ঘ গলা ও চুলে ঢাকা মাথাটি ওই বাধা সৃষ্টিকারী দুলন্ত মেডেলওলা হারটির থেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি।

স্ক্রুড্রাইভারটি জায়গা করে নিত হারের মেডেলটির ওপরে আর হারের বেশ কিছুটা অংশ ঢেকে ফেলত জুতোর ফিতেটি।

জাঁদরেল মানুষটি অর্থাৎ আমাদের জিমনাসটিক টিচার মালেনব্রান্ট মশাই মালকেকে ওই কাঠের বাঁটওলা স্ক্রুড্রাইভারটি জিমনাসটিকের সময়ে গলায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধ করে দিলেন। জিমনাসটিক টিচার ছাড়াও মালেনব্রান্ট ছিলেন স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল, খেলাধুলার জগতে একজন নামকরা মানুষ, এমনকী বহুবিধ খেলাধুলার নিয়মাবলির একটা বইও লিখেছেন। অপরপক্ষে, তিনি কিন্তু কোনওমতেই মালকের ওই ক্যাথলিক মেডেলওলা হারটি গলায় ঝুলিয়ে রাখার বিরোধী ছিলেন না। শারীরিক ব্যায়াম ও ভূগোল ক্লাস ছাড়াও তিনি ধর্মশিক্ষার ক্লাস নিতেন আর এ ছাড়া যুদ্ধ আরম্ভের দ্বিতীয় বছর থেকেই ক্যাথলিক কর্মী-সমিতির সভ্যদের নিয়মিত খেলাধুলার পরিচালনার ভারও হাতে নিয়েছিলেন। অগত্যা, হতভাগ্য স্ক্রুড্রাইভারটিকে হাজির হতে হল পোশাক পালটানোর ঘরের হ্যাঙারে ঝুলে থাকতে আর ভাগ্যবান মেডেলওলা হারটি সুযোগ পেয়ে গেল, মালকের গলায় সবসময়ে ঝুলে থাকতে ও তাকে উৎসাহ দিতে।

একটি অতি সাধারণ স্ক্রুড্রাইভার, সস্তা দেখতে হলেও মজবুত। মালককে প্রায়ই পাঁচ-ছয়বার জলে ডুব দিতে হত ছোটখাটো নেম-প্লেট জাতীয় জিনিস, মরচে-ধরা স্ক্রু থেকে খালাস করে জলের তলা থেকে তুলে আনতে। যদিও তার পক্ষে স্ক্রুড্রাইভারটিকে হাতুড়ি হিসেবে ব্যবহার করে, মাত্র দু'বার ডুব দিয়েই বেশ বড় আকারের কিছু ধাতুর প্লেট তুলে আনা সহজেই সম্ভব হত। জিনিসপত্র ঠিকভাবে সঞ্চয় করার অভ্যাস তার ছিল না বললেই হয়। অন্য দিকে তার বন্ধুরা, যেমন উইন্টার ও কুপকা, যারা এই ধরনের জলের তলা থেকে নিয়ে আসা, বাথরুমের কিংবা রাস্তার নেম-প্লেট ধরনের জিনিসগুলি পাগলের মতো সঞ্চয় করত, মালকে সহজেই তাদের এইসব জিনিস দান করে দিত। শুধুমাত্র সেইসব জিনিস, যেগুলি তার সত্যিই রুচিসম্মত হত, তা হলে সে নিজের ঘরে নিয়ে যেত।

মালকের কাজকর্মের ধরন মোটেই সহজ বা স্বাভাবিক ছিল না। আমরা সবাই যখন নৌকোর ওপরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি, তখন সে জলের তলায় কাজ করে চলেছে। আর আমরা যখন নৌকোর ওপরে পাখিদের শুকিয়ে যাওয়া পায়খানা পরিষ্কার করতে করতে আমাদের গায়ের রং ও সাদা চুল প্রায় খয়েরি করে ফেলেছি, তখন মালকে জল থেকে সদ্যস্নাত শরীরটি নিয়ে উঠে আমাদের কাছে হাজির হচ্ছে।

যখন আমরা জাহাজ চলাচলের আলোক-সংকেতের ব্যাপারটা নিয়ে মন দিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছি, সেই সময়ে মালকের চোখের দৃষ্টি কিন্তু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
একেবারে অন্যদিকে, অর্থাৎ শুধুমাত্র জলের দিকে। ক্লান্তিবশত কিংবা পায়ে কিছুটা আঘাত পাওয়ার ফলে, যদিও তার চোখ ও চোখের পাতাদুটি কিছুটা লাল হয়ে গিয়েছিল, তবুও আমরা স্থির জানতাম যে, আসলে তার নীল রঙের চোখদুটি সর্বদাই জলের গভীরে কিছু খোঁজার চেষ্টায় লেগে থাকতে চাইত। মাঝেমধ্যে সে তার স্ক্রুড্রাইভারটির সাহায্যে, ঢাকনা বা টিনের প্লেট জাতীয় অতি ছোটখাটো কোনওকিছু জিনিস, জলের তলা থেকে ওপরে এনে হাজির করত। রীতিমতো গর্বের সঙ্গেই মালকে ওই জিনিসগুলি আমাদের দেখিয়ে তারিফ পাওয়ার চেষ্টা করত, আর মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত ধরনের শারীরিক ভঙ্গি করে সে ওইসব খুঁজে আনা জিনিসগুলি সজোরে ওপরে ছুড়ে দিয়ে উড়ন্ত পাখিদের বিরক্ত করেও মজা পেত। যদিও এই বিরক্ত করারও কাজটি সে কোনও বিশেষ রাগ বা হতাশার কারণ হিসেবে করত না, শুধু মজার জন্যেই।

সত্যি কথা বলতে কী, মালকে কোনও সময়েই তার জল থেকে খুঁজে আনা যন্ত্রপাতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছুড়ে ফেলে দেয়নি। এইসব ছোড়াছুড়ি বা লোফালুফির করার মধ্যে দিয়ে তার বক্তব্য ছিল, আমি তোমাদের সবাইকে আরও অনেক অনেক কিছু অদ্ভুত জিনিস আবার জলের তলা থেকে এনে দেখাতে পারি।

আর একবার, যখন একটা দু'-চিমনিওলা হাসপাতাল-জাহাজ বন্দরের দিকে নোঙর করতে আসল, আমরা সহজে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেটিকে প্রুশিয়ান মিলিটারির কাইসার জাহাজ হিসেবে শনাক্ত করে ফেললাম। মালকে কাউকে কিছু না বলেই, তার নিত্যসহচর স্ক্রুড্রাইভারটি হাতে না নিয়ে, দু'আঙুল দিয়ে নাক চেপে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, অর্ধ নিমজ্জিত ওই জাহাজের ভাঙা দরজাটির মধ্যে দিয়ে একেবারে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

মাথা সোজাভাবে সামনে রেখে ডুব-সাঁতার দিল, আর ওই ডুব-সাঁতারের সময় তার চুলগুলি মাঝ-সিঁথিতে দু'ভাগে ভাগ হয়ে মাথার সঙ্গে লেপটে রইল। সে তার পিঠে ও পাছাতে টান দিল, মুহূর্তের জন্যে একবার লাফিয়ে উঠল শূন্যে আর তারপরে পায়ের দুটি পাতা দিয়ে সজোরে বেঁকাভাবে দরজায় ধাক্কা মেরে অন্ধকার ঠান্ডা অ্যাকোরিয়াম, যেখানে শুধুমাত্র কাচের জানলা দিয়ে সামান্য আলো ঢোকে, তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সে এক অদ্ভুত অ্যাকোরিয়াম, নোনাজলে উত্তেজিত চলমান বানমাছের সারি, শক্তভাবে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বাঁধা ও গাছগাছালিতে প্রায় ঢাকা পড়া একটি ঝুলন্ত দোলার বিছানা, সব মিলিয়ে স্থানটি কর্ডমাছ বা হেরিং মাছেদের খেলে বেড়ানোর একটি জুতসই জায়গা। দামি পাঁকাল-আলমাছের কথা শুধু লোকেই বলে— আমাদের চোখে তো এগুলি পড়েনি কখনও। পাখিদের বিষ্ঠা মুখে নিয়ে চিবোতে চিবোতে উত্তেজনা, ভয়ে আর শিহরনে কাঁপতে থাকা আমাদের হাঁটুদুটি কোনওক্রমে চেপে ধরে রাখতে চেষ্টা করলাম।

সবকিছু দেখেশুনে আমরা সবাই বেশ চমৎকৃত, উত্তেজিত আর হয়তো কিছুটা ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলাম আর ভেবেছিলাম বোধহয় জাহাজ-সারানোর বিশেষ কোনও যন্ত্র দিয়ে সে ওই অ্যাকোরিয়ামটি মেরামত করবে। যদিও আসলে ওই সময় আমাদের সবার দৃষ্টি চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকা ওই হাসপাতাল-জাহাজটির ওপরই নিবদ্ধ ছিল। হাসপাতাল-জাহাজটি বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, উড়ন্ত সামুদ্রিক পাখিরাও তার ওপরে ঘুরপাক খাওয়া আরম্ভ করে দিল। এদিকে প্রবলভাবে ঘূর্ণিজলের ঢেউ এসে সহজেই ভেঙে চুরমার করে দিল জাহাজের সামনের কামান বাঁধার অংশটি। বলে রাখা ভাল যে, কার্যক্ষম কামানগুলিকে কিন্তু সময়মতোই সেখান থেকে খুলে নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে ফেলা হয়।

জলের প্রবল ঝাপটা এসে জাহাজটির পিছন দিকের একটি ছিদ্র দিয়ে ভিতরে ঢুকতে লাগল। হাতের নখের তলায় চুন; শুকনো চামড়ার নীচে চুলকানোর ইচ্ছে, মিটমিটে ক্ষীণ আলো, হাওয়ার সঙ্গে মোটরের আওয়াজ, বেশ কিছু ডুবন্ত ঝাউগাছের লতার বাঁধন, এইসব অবর্ণনীয় পরিবেশের মধ্যে থেকে বেশ দ্রুতগতিতেই জল থেকে উঠে এলেন তিনি: চিবুকের রং গাঢ় লাল, কোমর-অঞ্চলের রং হলুদ। তার মাথার চুল সিঁথির দুই পাশে সমান ভাগে ভাগ করা, জল থেকে তির গতিতে উঠে আসা টলমলে মালকে। তখনও হাঁটু পর্যন্ত জলের তলায়, একটি হাতল জাতীয় কিছু চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। টলমলে শরীর, চোখদুটিতে হতাশার ভাব, সে শেষ পর্যন্ত নিজের হাঁটুর ওপরেই আছড়ে পড়ল। অগত্যা আমাদেরই শেষ পর্যন্ত তাকে সোজা করে তুলে ধরতে হল। কিন্তু নাক-মুখের জল ঝরে পড়ার আগেই সে জলের নীচ থেকে সংগ্রহ করা জিনিসগুলি আমাদের দেখাতে শুরু করে দিল: একটি ঝকঝকে আস্ত, মেড-ইন-ইংল্যান্ড-শেফিল্ড স্ট্যাম্প-ওলা স্ক্রুড্রাইভার, কোনও রকম আঁচড় নেই, এমনকী দেখে মনে হয়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যেন সবেমাত্র তেল দিয়ে পরিষ্কার করা একটি যন্ত্র।

গোলাকার ঘূর্ণি জলের ঢেউ প্রবল স্রোতের আকারে বইতে লাগল যথারীতি—

আমরা যখন সবাই ডুবন্ত বজরার ধারে, সাঁতার কাটা বন্ধ রেখে, বলা যায় বিশ্রাম করছিলাম, মালকে কিন্তু তখনও তার জলে ডুব দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখেনি। এমনকী এরপরে নিয়ম করে, টানা একটি বছর প্রতিদিন তার ভারী সর্বকাজে সক্ষম ও মজবুত স্ক্রুড্রাইভারটি গলায় ঝুলিয়ে ওই অঞ্চলে সাঁতার কেটে বেড়াত।

নিঃসন্দেহে সে একজন প্রকৃত ক্যাথলিক ছিল, আর এই ধর্মীয় ব্যাপারটা তার কাছে এক শ্রদ্ধা দেখানোর কাজ হয়ে দাঁড়াল। যেমন ধরা যাক, খেলাধুলার ঘণ্টার ঠিক আগেই তার মেডেল ঝোলানো ওই হারটি স্কুল ডাইরেকটার মালেনব্রান্টের হাতে জমা দিয়ে দেওয়া। তার বেশ ভয় ছিল যে তার এই অতি প্রিয় হারটি কোনও কারণে হয়তো চুরি হয়ে যেতে পারে। এমনকী শুধু শনিবার নয়, সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতেও, যখন সে বাড়ির কাছের সেন্ট-ম্যারী-গির্জাটিতে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত, ওই হারটি সে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে মোটেই ভুলত না।

দুরত্ব মোটেই বেশি নয়, ম্যারী-চ্যাপেলে ক'পা যাওয়ার পথে যেতে প্রথমে ওসটারসাইলে অঞ্চল পেরিয়ে তারপরে ব্যেয়ারেন নামে রাস্তাটা ধরতে হয়, পথে পড়ে সুন্দর গেটওলা দু'তলা বাড়ির সারি, আর বাড়িগুলির সামনে টবে লাগানো ফুলের গাছ। দু'সারিতে ভাগ করা এই কোয়ার্টার বাড়িগুলি উন্নয়ন-সংস্থার তৈরি, কয়েকটিতে চুনকলি দেওয়া আর কয়েকটিতে ছিল না।

ডান দিক বরাবর বেঁকে চলেছে ট্রাম-লাইন আর তার ওপরে মেঘলা আকাশের নীচে ঝুলছে বৈদ্যুতিক তার। লতাপাতায় ঢাকা, বহুকাল ধরে পড়ে রয়েছে এক লালচে রঙের কাঠের পুরনো মালগাড়ির বগি। বগিটি একটি গিনিপিগদের আশ্রয়স্থলের মতো ছোটখাটো আর ঠিক তার পিছনেই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রেলগাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণের সিগনাল-যন্ত্রটি। আরও দাঁড়িয়ে আছে শস্য মজুত রাখার গোলাঘর, নিশ্চল ও কর্মক্ষম কিছু ক্রেন ও বিদঘুটে রং করা বড় আকারের এক স্টিলের স্ট্রাকচার।

দুটি ধূসর রঙের পুরনো যুদ্ধজাহাজ, এক কুৎসিত কামান-যন্ত্র নিয়ে যুদ্ধের পর থেকেই এখনও দাঁড়িয়ে। আরও রয়েছে অনেক কিছু: জলে ভাসন্ত দুটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ডক-ইয়ার্ড, জারমানিয়া নামে রুটি তৈরির একটি ফ্যাকট্রি, জলের ওপরে কয়েকটি মসৃণ রুপালি রঙের মাঝারি সাইজের সুন্দর বেলুন— যদিও দড়ি দিয়ে বাঁধা কিন্তু ভাসন্ত আর নৃত্যরত। আর দক্ষিণ দিকের জমির ওপর, প্রায় ক্রেনের মাথা পর্যন্ত উঁচু হয়ে, দাঁড়িয়ে আছে গুডরুন স্কুলের বাড়িটি, যার পুরনো নাম ছিল হেলেনে-লাঙ্গে-সুলে।

এই দিক বরাবরই রয়েছে সযত্নে তৈরি স্পোর্টের মাঠটি, নতুন সবেমাত্র রং করা ঝকঝকে গোলপোস্ট, ছোট করে ছাঁটা মসৃণ ঘাসের ওপরে সাদা রঙে আঁকা পেনালটি বক্সের ও অন্যান্য সীমানা-চিহ্নগুলি। পরের রবিবারেই ব্লু-ইয়োলো বনাম স্যেলমুল-৯৮ দলের খেলা। যদিও মাঠের আশেপাশে কোনও বিশেষ মঞ্চ নেই, শুধু দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক, হালকা খয়েরি রঙের বড় বড় জানলাওলা একটি স্পোর্ট হল।

এই হলঘরটির নতুন লাল রং করা বিরাট ছাদটির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার জন্যে সেন্টম্যারী-গির্জা থেকে আনা একটি বিশাল আকারের কাঠের তৈরি ক্রস ছাদের ওপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এই খেলার হলটিকে প্রাথমিকভাবে একটি গির্জায় রূপান্তরিত করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়, কারণ পরবর্তী গির্জা, অর্থাৎ পবিত্র যিশু-গির্জাটির দূরত্ব এখান থেকে মোটেই কম ছিল না। বেশ কয়েক বছর ধরেই এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরা, অধিকাংশই বন্দরবিভাগের, রেলওয়ে বিভাগের কিংবা ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারী ছিলেন, তাঁরা সবাই তাঁদের এই দাবিটি নিয়ে অলিভা-শহরের বিশপের কাছে অনেক দিন যাবৎ আবেদন-নিবেদন করে আসছিলেন। অতঃপর, যদিও বেশ বিলম্বে, তবুও শেষ পর্যন্ত এই হলটি কিনে নিয়ে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও মেরামতি করে গির্জা হিসাবে ব্যবহার করার উপযোগী করে তোলা হল।

নানান গির্জার সংগ্রহ থেকে ও কারও কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে আনা কিছু পুরনো ভাঙাচোরা মেরামত করা ছবি ও আরও কিছু সাজানোর জিনিস দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, খেলাধুলার হলঘরের চরিত্রটি পুরোপুরি দূর করা যায়নি। প্রচুর পরিমাণে ধূপ-ধুনো পোড়ানো ও বাতি জ্বালানোর গন্ধ কোনওমতেই খেলার হলটির অতীতের জমে থাকা খেলোয়াড়দের গায়ের ঘামের গন্ধ, চামড়া ও নানান ধরনের অন্যান্য গন্ধ ঢাকা দিতে পারেনি। তথাপি এই নতুন খাড়া-করা গির্জাটি ও তার প্রার্থনাগারটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্রটেস্টান্ট-ধর্মীয় সাধারণ ও মিতাচারী চরিত্রটি কিছুটা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

নিও-গথিক যিশু-গির্জাটি পোড়ামাটির ইট দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ, কোয়ার্টার বাড়িগুলির অঞ্চলের বাইরে, রেল স্টেশনের অনতিদূরে নির্মিত হয়। আমাদের মালকের ইস্পাতের স্ক্রুড্রাইভারটির কাছে হয়তো এই বাড়িটি অদ্ভুত, অসুন্দর, পুরনো বা অপ্রয়োজনীয় লাগতে পারে। অপরদিকে সেন্ট-ম্যারী-চ্যাপেল গির্জাটি দেখে মালকে তার ইংল্যান্ডে বানানো ঝকঝকে স্টিলের স্ক্রুড্রাইভারটি নিশ্চয়ই খুলে ফেলবে। এই ছোট্ট সুন্দর গির্জাটির ছাদ উপযোগী মজবুত ও মোটা কাপড় দিয়ে ভালভাবে এঁটে দেওয়া। দুধসাদা রঙের চৌকো ও পরিষ্কারভাবে কাটা কাচের প্লেট লাগানো মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত দাঁড়ানো বড় আকারের জানলাগুলি স্টিলের ফ্রেমে মজবুত ও নিরাপদ ভাবে বসানো হয়েছে।

ছাদের নীচে মজবুত করে আঁটা শক্ত কাঠের তক্তা, তার নীচে লোহার কড়িবরগা, সেই বরগার সঙ্গে লাগানো রয়েছে দড়ি দিয়ে বাঁধা নানান মাপের ঝুলন্ত রিং, যেগুলি আগে ছাত্রদের ব্যায়ামের জন্যে ব্যবহার করা হত— সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়, এই ছোট্ট গির্জাটি তার কিছুটা মিশ্রিত রূপ নিয়েও, বেশ ছিমছাম, আধুনিক ও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

চারিদিকে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো ঝোলানো ছবি, প্রার্থনারত বেশ কিছু মূর্তি,— এই সব নিয়ে গির্জাঘরটির মধ্যে এক শান্ত পরিবেশ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, এরকম স্থানে একটা চকচকে স্ক্রুড্রাইভার বুকে ঝুলিয়ে মালকের ঘুরে বেড়ানো মোটেই শোভন ছিল না। মালকের এই আচরণ কী প্রার্থনারত মানুষদের, কী প্রার্থনা-পরিচালক ফাদারের, কিংবা সদাসর্বদা উপস্থিত আমি— এই আমার কাছেও, বলা যায় প্রায় সবার কাছেই, লজ্জাজনক হয়ে দেখা দেয়।

না, সঠিক বলিনি, আরও ভালভাবে খোলসা করে বলি: আসলে ওই যন্ত্রটি কোনও সময়েই আমার দৃষ্টির বাইরে যায়নি। ওহে ভাই— মালকে, যখনই আমি গির্জাঘরের বেদির সামনে অবনত হয়ে বসে পূজা কিংবা প্রার্থনায় রত থাকি—এমনকী তখনও আমি একাধিক কারণে তোমার প্রতি চোখ রেখে পরিষ্কার দেখতে পাই তুমি কেমন ভাবে নিশ্চিন্তে তোমার প্রাণনিধি স্ক্রুড্রাইভারটি দুলিয়ে যাচ্ছ, মাঝে মাঝে সেটিকে লুকোচ্ছ তোমার জামার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তলায়—জানতেই পারছ না যে ওই কারণেই তোমার জামাটা বেশ তেল চিটচিটে হয়ে উঠেছে আর লুকানো সত্ত্বেও তোমার যন্ত্রটি কারও চক্ষু এড়িয়ে যাচ্ছে না।

এমনকী পূজার বেদির ওপর থেকে পরিষ্কার দেখা যায় কীভাবে সে দ্বিতীয় সারির একটি বেঞ্চে তার হাঁটুদুটি মুড়েসুড়ে বসে আছে। হয়তো বেশি ডুব-সাঁতার দেওয়ার ফলে তার চোখদুটি সামান্য রগরগে হয়ে একটু খয়েরি রং ধারণ করেছে, তথাপি ওই চোখদুটি খুলেই, সে তার প্রার্থনা-দৃষ্টি অন্য কোনও দিকে না রেখে, শুধুমাত্র কুমারী-ভার্জিনের প্রতিকৃতির ওপরেই নিবদ্ধ রেখেছে।

আর একবার, আমার এখন আর ঠিক মনে নেই, কোনও গ্রীষ্মকালেই সম্ভবত ফ্রান্সে গোলমালের ঠিক পরেই, কিংবা হয়তো তার পরের বছরে, সমুদ্রের তীরে পড়ে থাকা জাহাজের ধারে, সেই সময়ই ছিল আমাদের প্রথম লম্বা গ্রীষ্মাবকাশ—

গ্রীষ্মের একটি কুয়াশা ঢাকা দিন: সমুদ্রের তীরে স্নান বা সাঁতার দেওয়ার জায়গায় অজস্র মানুষের ভিড় ও প্রচণ্ড হইহুল্লোড়, উড়ন্ত নানান ধরনের ফ্ল্যাগ, অনেক ভারী ওজনের মোটাসোটা শরীরের মানুষের আনাগোনা, কেনাকাটার দোকানগুলিতে জমাটি ব্যাবসা, দোকানের কার্পেটের ওপর দিয়ে বালির গরমে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা চটি-জুতো পরা মানুষদের অবিরাম আনাগোনা, দরজা বন্ধ থাকা স্নানের কেবিনের সামনে অপেক্ষমাণ মানুষদের বিদ্রূপাত্মক চাপা হাসির শব্দ, দুরন্ত ছেলের দলের দৌড়নো আর সেইসঙ্গে অট্টহাস্য করে মাটিতে ডিগবাজি খাওয়া, বালির ওপরে পায়ের ছাপ আঁকা—আরও অনেক অনেক কিছু।

আর এই সবকিছুর মাঝখানে একটি সদ্য-পাড়া মাছের ডিম, যার বয়স, বেঁচে থাকলে, এখন তেইশ বছরের মতো হতে পারত, একটি বছর তিনেক বয়সের শিশু বয়স্ক লোকেদের সাবধানি চলাফেরার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে, একটা বাচ্চাদের টিনের ড্রাম বাজিয়ে চলেছে— সব মিলিয়ে এ যেন এক অলৌকিক কামারখানার উন্মত্ত হাপরের আওয়াজ।

এর মধ্যেই আমরা নেমে পড়লাম জলে, পাড় ছেড়ে, সামনের লাইফগার্ডের বাইনাকুলারটিকে লক্ষ্য রেখে, বজরার কাছে পৌঁছোনোর উদ্দেশ্যে সাঁতার

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দিতে শুরু করলাম। ছ'-ছ'টি ছোট ছোট মাথা পাশাপাশি সাঁতার কেটে চলেছে ডুবন্ত বজরার দিকে, তার মধ্যে একটি চলেছে অবশ্যই সবার সামনে, গন্তব্যস্থলে সবার আগে পৌঁছোনোর জন্যে।

যদিও জল বেশ উত্তপ্ত, তবুও বাতাসে কঠিন হয়ে যাওয়া পাখিদের নোংরা ভাসমান বিষ্ঠার স্তরের তলায় গিয়ে আমরা বিশ্রাম নিতে লাগলাম আর এই সময়ের মধ্যে মালকে দু'-দু'বার বজরার কাছে গিয়ে ঘুরে এল। বাঁ-হাতে কিছু জিনিস নিয়ে সে জল থেকে উঠে এল।

সে নিশ্চয়ই জলের তলায় অনেক অনুসন্ধান চালিয়েছিল: নাবিকদের আধ-পচা ঝুলন্ত বিছানাগুলির ভিতরে ও নীচে খোঁজাখুঁজি, দল বেঁধে চলমান নানান ধারালো ডানাওলা মাছের ঝাঁককে বিরক্ত করা, লতাগুল্মের আশেপাশে এদিক-ওদিক চলাফেরা করা বানমাছদের লক্ষ করা, নাবিক বা খালাসিদের একদা ব্যবহৃত লিসিন্‌সকি-নামের ছাপ দেওয়া জিনিসপত্র রাখার থলি আবিষ্কার করা—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মালকে এক হাত সাইজের একটি তামার তৈরি মেডেল-প্লেট খুঁজে এনেছে, এর একপিঠে দেখা যাচ্ছে একটি ছোট্ট খোদাই করা পোল্যান্ডের ঈগলের আকৃতি ও এই মেডেলটির মালিকের নাম আর অন্য পিঠে এই মেডেলটি পুরস্কার দেওয়ার তারিখ। বেশ কিছুক্ষণ বালি ও সামুদ্রিক পাখিদের শুকনো পায়খানার গুঁড়ো দিয়ে ঘসামাজার পর, একটি গোলাকৃতি লিখন পড়ে জানা গেল যে, মালকে এখন একদা বিখ্যাত জেনারেল পিলসুড্‌স্কির প্রতিকৃতিটি সবার সামনে হাজির করেছে।

পরবর্তী টানা দু'-সপ্তাহ ধরে মালকে শুধু তার খুঁজে পাওয়া এই মেডেলটিকে নিয়ে ব্যস্ত রইল। পরে জলের তলা থেকে সে আরও কিছু জিনিস খুঁজে এনেছিল: একটি অতি প্রাচীন, চারশো তিরিশ সালে তৈরি, টিনের থালার মতো দ্রব্য, যার ওপরে নৌকা-বাইচ প্রতিযোগিতার একটি ছবি আঁকা, এবং যা প্রাচীন স্মৃতি হিসাবে সংগ্রহ করার পক্ষে সত্যিই উপযুক্ত ছিল। তা ছাড়াও ডুবন্ত নৌকার মাঝখান ও নোঙর ফেলার অংশটির মাঝামাঝি জায়গায়, দুর্গম সরু গলিপথের শেষে, এককালে নাবিকদের আহার করার কামরা থেকে, সে একটি রুপোর মেডেল নিয়ে এল; একটি রুপোর রিং লাগানো এই মেডেলটির সাইজ ছিল একটি টাকার মতো,—রিঙের মধ্যে দিয়ে একটি চেন সহজে ঢোকানো যায়। মেডেলটির উলটো দিকটি ছিল বেশ ক্ষয়ে যাওয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আর কোনও কিছু লেখা ছিল না যদিও অন্য দিকে শিশুসহ ও সেবারত এক কুমারী মায়ের উন্নতমানের এক চিত্র উৎকীর্ণ করা ছিল।

জলের তলা থেকে মালকের আনা বিশেষ মূল্যবান বস্তুটির ওপরে খোদাই করা লিপিটি বিখ্যাত বোসকা চেসটোকোভুস্কা-র পরিচয় সবার চোখের সামনে তুলে ধরে। মালকে ওই জিনিসটি জল থেকে সেতুর ওপরে তুলে আনলে, আমরা তাকে সেটি বালি দিয়ে পরিষ্কার করতে অনুরোধ করলাম। সে এই অনুরোধে কান দিল না, সে ওটিকে মোটেই মেজেঘসে পরিষ্কার করতে চাইল না, জিনিসটি কালো ধরনের পুরনো ধাতু-রঙেই রেখে দিতে চাইল।

আর আমরা যখন ওই জিনিসটি ঝকঝকে রুপোর মতো পরিষ্কার অবস্থায় দেখার জন্যে বাদবিতণ্ডা করছিলাম, ঠিক তখনই মালকে পাইলট-হাউসের ছায়ার তলায় নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে, তার শক্তভাবে ভাঁজ করা হাঁটুদুটির মাঝখানে ওই জিনিসটি রেখে, ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে উপাসনার ভঙ্গিতে জিনিসটিকে আবার ভালভাবে দেখতে লাগল। এরপরে সে তার জলে ভেজা, থরথর করে কাঁপা হাতের আঙুলগুলি দিয়ে বালির ওপর একটি যিশু-ক্রস আঁকার চেষ্টা করতে লাগল, চেষ্টা করতে লাগল তার কাঁপন্ত ঠোঁট আর দাঁতের পাটির সাহায্যে, মন্ত্রের মতো কিছু শব্দ আওড়াতে। তার এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের সবার হাসিতে প্রায় ফেটে পড়ার অবস্থা। এখনও আমি মনে করি যে, এ সবকিছুই হয়তো ছিল তার মনের একান্ত ইচ্ছা, যা সাধারণত গির্জাতে প্রতি রবিবারের প্রার্থনাতে পাঠ করা হয়: *ভিরগো ভিরগিনুম প্রয়েক্লারা—মিহি ইয়াম নঅন সিস আমরা—*

এরপরে, আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল মহাশয় ড. ক্লোশ্যে, যিনি যদিও নিয়মিত ইউনিফর্ম পরে ক্লাস নিতেন না, কিন্তু রাজনৈতিক পার্টির একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি ছিলেন, মালককে ওই পোলিশ মেডেল বাঁধা হারটি, ক্লাস চলার সময়ে সবাইকে দেখিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে সরাসরি নিষেধ করলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই আদেশ অমান্য করে, সম্ভবত নিজেকে খুশি করার জন্যেই মালকে তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মাদুলি-হারটি ও নিত্যসঙ্গী স্ক্রুড্রাইভারটি ঠিক তার কণ্ঠনালির নীচে ঝুলিয়ে রাখতে লাগল। আর প্রায় ধুসর হয়ে যাওয়া কুমারী ভার্জিনের মেডেলটিও সে পিলসুড্স্কির ব্রোন্জ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মেডেল ও বিখ্যাত বীর নারভিকের পোস্টকার্ড সাইজের ফটোটির ঠিক মাঝখানে, তার গলায় নিয়মিত ঝুলিয়ে রাখা শুরু করল।

দুই

এই যে তোমার ভিক্ষাসুলভ প্রার্থনা একি শুধুমাত্র মজা করার জন্যে? তোমার বাড়ি তো ওএসটারসাইলের দিকে। তোমার রসিকতাটি বেশ বিদঘুটে ধরনের। না, তোমার বাড়িটি আসলে ওসটারসাইলের দিকে, ওএসটারসাইলের দিকে নয়। সারি সারি দাঁড়ানো কোয়ার্টার বাড়িগুলি দেখতে আসলে প্রায় একই ধরনের। আর এবার আবার শুরু হল মালকের রুটি-স্যান্ডুইচ খাওয়ার পালা, এই দেখে আমরা সবাই একে অপরকে ঠেলা দিয়ে সজোরে হাসতে লাগলাম। আসলে তোমাকে দেখলেই, কেন জানি না, আমাদের সকলেরই অকারণে হাসি পেয়ে যায়।

আর একবার, যখন আমাদের স্কুল-ডিরেক্টার ক্লাসের সব ছাত্রদের ডেকে পাঠিয়ে, ভবিষ্যৎ জীবনে কে কী পেশা নিতে চায় সেই সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, তখন মালকে তুমিই, যদিও ইতিমধ্যে তুমি মোটামুটি ভালই সাঁতার কাটতে পারতে, তবুও বেশ বুক ফুলিয়ে বললে, আমি ভবিষ্যতে কোনও সার্কাসের দলে ক্লাউন হতে চাই আর দর্শকদের হাসিয়ে আনন্দ দিতে চাই।

কিন্তু হায়, এ কথা শুনে ক্লাসঘরের কেউই একটুও হেসে উঠল না— বিশেষ করে আমি তো প্রায় আঁতকে উঠলাম। কারণ, তার এই বিশেষ ইচ্ছাটি— কোনও সার্কাস দলে বা অন্য কোথাও কাজ করার ইচ্ছাটি এমন অদ্ভুত জোরালোভাবে আর বিদঘুটে মুখভঙ্গি করে জানাল যে, সে হয়তো সত্যিই ভবিষ্যতে কোনওদিন দর্শকদের হাসিয়ে প্রায় অসুস্থ করে তুলতে সক্ষম হবে।

ওহে মালকে, তুমি যদি সার্কাসের বাঘ-সিংহের খেলা ও ঝুলন্ত দোলার মাঝখানে একবার কুমারী যিশুমাতার পূজার অনুষ্ঠানটি শুরু করে কৌতুক সৃষ্টি করতে চাও, তবে তা তো আসলে এক গম্ভীর ব্যাপার হবে, কোনওমতেই লোক হাসানোর মতো নয়—তাই নয় কি?

মালকে আসলে থাকত ওসটারসাইলেতে, ওএসটারসাইলেতে নয়। তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বাড়িটি ছিল ওখানকার রাস্তার দু'পাশের সারি সারি অনেক ছোট আকারের এক-পরিবারের জন্য বাড়িগুলির মধ্যে একটি। এই বাড়িগুলি এবং বাড়ির লাগোয়া বাগানগুলিও দেখতে এমনই একরকম যে কেবল বাড়ির নম্বর কিংবা জানালায় ঝোলানো পরদার রং দেখেই এদের তফাত করা সম্ভব হত।

প্রতিটি বাড়ির সামনের বাগানে শিকের ওপরে ঝুলত পাখিদের জন্যে খাবার রাখা ছোট কাঠের বাসা, আর ঝুলত বাগানে সাজানোর উপযোগী সিরামিকের ছোট আকারের নানান ধরনের পুতুল ব্যাঙ, ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদি। মালকের বাড়ির সামনে বসে থাকত এক পুতুল-ব্যাঙ। আর তার পাশের, ওপাশের সব বাড়িগুলির সামনেও বসে থাকত প্রায় একই ধরনের সবুজ রঙের ব্যাঙ। মালকের বাড়ির নম্বর ছিল চব্বিশ, ভোলফ্‌সভেগ বরাবর গেলে রাস্তার বাঁ-দিকের চার নম্বর বাড়িটি। আর সমান্তরাল রাস্তা ওসটারসাইল নিলে বাড়িটি বেয়েআরেনভেগ রাস্তার সমকোণ বরাবর পড়ত।

ওসটারসাইল ধরে ভোলফ্‌সভেগ বরাবর বাঁদিকে গিয়ে পশ্চিমমুখো তাকালে দেখা যাবে একটি বাড়ির লাল টালির ছাদের ওপরে দাঁড়ানো একটি ধূসর গোলাকার বুরুজ। আর এই রাস্তা বরাবর আর একটু এগিয়ে গেলে আরও চোখে পড়বে ওই বাড়িরই ছাদের ওপরে ঘণ্টা-বাজানোর গম্বুজটির বাঁদিকের অংশ।

যিশুখ্রিস্ট গির্জার এই ঘড়িওলা গম্বুজটি দাঁড়িয়ে আছে ওসটারসাইলে এবং ওএসটারসাইলের ঠিক মাঝখানে আর তার ওপরে রয়েছে বিরাট আকারের বড় বড় হরফে চিহ্নিত করা ঘড়িটি। এই ঘড়িটি সর্বদাই এই অঞ্চলের সব অধিবাসীদের, কী প্রোটেস্টানট কী রোমান ক্যাথলিক, ফ্যাকট্রি কর্মী, অফিস-কেরানি, দোকানের কর্মচারী, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, সবাইকে সময়মতো তাদের আপন কর্মস্থলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে এসেছে।

মালকে তার ঘরের জানলা থেকেই এই বিরাট ঘড়িটির পুব দিকের ডায়ালটি দেখতে পেত। ছাদের ঠিক নীচে মালকের এক জরাজীর্ণ ঘর, দেওয়ালগুলি বাঁকাচোরা, বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির ঝাপটা প্রায়ই এসে ভিজিয়ে দিত তার যত্ন করে আঁচড়ানো মাথা। আর তার এই ভাঙাচোরা ঘরটির মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা তার সংগৃহীত নানান ধরনের সামগ্রী: যুবকদের পছন্দসই এমনকিছু হাজিবাজি জিনিসপত্র, সংগ্রহ করা কিছু মৃত প্রজাপতি, নামজাদা চিত্রতারকাদের ছবির পোস্টকার্ড, বেশ কিছু নামকরা বোমারু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বিমান ও ট্যাংকচালক কমান্ডারদের ছবি। আর এই সবকিছুর মধ্যস্থলে বিরাজ করত হৃষ্টপুষ্ট চেহারার দুটি দেবদূত সহ ম্যাডোনার একটি ছবি। আর এই ছবিটির ঠিক নীচেই দেখা যেত নৌবহরের কোনও এক কমান্ডারের ছবি। এর সঙ্গে অবশ্যই ঝুলন্ত অবস্থায় দুলত মালকের অতি প্রিয় ও মূল্যবান ধর্মীয় মাদুলিটি।

মালকের ঘরে প্রথমবার ঢুকেই আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার কাপড়ের তৈরি সাদা রঙের প্যাঁচার ওপরে। আমার বাড়ি ছিল ওয়েস্টারে, মালকের বাড়ির থেকে খুব একটা দূরে নয়। এখন কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ে কথা বলতে চাই না, কথা বলতে চাই মালকে অথবা মালকে এবং আমার সম্বন্ধে। কিন্তু সবসময় তার চেহারা এইরকম: সে চুল মাঝখানে সিঁথি করে আঁচড়ায়, পরে থাকে হাই-হিল উঁচু ধরনের জুতো, গলায় সবসময়েই কিছু না কিছু ঝুলিয়ে রাখে বেড়ালকে ইঁদুরের প্রতি আকর্ষণ করানোর জন্যে, গির্জার বেদির সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে সূর্যের আলোয় ঝলসানো শরীরে একজন খাঁটি ডুবুরি।

আর শরীরের দুর্বলতা বা অবসাদ থাকা সত্ত্বেও সে সবসময়েই সব ব্যাপারে সবার চাইতে কিছুটা এগিয়ে থাকতে চেষ্টা চালাত। শরীরের যন্ত্রণা বা ক্লান্তি তোয়াক্কা না করে, এক ধরনের চাপা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে মালকে কাজ চালাতে পারত।

মালকের বাবা যত্নসহকারে, যৎসামান্য রং ব্যবহার করে, প্যাঁচাটির পায়ের নখগুলি সামান্য পরিবর্তন করে প্যাচাটি সুন্দরভাবে তৈরি করে রেখে গেছেন।

আর আমি চেষ্টা করছি ঘরের মাঝখানের দ্রব্যসামগ্রীগুলি থেকে, যেমন, সাদা প্যাঁচা, ম্যাডোনার তৈলচিত্র, দুষ্প্রাপ্য বড় আকারের মেডেলটি, এমনকী গ্রামাফোনটিও, যেটি সে বহু পরিশ্রম করে জলের তলায় ডুবন্ত নৌকা থেকে উদ্ধার করে আনে— যথাসাধ্য চোখ সরিয়ে রাখতে। জলের তলা থেকে সে কোনও গ্রামাফোন রেকর্ড পায়নি, সম্ভবত সেগুলি জলেতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু দম দেওয়ার হাতল লাগানো, এই গ্রামাফোন যন্ত্রটি বেশ নতুন মডেলেরই ছিল মনে হয় আর এটি সে নিয়ে আসে আরও বেশ কিছু রুপোর টুকিটাকি আকর্ষণীয় জিনিসের সঙ্গে, ডুবন্ত জাহাজের কোনও এক খাবারের কেবিন থেকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কেবিনটি ছিল জাহাজের মাঝখান বরাবর, অর্থাৎ আমাদের কারুর পক্ষেই, এমনকী শক্তিশালী বন্ধু হটন সোনটাগের পক্ষেও সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমাদের পক্ষে বড়জোর জাহাজের সামনের অংশতে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল। জলের তলার ঘন অন্ধকারের ঘিঞ্জি পথ দিয়ে, যেখান দিয়ে এমনকী মাছেরা যেতেও ভয় পায়, সেই কেবিনটির মধ্যে ঢোকার সাহস আমাদের মোটেই ছিল না।

গরমের ছুটি শেষ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে মালকে জলের তলা থেকে গ্রামাফোন যন্ত্রটি তুলে আনে। এই কাজটি সমাধা করতে তাকে জলে কমপক্ষে ডজন খানেকের মতো ডুব দিয়ে তল্লাশি করতে হয়। আগে নিয়ে আসা আগুন-নেভানোর যন্ত্রের মতো এটিও ছিল মেড-ইন-জার্মানি মার্কা। আগুন নেভানোর যন্ত্রটি তুলে আনার জন্যে কাজে লাগানো দড়িতে বেঁধে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এক ইঞ্চি করে এটিকে প্রথমে সে টেনে আনল জাহাজের মাঝ বরাবর, তারপরে আস্তে আস্তে জলের ওপরে, আর সবশেষে সেতুর ওপরে আমাদের চোখের সামনে এনে হাজির করল।

আমরা প্রথমে জলেতে ভাসমান কর্ক ও কাঠের টুকরো দিয়ে একটি ভেলা তৈরি করলাম, মরচে-ধরা ভারী এই যন্ত্রটি তার ওপরে রেখে, দড়ি দিয়ে বেঁধে, তারপর সেটিকে টেনে আনলাম জল থেকে ওপরে। এরপরে একমাত্র ক্লান্ত মালকে ছাড়া আমরা সবাই পালাক্রমে যন্ত্রটি বয়ে নিয়ে চললাম গন্তব্যস্থলে। ঠিক এক সপ্তাহ পরেই যন্ত্রটিকে দেখা গেল মালকের কামরায়; ভালভাবে তেল দিয়ে পালিশ করা, নতুন মেটালের পাত দিয়ে মোড়া, মেরামত করা ঝকঝকে পরিষ্কার অবস্থায়। রেকর্ড বাজানোর গোল চাকতির ওপরেও পরিষ্কার ভেলভেট কাপড় লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দম দেওয়ার হাতলটি বার কয়েক ঘুরিয়ে কোনও রেকর্ড ছাড়াই সে যন্ত্রটিকে চালিয়ে দিল গর্ব সহকারে।

এরপরে দু'হাত গুটিয়ে সে তার প্রিয় প্যাঁচা ও শান্ত অবস্থায় থাকা ইঁদুরটির পাশে এসে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ করতে লাগল। আর আমি, ঝুলন্ত তৈলচিত্রটির পাশে দাঁড়িয়ে, একঘেয়েমি দূর করতে, একবার তাকিয়ে দেখছি টলায়মান ঘুরন্ত গ্রামাফোনের চাকতিটির দিকে আর একবার লাল টালিওলা বাড়ির চিলেকোঠার জানলা থেকে দেখছি গির্জার গম্বুজের ওপরের বিরাট ঘড়িটির ডায়ালের দিকে। গির্জার ঘড়ি ঢং ঢং করে ছ'টি ঘণ্টা বাজার সঙ্গে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সঙ্গেই মালকের গ্রামাফোনের চাকাটি থেমে গেল। মালকে আরও বারকয়েক দম দিয়ে সেটাকে চালু রাখার চেষ্টা করল আর আমি যেন তার এই কর্মটি ভালভাবে লক্ষ করি দাবি করে বসল, অগত্যা আমাকে শুনতেই হল, এই ঘুরন্ত পুরনো গোলাকার চাকতি থেকে বেরিয়ে আসা নানান ধরনের বিরক্তিকর উঁচুনিচু আওয়াজ। হায়! মালকের কাছে তখন কোনও গ্রামাফোন রেকর্ড ছিল না!

ঘরের দেওয়ালের বেঁকে যাওয়া আলমারির বই-এর সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। কিছু ধর্মীয় বই সহ অনেক বইই হয়তো সে পড়ে থাকবে। জানলার তলায়, তাকের ওপরে সাজানো ছিল ভোলফ-ক্লাসের একটি টরপেডো ও গ্রিল-মডেলের একটি নৌকোর ছোট সাইজের মডেল।

অবশ্যই বলা দরকার যে, হাত ধোয়ার বেসিনের ওপরে একটি জলের গ্লাস রাখা ছিল। এর মধ্যে কিছু পরিমাণ ঘোলাটে বাসি জল আর সেই জলের তলার অংশে ইঞ্চি খানেকের মোটা এক চিনির স্তর দেখা যাচ্ছিল। মালকের কাজ হল প্রতি সকালে বিশেষ যত্ন করে এই ঘোলা দুধ রঙের তরল পদার্থটি চামচ দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে, তার মাথার পাতলা-দুর্বল চুল মজবুত করার কাজে লাগানো। কোনও সময়েই সে জলের বাসি তলানিটা ফেলে দেয় না।

এমনকী একবার সে অনুরোধ করায় আমিও এই ঘোলা চিনির জল মাথায় মিশিয়ে চুল আঁচড়াতে শুরু করলাম। এবং আশ্চর্যের কথা যে সত্যি সত্যিই এই আঠালো বস্তুটি সারা দিন আমার মাথার চুল টানটান শক্ত রেখেছিল। পরে, এই তাজ্জব বস্তুটি ব্যবহার করার পর আমার মাথা চুলকোতে লাগল, দু'হাত আঠায় চটচট করতে শুরু করল। হয়তো বা এমনও হতে পারে যে এ সব কিছুই ছিল আমার কল্পনামাত্র। আসলে হয়তো মাথাও চুলকোয়নি আর হাতে আঠাও লাগেনি।

মালকের নীচের তলাতে তিনটি ঘর, তার মধ্যে শুধু দুটি ব্যবহার করা হত। একটিতে থাকতেন তার মা ও পিসিমা, দু'জনেই ছিলেন বেশ শান্ত প্রকৃতির মানুষ। যতক্ষণ মালকে বাড়িতে থাকত, ততক্ষণ তাঁরা মালকের উলটোপালটা কাজকর্মের ফলে কিছুটা উদবিগ্ন হলেও, আসলে কিন্তু তাঁরা মনে মনে মালকের জন্যে বেশ কিছুটা গর্ব অনুভব করতেন।

তাঁদের স্থির ধারণা ছিল যে, মালকে তার ক্লাসের একেবারে সেরা ছাত্র না হলেও একজন বেশ মেধাবী ছাত্র। যদিও মালকে বয়সে আমাদের সকলের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
থেকে এক বছরের বড় ছিল, তবুও প্রথম দিকে স্কুলের পড়াশোনায় কিছুটা দুর্বল ছিল। তাই তার মা ও পিসিমা এই সুযোগে শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার অজুহাতে তাকে এক বছর পরে প্রাইমারি স্কুলে পাঠানো মনস্থ করলেন।

মালকের না ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, না করত খুব বেশি কঠোর পরিশ্রম কিংবা অপরের নামে কুৎসা রটানো। কেউ তাকে নকল করলে সে মোটেই বাধা দিত না। আসলে সে একমাত্র খেলাধুলা ছাড়া অন্য কোনও ব্যাপারে তেমন বিশেষ উৎসাহ দেখাত না।

অন্য দিকে, খেলার মধ্যে, ট্রেনার যখন কোনও নিকৃষ্ট চুটকি ছেড়ে মজা করার চেষ্টা করত, তখন সে খোলাখুলি ভাবেই এইসব নিম্নরুচির মজা করার প্রতিবাদ জানাত। একবার, যখন তার বন্ধু হটন সোনটাগ, পার্কের কোনও এক বেঞ্চি থেকে একটি ব্যবহার করা কনডোম ক্লাসে এনে, সেটি দরজার হাতলে বেঁধে টানাটানি করে মজা করার চেষ্টা করতে থাকে, তখনও সে এই ধরনের অপকর্মের প্রতিবাদ করতে ছাড়েনি।

আসলে এই বিশেষ কাজটি স্কুলের এক বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে হেনস্তা ও অপমান করার জন্যেই প্ল্যান করা হয়েছিল। মালকে এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করে আর ওই ভদ্রলোক তাদের ক্লাসরুমে ঢোকার আগেই ওই বিশেষ আঠালো বস্তুটি তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে তার ফল ও স্যান্ডুইচ্ রাখার কাগজের প্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে।

মালকের এই অ্যাকশন দেখে সবাই বাকশূন্য, কারও কাছ থেকে কোনও প্রতিবাদ এল না। এইভাবে মালকে আর একবার সবার সামনে প্রমাণ করল, এ কথা আজ আমি দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি, যে সে যা-কিছু করেছে বা করেনি যেমন জীবনে বড় হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা করেনি, কঠোর পরিশ্রমও করতে চায়নি কখনও, প্রত্যেককে তার ভেলকিবাজি নকল করার অবাধ অধিকার দিয়েছে, খেলাধূলার অনুষ্ঠানে সাড়া দিয়েছে সানন্দে, নিম্নরুচির কথাবার্তার বা আলোচনার প্রতিবাদ করেছে—এ ছাড়া আসল কথা হল, সে ভালভাবে জানত, ঘৃণ্য কাজকর্মের বিরুদ্ধে কেমন ভাবে মোকাবিলা করতে হয়।

এইসব গুণাবলির জন্যেই সে সত্যিই কালক্রমে হয়ে উঠল এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, অযাচিত ভাবেই পেয়ে গেল সবার প্রশংসা আর স্বীকৃতি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সার্কাসের একজন ভাল ক্লাউন হওয়া, মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে অগণিত দর্শককে আনন্দ দেওয়া ও প্রশংসা পাওয়া। আর এই ব্যাপারটি সম্পন্ন করার জন্যে এখন যদি সে একবার হরাইজেন্টাল বারে উঠে তার ভাঁজ করা পা-দুটি আর গলার ঝুলন্ত রুপোলি হারটি ঠিকমতো দোলাতে পারে, তা হলে তার উদ্দেশ্য সফল করতে আর বেশি দূর এগোতে হবে না।

সে এই প্রশংসার বেশিরভাগই অর্জন করত, যখন গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে, অন্যদের প্রশংসা উপেক্ষা করে, সমুদ্রের ধারে, ডুবন্ত জাহাজের ভেতরে ঢোকা ও তারপরে দ্রুত ওপরে উঠে-আসার কসরতটি সবাইকে দেখাত। আর মাঝে মাঝে বিফল হওয়া সত্ত্বেও একের পর এক বহুবার ডুব দিয়ে জলের তলায় ডুবন্ত নৌকোটি থেকে কিছু-না-কিছু উদ্ধার করে এনে আমাদের দেখাত। সে সময় আমরা তার এই প্রচেষ্টাকে কখনওই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখিনি। আমরা তাকে হাততালি দিয়ে আর প্রশংসা করে বলেছি, সাবাস মালকে, জবাব নেই! তোর মতো তাগত আর সাহস আমরাও পেতে চাই, তুই সত্যিই একটা শক্তিশালী বাঘের বাচ্চা! আমাদের একবার শুধু বল দেখি কী করে তুই জলের তলা থেকে প্রতিবার জিনিসপত্র তুলে আনতে পারিস?

মনে হল হাততালির প্রশংসা কাজে লেগেছে: দেখা গেল গলায় ঝুলন্ত হারটি কিছুটা শান্ত। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল যে, তার ওই হারটি হঠাৎ আবার একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এও হতে পারে যে, এই প্রশংসা বাক্যগুলি তাকে উলটোটা, অর্থাৎ একটু নার্ভাস করে দিয়েছে। অথচ তার মুখের ভাব শান্ত আর অনমনীয়। আর এই ভাবটির জন্যে আবার সে একবার তারিফ আদায় করে নিল সবার থেকে।

অহংকারী ছিল না সে মোটেই। কখনও সে কাউকে ধমকানির স্বরে বলেনি, করে দেখা দেখি আমার মতো একবার, তোদের মধ্যে আদৌ কেউ আমার মতো করতে পারবে কি? ভেবে দেখ দেখি একবার, গত পরশুদিন আমি কী ঝটপট, পরপর চারবার জলেতে ডুব দিয়ে ডুবন্ত নৌকোর মধ্যে থেকে টিনের পাত্রগুলি এনে হাজির করলাম।

এইসব টিনের পাত্রগুলির মধ্যে রান্না করা মাংস ছিল আর আমদানি হয়েছিল খুব সম্ভবত ফ্রান্স থেকে। প্রথমটার মধ্যে ছিল ব্যাঙের ঠ্যাং, স্বাদ কিছুটা গো-মাংসের মতো। সে আমাদের লক্ষ করে বলল, তোরা আসলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বুদ্ধু, আমি দিব্যি খেয়ে যাচ্ছি মনের সুখে, আর তোরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিস, একটু ট্রাই করতেও চাইছিস না।

এর পরে সে দ্বিতীয় কৌটোটি আনল, এই কৌটোটির মধ্যে খাওয়ার জন্যে এমনকী একটা চামচেও লাগানো ছিল। কিন্তু এবার তার ভাগ্য খারাপ, টিনের ভিতরের খাবার একদম পচে গেছে, পচা গো-মাংসের কী দুর্গন্ধ! বাপরে বাপ!

মালকে আমাদের সঙ্গে মোটেই রূঢ়ভাবে কথা বলত না। তার বদলে সে মাঝে মাঝেই অদ্ভুত ধরনের কাজকর্ম শুরু করত যেমন সে একদিন ডুবন্ত নৌকোর রান্নাঘর থেকে নিয়ে এল বেশ কিছু খাবারের টিন, যার ওপরের লেখা থেকে বোঝা যায় যে সেগুলি ফ্রান্স কিংবা ইল্যান্ডে তৈরি আর উপরন্তু সে জোগাড় করে আনল টিনগুলি খোলার একটি ওপেনার যন্ত্র। কোনও কথা না বলে, আমাদের সবার চোখের সামনে শুরু করল ব্যাঙের মাংস খাওয়া আর এই খাদ্য গলাধঃকরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওঠানামা করতে থাকল তার কণ্ঠনালিটিও। আঃ, আমি বলতেই ভুলে গেছি যে, শরীরটি রোগা টিংটিঙে হলেও মালকে ছিল একজন পাক্কা খাইয়ে মানুষ। টিনে ভরা খাবারের কৌটোগুলি প্রায় অর্ধেকের মতো শেষ করে, শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে সে মাত্র একটি টিন আমাদের সামনে তুলে ধরল। এদিকে তার ওই খাওয়াদাওয়ার ধরন দেখে তো বন্ধু উইল্টারের প্রায় বমি আসার দশা।

অবশ্যই তার এই অদ্ভুত ভোজন-কৌশল দেখানোর জন্যে সে আবার একবার আমাদের তারিফ আদায় করে নিল। কিন্তু ব্যাপারটি এখনও শেষ হয়নি, আরও কিছু বাকি আছে। এবার মালকে বাকি ব্যাঙের মাংস আর পচে যাওয়া গো-মাংস গাংচিলদের খাওয়াতে শুরু করল, চালাক চিলগুলি মালকের খাওয়ার সময় থেকেই কিছু উচ্ছিষ্ট খাবার পাওয়ার আশায় কাছাকাছি ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল। এবার মালকে খালি খাবারের টিনগুলি দলা পাকিয়ে, পাখিগুলির দিকে ওপরে ছুড়তে লাগল।

তারপর সবশেষে, এক বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজের জিনিস হিসেবে, টিন খোলার ওই যন্ত্রটিকে, বালি দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

আর তারপর থেকেই মালকে প্রায়ই ওই টিন খোলার যন্ত্রটি, তার প্রিয় ইংল্যান্ডের তৈরি স্ক্রুড্রাইভারটি ও তার মাদুলির সঙ্গে বেঁধে বেশ যত্নসহকারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গলায় ঝুলিয়ে রাখত। তবে সে এই বিশেষ যন্ত্রটি গলায় ঝুলিয়ে রাখত শুধুমাত্র যখন জলের তলায় ডুবন্ত জাহাজ থেকে টিনে-ভরা খাদ্যদ্রব্য খোঁজার কাজে নামত তখনই। তাজ্জব ব্যাপার হল যে, তার পাকস্থলীটি কখনও এইসব অখাদ্য-কুখাদ্য খাবার হজম করার অক্ষমতা জানায়নি।

একদিন সে তার ওই বিশেষ যন্ত্রটি ও অন্যান্য ঝুলন্ত জিনিসগুলি জামার মধ্যে লুকিয়ে স্কুলে হাজির হল। আর একদিন সে ওই সবকিছু নিয়ে হাজির হল সেন্ট ম্যারী গির্জার ভোরের উপাসনার আসরে। আর উপাসনা করার বেঞ্চিতে যখন পাদ্রি মহাশয় কিংবা পূজার বেদির সামনে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মাথা নত করে শ্রদ্ধাবনত হয়ে বসে আছেন, সেই সময়ে, হ্যাঁ ঠিক সেই সময়ে, তার জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখা ঝুলন্ত হার, মাদুলি, তৈলাক্ত টিন খোলার যন্ত্রটি সবকিছু, হঠাৎ বাইরে পড়ে যাওয়ায় এইসব জিনিসগুলি সবার দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়ল। ভাই মালকে, তুই চাস বা না চাস, আমি তোকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানাই। না, মালকে সত্যিই কোনওকালে কারও থেকে কোনও ভয় পায়নি, বা কোনওদিন কারও উমেদারি করেনি, বা কাউকে অযথা সম্মান দেয়নি।

সে ভালভাবে সাঁতার কাটা শিখেছিল। পরে সে কিন্তু বেশ কয়েকবার সপ্তাহান্তে রবিবারে, যুব-জনতা দলের নেতার দায়িত্ব নিয়ে দল পরিচালনা জাতীয় দক্ষিণপন্থী কাজকর্ম করতে অস্বীকার করায়, কর্তৃপক্ষ তাকে এই দল থেকে বহিষ্কার করে হিটলার-যুবকদলে স্থানান্তরিত করে দেয়। তার এই প্রতিবাদ করার সাহসিকতাকে আমাদের ক্লাসের সব ছাত্ররা আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দন জানালে, সে নিজস্ব শান্ত আর লজ্জিতভাবে তা গ্রহণ করল।

আর তারপর থেকে সে হিটলার-যুবকদলের একজন সাধারণ সভ্য হিসেবে, শুধুমাত্র প্রতি রবিবার সকালের সাধারণ কাজকর্মের দায়িত্ব নিল। এই প্রতিষ্ঠানে তার কাজ ছিল পনেরো-ষোলো বছরের যুবকদের দেখাশোনা করা। আর যদিও সে ভিতরে ভিতরে বিরক্তি ও অনিচ্ছা নিয়েই এই কাজ করত, তবে কেউই তার এই অনিচ্ছার ব্যাপারটা বাইরে থেকে ধরতে পারেনি।

আসলে হিটলার-যুবকদল প্রতিষ্ঠানটি যুব-জনতা প্রতিষ্ঠানের মতো অত রক্ষণশীল ছিল না, আর সে কারণেই মালকের পক্ষে এই দলের মধ্যে চুপচাপ গা ঢাকা দিয়ে থাকা সম্ভবপর ছিল। এ ছাড়া সে কোনওমতেই একজন অসামাজিক মানুষ ছিল না। সে নিয়ম করে সপ্তাহের প্রতিটি ট্রেনিং ক্লাসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যোগ দিত। নিজেকে সর্বদাই সে তৈরি রাখত কিছু কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানে, যেগুলি প্রায়শই আয়োজিত হয়ে থাকত, মন দিয়ে কাজ করার জন্যে।

এ ছাড়া সে সাহায্যমূলক কাজকর্ম, যেমন দরিদ্রদের জন্যে পুরনো জামাকাপড় ও জিনিসপত্র সংগ্রহ, শীতকালে রাস্তায় স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অর্থ সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজগুলি করতে বেশ আনন্দ পেত। মোদ্দাকথা, এইসব কাজগুলি করে সে তার রবিবারের গির্জার উপাসনা করার কাজটি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব করে তুলত।

তাকে যুব-জনতা দল থেকে হিটলার-যুবকদলে পাঠানোর ব্যাপারটি মোটেই সেরকম অস্বাভাবিক ছিল না। এই নতুন দলে সে ছিল প্রায় অজ্ঞাত এক অতি সাধারণ সভ্য মাত্র। আর অপর দিকে, আমাদের স্কুলে তার স্থান ছিল অন্যরকম। গত গ্রীষ্মকালে সমুদ্রতীরে তার বীরত্বমূলক সব কাজকর্মের জন্যে, স্কুলের সবাই তাকে প্রায় একজন প্রবাদ পুরুষের স্থানে বসিয়েছিল।

আর তুমি, মালকে তুমি ভালভাবেই বুঝেছিলে যে, আমাদের এই স্কুল ছাড়া, অন্য কোনও সাধারণ স্কুলে, যেখানে শুধু মাথায় রঙিন টুপি আর ইউনিফর্ম পরে, কেবল মিষ্টি বন্ধুত্বের বুলি আওড়ানো হয়, সেখানে কোনওমতেই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে না।

ওর হয়েছেটা কী? ওর ব্যাপার কী?

আমি উত্তর দিলাম, হয়তো মাথার কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।

এসব কিছুর কি ওর বাবার মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে?

ওর গলায় কেন আদৌ ওই মেটালের জিনিসগুলো ঝুলছে?

সবসময়ে উপাসনায় যোগ দেবার জন্যে ও এত ব্যস্ত কেন?

আমি জবাব দিলাম: মনে হয় উপাসনায় আসলে ওর তেমন বিশ্বাস নেই।

হায় ঈশ্বর, ও আজকাল বড্ড বেশি স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছে।

আর গলায় ঝুলন্ত ওই ঝুপঝাড় জিনিসগুলো, ওগুলোর ব্যাপার কী, অর্থ কী?

তুমিই জিগ্যেস করো ওকে, তুমিই তো ওকে প্রথম ইঁদুর-খেলা করা দেখিয়েছিলে, মনে পড়ছে?

এইসব নানান কথা ভাবতে ভাবতে আমাদের মাথা প্রায় খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। অথচ মালকে, তোমার এইসব আচরণের হদিশ কিছুই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আমরা ঠিকমতো ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। সাঁতার শেখার আগে পর্যন্ত আমাদের কাছে তোমার তেমন কোনও পরিচয়ই ছিল না বলা যায়, কখনও সখনও তোমার ডাক পড়ত, আর আমরা শুধু জানতাম যে তোমার নাম ছিল ইওয়াখিম মালকে, ব্যাস এই পর্যন্তই, এর বেশি নয়। আর আজ, বহুকাল পরে আমার ভালভাবেই মনে পড়ছে যে, তোমার সাঁতার শেখার আগেই, আমরা সবাই যখন একই বেঞ্চিতে সারি দিয়ে বসতাম, তুমি আমাদের পিছনের সারিতে বসতে। আর আমার জায়গা ছিল জানলার ধারে, বন্ধু শিল্যিঙের ঠিক পিছনেই।

পরে কে যেন জানাল, তুমি বেশ উঁচু পাওয়ারের একটি চশমা পরো, এ ব্যাপারটাও আমি মোটেই খেয়াল করিনি। আর তোমার ফিতে বাঁধা জুতোটি তখনই আমার চোখে পড়ত, যখন আমরা দেখতে পেতাম যে, তুমি একটি বড় আকারের জুতোর লম্বা ফিতে হারের মতো গলায় বেঁধে দিব্যি সাঁতার কেটে চলেছ।

নিত্যনতুন নানান ধরনের ভয়াবহ যুদ্ধ-ঘটনা তখন সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে, প্রথমে আমাদের ওয়েস্টারপ্লাটে অঞ্চলে, তারপরে রেডিয়োতে, সংবাদপত্রে, সর্বত্র যুদ্ধর তাণ্ডবলীলার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। এদিকে কিন্তু আমাদের মালকের কাজকর্ম, কী সাঁতার শেখার আগে কিংবা তার পরে, অতি স্বাভাবিক ভাবেই চলেছে। যুদ্ধের দামামা তার কাছে তেমন কোনও বড় আকারের ঘটনা হিসেবে দেখা দেয়নি।

এই অতি ক্ষুদ্র সাধারণ স্কুলের ছাত্রটি, যে একসময়ে না জানত সাঁতার কাটা, না পারত সাইকেল চালাতে, অথচ সে প্রায় একজন যুদ্ধের ক্যাপটেনের মতোই, নিজেকে ব্যস্ত রাখত সজাগ থাকতে। সমুদ্রের ধারে ডুবন্ত জাহাজ ও মাইন-সুইপারের খুঁটিনাটি অংশের তদারকি ও অনুসন্ধানের কাজকর্ম নিয়ে সময় কাটাত।

আমাদের পোল্যান্ডে তৈরি ডুবন্ত এই জাহাজটি আকারে খুব বড় না হলেও বেশ উন্নত ধরনের ছিল। আমরা এই ধরনের নতুন জাহাজের, বিশেষত ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সে তৈরি জাহাজগুলির কামান-যন্ত্রের ধরন, মাল বহনের ক্ষমতা, চলার গতি, সবকিছুই সঠিকভাবে জানতাম। গড়গড় করে প্রায় মুখস্থ বলে দিতে পারতাম যাবতীয় ইতালীয় যুদ্ধ-জাহাজ আর এমনকী পুরনো ব্রাজিলিয়ান সাঁজোয়া-জাহাজের নামগোত্র সবকিছুই। পরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মালকেও ক্রমশ এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল, শিখে ফেলল কেমন করে পুরনো ও নতুন জাপানি যুদ্ধজাহাজের কঠিন নামগুলি, যেমন, হুমিডুকি, সাটুকি, যুডুকি, হোকাশা, নাডাকাসে ও ওইটে প্রভৃতি, দ্রুত আর পরিষ্কারভাবে আওড়ানো যায়।

পোল্যান্ডের যুদ্ধজাহাজ, ব্লিচকাভিচা ও গ্রোম, এই দুটির নাড়ি-নক্ষত্রর সংবাদ আনতে আমাদের মোটেই বেশি সময় লাগেনি। পোলিশ নৌবহরের এই দুটি দু'হাজার টন ও আটত্রিশ নটের জাহাজকে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র দু'দিন আগে, কোনও কারণে সরিয়ে ফেলা হয়। এটিকে পাঠানো হয় ইংল্যান্ডের কোনও এক বন্দরে আর তারপরে নাম বদলে ইংরেজ-নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত করানো হয়। মজার কথা হল যে, ব্লিচকাভিচার মডেলটি এখনও দেখা যায়, যদিও কেবলমাত্র ডিনিয়া-অঞ্চলের এক ভাসন্ত নৌবহরের মিউজিয়ামে। স্কুলের শিক্ষকেরা মাঝে মাঝে তাঁদের ছাত্রদের এটি দেখাতে নিয়ে যান।

আর তেত্রিশ-নট দ্রুতগামী ও পনেরোশো টন ওজনের ধ্বংসকারী জাহাজ বুরজা-কেও একইভাবে ইংল্যান্ডের একটি মিউজিয়ামে পাঠানো হয়। পাঁচটি পোলিশ সাবমেরিনের মধ্যে শুধু ভিল্ক নামের ও এগারোশো টন ওজনের ওরসেল নামক সাবমেরিনটি, ক্যাপটেন ও মানচিত্র ছাড়াই এক দুঃসাহসিক যাত্রা শেষ করে, সফলভাবে এক ইংরেজ বন্দরে পৌঁছে যায়।

আর রীস, স্বীক ও সেম্প নামের তিনটি জাহাজ সুইডেনের কোনও বন্দরে আটক হয়ে যায়।

অন্য দিকে, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়েই কেবলমাত্র সৈন্যদের ট্রেনিঙের কাজেই ব্যবহার করার যুদ্ধপোতগুলি পোল্যান্ডের ডিংগেন, পুৎসীগ ও হেলা প্রভৃতি বন্দরে নোঙর করে থাকত। গ্রীফ নামের একটি বেশ বড়, প্রায় দু'হাজার টন ওজনের এবং তিনশোটি মাইন বহনকারী যুদ্ধজাহাজ, যেটি নরম্যান নামক ডকইয়ার্ডে তৈরি হয়েছিল, সেটিও নোঙর করেছিল সেখানে। তা ছাড়াও আরও বেশ কিছু জাহাজ, যেমন ডেসট্রয়ার জাহাজ হিসেবে ভিকার, কিছু পুরনো মডেলের জার্মান টরপেডো-জাহাজ, আর জাকিয়া-মডেলের মাইন বহনকারী ছয়টি জাহাজ সেখানে ছিল।

এই জাহাজগুলির গতি ছিল আঠারো নট, সামনে কামান ছোড়ার জন্যে পঁচাত্তর মিলিমিটারের নল বিশিষ্ট চারটি মেশিনগান, যেগুলি ঘুরন্ত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অবস্থাতেও কাজ করতে পারত। আর উপরন্তু এরা বহন করতে পারত কুড়িটির মতো মাইন। আর এই ধরনের একটি একশো পঁচাশি টনের বিশাল জাহাজও ছিল সেখানে। এটি সম্ভবত তৈরি করা হয়েছিল শুধুমাত্র আমাদের মালকের জিনিসপত্র খোঁজার জন্যে।

ডান্‌সীগ উপসাগরের নৌযুদ্ধটি পাক্কা একমাস চলে, সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে অক্টোবরের শুরু পর্যন্ত। হেলা নামে ছোট দ্বীপটির আত্মসমর্পণের পরে এই যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের মোট হিসেবটি দাঁড়ায় এই রকম: পোলিশ-ইউনিটের তিনটি জাহাজ, গ্রীফ, ভিকার আর বালটিক আর সঙ্গে জাকিয়া-ক্লাসের তিনটি মাইন-সুইপার, মেভা, জাসকোলা ও জাপলা—কামানের গোলায় ধ্বংস হয়ে বন্দরের জলেতেই নিমজ্জিত হয়। আরটিলারির কামানের গোলার আঘাতে জার্মান ডেসট্রয়ার লেবেরেখটকে জখম হতে হয়, মাইন-সুইপার এম-৮৫টি হাইসটারনেস্ট নামক অঞ্চলের কাছাকাছি গিয়ে কোনও সাবমেরিনের গোলার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে নৌবহরে কর্মরত সৈন্যদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মতো মানুষ প্রাণ হারায়।

যুদ্ধের লাভ হিসাবে পাওয়া যায় শুধুমাত্র ও হালকা জখম হয়ে যাওয়া তিনটি জাকিয়া-ক্লাসের সাবমেরিন। আর সুরাভ, জাকিয়া নামক দুটি জাহাজ ও দুটি সাবমেরিন মেরামত করে, যথাক্রমে অসটহোয়েফট ও ভেস্টারপ্লাটে নতুন নাম দিয়ে কাজে লাগিয়ে নেওয়া হয়।

আর রিবিটভা নামে তৃতীয় জাহাজটিকে হেলা বন্দর থেকে সরিয়ে আনার সময় দেখা যায় তার মধ্যেকার একাধিক ছোট-বড় ছিদ্র দিয়ে ক্রমাগত ভিতরে জল ঢুকতে থাকে। অর্থাৎ, এটির ভাগ্যে জলের তলায় ডুবুরি মালকের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু লেখা ছিল না। কারণ, মালকেই তো গত গ্রীষ্মে, এই ডুবন্ত জাহাজটির ভিতর থেকে এমনকিছু দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে আনে, যার ওপরে রিবিটভা নামটি খোদাই করা ছিল। যদিও পরে অবশ্য লোকমুখে শোনা যায় যে, কড়া জার্মান পাহারাদারদের চাপে পড়ে একজন পোলিশ অফিসার ও তাঁর সহকর্মীদের বাধ্য করানো হয়, জাহাজটিকে কিছুটা চালিয়ে জলে ডুবিয়ে দিতে।

এই কারণে, কিংবা হয়তো অন্য কোনও কারণে, জাহাজটি নয়ফার বন্দরের কাছাকাছিই একটি বালির চরে এমনভাবে ডুবে থাকে যে, সেটিকে ওপরে তোলা সম্ভবপর ছিল, কিন্তু তা না করে সেটিকে সারা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যুদ্ধকালীন সময়টাই অল্প জলের তলায় শুইয়ে রাখা হয়। জাহাজটির মাঝের কিছু অংশ, ধারের রেলিঙের বেশ কিছুটা অংশ, দেওয়ালের কিছু ভাঙাচোরা ভেন্টিলেটার, সামনের কামান রাখার অংশটি, (কামানগুলি আগেই সরিয়ে ফেলা হয়), সবকিছুই জলের ওপরে জেগে ছিল। এ দৃশ্য দেখলে প্রথমে দুঃখজনক বা বেশ আশ্চর্যজনক মনে হলেও আস্তে আস্তে এসব লোকের চোখে সয়ে গিয়েছিল। ভাই মালকে, তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করার ব্যাপারে এই আধা-ডুবন্ত জাহাজটিই আসলে তোমাকে পথ দেখিয়েছে।

ঠিক যেমন, পোলিশ যুদ্ধজাহাজ গেনিসেনাউ, যেটিকে '৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডুবিয়ে দেওয়া হলেও পরে এটি পোল্যান্ডের স্কুলের ছাত্রদের জন্যে বেশ আকর্ষণীয় স্থান হয়ে ওঠে। যদিও ছাত্রদের পক্ষে জলের তলায় গিয়ে, এই জাহাজের ভিতর থেকে অনেক কিছুই তুলে আনা সম্ভব হলেও, মনে হয় না তাদের মধ্যে একজনও মালকের মতো এত করিতকর্মা বা উৎসাহী ছিল।

তিন

শারীরিক কোনও বিশেষ সৌন্দর্য মালকের মধ্যে ছিল না বললেই হয়। তার অতি লম্বা আকারের কণ্ঠনালিটিকে হয়তো সামান্য মেরামত করতে পারলে মন্দ হত না। আর আসল গণ্ডগোল ছিল কিন্তু তার বিদঘুটে গড়নের কার্টিলেজটি নিয়েই, অথচ এটিই ছিল তার আসল পরিচয়ের প্রতীক-বাহন। অবশ্য একথা বলা উচিত যে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাত বিচার করে কোনও মানুষেরই সৌন্দর্য বিচার করা যায় না। মালকে তার শরীরটি ভালভাবে দেখালেও, তার হৃদয়টিকে কিন্তু কোনও সময়েই আমার কাছে খুলে ধরেনি। তাই আমরাও কখনওই ধরতে পারিনি, তার মাথার মধ্যে কখন কী ধরনের চিন্তা ঘুরছে।

তাই শেষ পর্যন্ত তার যে আসল পরিচয়টি আমাদের কাছে সর্বদা প্রকাশ পায় তা হল: তার দীর্ঘ গলাটি আর এই গলার সঙ্গে ঝুলন্ত নানাবিধ ভারী দ্রব্যসামগ্রীর ছবিটি। এ কথা সত্যিই ঠিক যে, সে স্কুলে যাওয়া কিংবা জলের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নীচে ডুব-সাঁতার দেওয়ার আগে, প্রচুর পরিমাণে মাখন-রুটির স্যান্ডুইচ সঙ্গে রাখত। আর তার কারণও ছিল পরিষ্কার: তার ক্ষুধার্ত কণ্ঠনালি ইঁদুরটিকে ভূরিভোজন করিয়ে সর্বদা শান্ত রাখা।

আর সে নিয়মিত কুমারী-মা'র ছবির সামনে উপাসনা করলেও এই ছবিটি তাকে খুব যে আকর্ষণ করেছিল তা মনে হয় না। আর এটা ভালভাবেই বোঝা যেত, জোড়হাতে উপাসনা করার সময়ে তার ওই গলার নলিটি ওঠানামা করত, কারণ ওই সময়েই সে লুকিয়ে লুকিয়ে মুখে তার স্যান্ডুইচ-রুটি ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে, চিবিয়ে চিবিয়ে তা গলাধঃকরণ করত। আর জোড়হস্তে উপাসনার সময়ে যদিও সে প্রাণপণে চেষ্টা করত তার কণ্ঠনালিটিকে কিছুটা শান্ত করে রাখতে, তথাপি তার কণ্ঠনালীটি, গলায় ঝোলানো জুতোর ফিতে আর অন্যসব ভারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে ক্রমাগতই ওঠানামা করে চলত।

শুধু ওই কুমারী-মাতার ছবিটি ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে মালকের কোনও সম্পর্ক ছিল না বলা যায়। বাড়িতে কি তার কোনও বোন ছিল? আমার ভাগনিরাও তার প্রতি তেমন কোনও ইচ্ছা প্রকাশ তাকে কখনও দেখিনি।

টুলা পোকরিফকা মেয়েটির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটি ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এই মেয়েটি তার টিংটিঙে কাঠির মতো পা নিয়ে খুব বেশি হলে, হয়তো কোনও সার্কাসদলে, ধরা যাক একটি ছেলে হিসেবেই, ক্লাউন মালকের খেলা দেখানোর কাজে সাহায্য করতে পারত। সে যাই হোক, একবার এই মেয়েটি তার ইচ্ছানুসারে, সমুদ্রের-বিচে আমাদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে আসে। অথচ এই মেয়েটিকে আমাদের দলে নিয়ে, তার সঙ্গে একত্রে আদৌ কী করতে পারি, সে ব্যাপারে আমরা কোনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি। আর যখন আমরা সবাই পোশাক বদলানোর জন্যে, প্রায় উলঙ্গ হয়ে বালির ওপরে বসতাম, বেশ দেখতে পেতাম যে, এসব দেখে সে যেন কোনও রকম লজ্জার ভাব দেখাত না।

তার মুখের আকৃতিটি এমন অদ্ভুত ছিল যে, তা শুধুমাত্র কোনও ভাষার কমা-ফুলস্টপ চিহ্নের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারত। আর যেভাবে সে সাঁতার কাটত, তার ফলে তার পায়ের পাতায় হাজা ধরে যাওয়াও অস্বাভাবিক ছিল না।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল, ওই অঞ্চলের জলে ভাসন্ত উদ্ভিদ আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গাংচিলের বিষ্ঠার নানারকম দুর্গন্ধের সঙ্গে আরও একটি গন্ধ, এই মেয়েটির গায়ের থেকে বেরোনো বিদঘুটে, কড়া ধরনের কোনও রঙের গন্ধ এসে মিশত। পরে জানা যায়, এই মেয়েটির পিতা বেশ কিছুকাল ভাইয়ের ওয়ার্কশপে, কাঠের আসবাবপত্রে রং লাগানোর কাজে যুক্ত ছিল, আর সেই সূত্র থেকেই বোধহয় তার শরীর থেকে এই গন্ধের আগমন।

টুলার শরীরের গড়ন ছিল বেশ রোগা ধরনের আর সে স্বভাবগতভাবে ছিল সদা কৌতূহলী। মেয়েটি চুপচাপ বসে, চিবুকটা দু'হাতে ধরে, ধীরে সাঁতার কাটায় রত বন্ধু উইন্টার ও এশো-কে লক্ষ করত আর মাঝে মাঝে হঠাৎ কিছুটা ধমকানির সুরে বলে উঠত, আশ্চর্য, এইটুকু দূরত্ব কাটতে তোমাদের এত সময় লাগে! আর যখন আমরা সত্যিই লম্বা সাঁতার কেটে, ক্লান্ত শরীরে ফিরে, জাহাজের মরচে-ধরা হাতল ধরে বিশ্রাম নিতে শুরু করি, ঠিক তখনই শুরু হত এই মেয়েটির ছটফটানি করে কথা বলা।

পরে সে তার পেট ও বুক সোজা রেখে, জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত, বাচ্চা বেড়ালের মতো চোখ দুটি ইতিউতি করে চারিদিকে কী যেন একটা কিছু খুঁজত। আর ঈশ্বর জানেন— মালকেকে নকল করে, কোনও কিছু একটা আবিষ্কার করার চেষ্টাও হয়তো করত। দ্রুত আবার জল থেকে উঠে ডাঙায় এসে বসত কিছুক্ষণ, তারপরেই আবার হাঁটুর ওপরে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াত। সবশেষে রোগা ও বাঁকা পা দুটি জড়ো করে, পায়ের লম্বা বুড়ো আঙুল দিয়ে, সমুদ্রের তীরে জমে থাকা নোংরা কিছু জলজ-বস্তু চাপ দিয়ে এমনভাবে খেলা করত, যাতে সেগুলি থেকে লাল রঙের রক্তের মতো তরল পদার্থ বেরিয়ে আসত। আর তার এই অদ্ভুত কর্মটি দেখে সবাই সোল্লাসে বলে উঠতাম: সাবাস, দারুণ, চমৎকার—আবার একবার কর্ দেখি।

এ ছিল শুধুই খেলা— এক ধরনের অতি সাধারণ খেলাই বলা যায় একে। টুলার কাছে কিন্তু এটি একেবারেই শুধু একঘেয়েমির কোনও একটি খেলা ছিল না, বরঞ্চ তার কাছে সেটি ছিল বেশ মজাদার ব্যাপার। নাকি সুরে সে আমাদের সবাইকে বলতে লাগল, কে পারো, দেখাও দেখি আমার এই খেলাটি একবার করে! এই বলতে বলতে সে আমাদের মধ্যে থেকে কোনও এক বোকাসোকা, ভালমানুষকে খুঁজে বার করে বলত, তুমি, হ্যাঁ, মনে হয় তুমি এখনও কিসসু করোনি, তুমিই এবার খেলাটা শুরু করো দেখি। অগত্যা, নিরীহ ছেলেটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেলাটি শুরু করতে বাধ্য হত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর মাত্র একজন মানুষই ছিলেন আমাদের মধ্যে, যে যতক্ষণ না পর্যন্ত, এই টুলা মেয়েটি তার ধমকানির সুর পালটে, ভালভাবে আন্তরিক ভাষায় অনুরোধ করত, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথায় কান দিত না, সেই ব্যক্তিটি হলেন আমাদের বিখ্যাত সাঁতারু ও ডুবুরি মালকে।

অন্যদিকে আমরা বাকি সবাই, প্রত্যেকে যখন প্রায় বাইবেলের কড়া নিয়মানুসারে নিজ নিজ কাজ করে যেতাম, তখন একমাত্র মালকেই, সাহস দেখিয়ে, ও আমাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, স্নানের পোশাক পরে, তার চোখের স্থির দৃষ্টি হেলাটে নামের কোনও একটি মেয়ের দিকে নিবদ্ধ করে রাখতে পারত। আর আমাদের ধারণা হয়েছিল, সে হয়তো তার বাড়িতে, তার নিজের ঘরে, তার প্রিয় সাদা প্যাঁচা ও ম্যাডোনার ছবিটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই একই খেলা চালিয়ে যেত।

মালকে জলের তলা থেকে আবার ওপরে উঠে হাজির হয়েছে, ঠান্ডায় তার শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। জলের তলা থেকে দেখানোর মতো তেমন কিছু জিনিসও তুলে আনেনি। বন্ধু শ্যিলীং এইমাত্র টুলার ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে কী একটা কাজ শেষ করে আমাদের কাছে এসেছে। সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে তদারকি করার কাজে রত একটি ছোট জাহাজ নিজ অশ্ব-শক্তিতে বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করছে—এক শান্ত পরিবেশ।

টুলা আবার একবার চিৎকার করে শ্যিলীং-কে অনুরোধ করল, আবার একবার করো দেখি। শ্যিলীং-ই একমাত্র মানুষ, যে সবার অনেক ধরনের আবদার মিটিয়ে, অনেক কাজ করে দিত। ওদিকে জাহাজের আশেপাশে, জলের ধারে পট বা অন্য কোনও রকমের মাছের চিহ্নমাত্র নেই।

স্নানের পরে এখন আর কিছু করতে চাই না, কাল আবার করা যাবে, এই বলে শ্যিলীং টুলাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। টুলা এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে, পায়ের আঙুলের ওপরে ভর করে সারা শরীরটা সোজা করে তুলল, দোল খাওয়ার ভঙ্গিতে সরাসরি মালকের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। আর আমাদের মালকে ভায়া তখন, তার প্রিয় জায়গা কম্পাস-হাউসের পিছনের ছায়ার তলায় গিয়ে, কাঁপন্ত ঠান্ডা শরীরে দাঁতে দাঁতকপাটি মেরে কাঁপতে শুরু করেছে।

এদিকে আমাদের সামনে, একটি ছোট জাহাজ, কামান লাগানো বড় আকারের একটি অচল জাহাজকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টুলা মালকেকে অনুরোধ করতে লাগল: তুমি কি আর একবার করবে না? আর একটিবার করো না ভাই? তুমি কি করতে চাও-না? না করতে পারো না? নাকি এসব করার তোমার কোনও অধিকার নেই?

কিছুটা ছায়া-ঢাকা একটি নিরিবিলি জায়গায় এসে মালকে তার ডান ও বাঁ হাতের এপিঠ-ওপিঠ দিয়ে টুলার জলে ভেজা ছোট আকারের মুখটি মুছে দিতে লাগল। তার নিজের গলার নলিটি আর গলায় ঝোলানো স্ক্রুড্রাইভারটিও এই সময়ে দ্রুত গতিতে নড়াচড়া শুরু করে দিল। কান্নাকাটির বদলে, টুলা তার মুখ বন্ধ-করা এক চাপা প্রতিবাদের হাসি হেসে, নিজের গায়ে জড়ানো ইলাসটিক-বেল্টটি টেনে খুলে মালকের দিকে ছুড়ে দিল ।

মালকে তার নিজের পরিচিত ছায়ার তলার জায়গাটিতে ফিরে যাবার আগে টুলাকে বলল: ঠিক আছে? এসব কিছুই করলাম শুধুমাত্র একবার তুমি শান্ত হয়ে মুখটি বন্ধ করে চুপ করে থাকো।

টুলা এবার সত্যিই সবকিছু বন্ধ করে শান্তভাবে, তার দু'পা ভাঁজ করে মালকের সামনে এসে দেখতে লাগল কীভাবে মালকে তার সাঁতারে ভেজা পোশাকটি হাঁটুর নীচে পর্যন্ত টেনে নামাচ্ছে।

পুতুল নাচের সার্কাসে, শিশুরা তাদের চোখের সামনে যদি দেখতে পায় যে, একজন জাদুকর তার হাতের কনুই সামান্য নাড়িয়েই, তার লেজটি এত বড় করে ফেলতে পারে, যে সেই লেজটি অনায়াসে পাইলট-হাউসের ছায়া-ঢাকা অঞ্চল পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছে যায় বেশ দূরের কোনও অঞ্চলে, তবে তারা নিশ্চয়ই খুবই অবাক হয়ে যেত। আর আমরা যখন সবাই মিলে মালকের সামনে গিয়ে একটি অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়ালাম, তখন সে আবার ছায়ার তলায় তার জায়গাটিতে ফিরে গেল।

আমি কি একবার, শুধুমাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে একবার, অনুরোধ করতে লাগল টুলা। মালকে তার মুঠি পাকানো ডান হাতটি নামিয়ে নিয়ে তাকে সম্মতি জানাল। টুলার নোংরা হাতের কৌতূহলী আঙুলগুলি গিয়ে, মালকের প্যান্টের তলায় লুকিয়ে থাকা ও শিরাযুক্ত স্ফীতাকার জিনিসটিকে চেপে ধরল। বন্ধু ইউরগেন কুপকা চিৎকার করে উঠল, মেপে দেখো জিনিসটিকে। টুলা মেপে দেখল, একটা পুরো মুঠি আর একটা অর্ধেক মুঠির মতো লম্বা হবে। প্রথমে একজন এবং তারপরে আরও কয়েকজন ফিস ফিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
করে বলল, কমপক্ষে বারো ইঞ্চি হবে। সন্দেহ নেই যে এটা বেশ কিছুটা বাড়াবাড়ি করেই বলা।

এদিকে বন্ধু শ্যিলীং, যে এখনও পর্যন্ত সবচাইতে দীর্ঘ লিঙ্গধারী হিসেবে সবার কাছে সুপরিচিত ছিল, সত্যাসত্য মিলিয়ে নেবার জন্যে সে তার লিঙ্গটিকেও প্যান্টের বোতাম খুলে বার করল, সেটি ম্যাসেজ করে আস্তে আস্তে শক্ত ও খাড়া করল, আর তারপরে মালকের লিঙ্গটির পাশে এনে হাজির করল। পরীক্ষার ফল: মালকের যন্ত্রটি শ্যিলীং-এর চাইতে বেশি মোটা, এক দেশলাই-বক্সের চাইতে বেশি লম্বা, পরিণত, কার্যক্ষম আর দেখতে বলশালীও বটে।

মালকে, কোনও ধরনের তরল পদার্থ ত্যাগ না করে, গর্বভরে আর কিছুটা ঘটা করেও তার যৌন লিঙ্গটি বেশ বার কয়েক সবাইকে দেখাতে লাগল।

আর তারপরে এসব কাজ ছেড়ে সে তার হাঁটু অল্প বেঁকিয়ে কম্পাস-হাউসের পিছনের বাঁকা রেলিংটির ওপরে ভর করে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল, কেমন করে একটি নতুন বিরাট জাহাজ, তার অপেক্ষাকৃত ছোট চিমনিগুলি থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বন্দর থেকে ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগল। পথের মধ্যে আর একটি গাংচিল-মার্কা টরপেডো জাহাজ, ওই একই রাস্তা ধরে বন্দর ছাড়ার উদ্যোগ করছিল। বড় জাহাজটি সে জন্যে নিজের দিক পরিবর্তন করার কোনও প্রয়োজন বোধ করল না।

মালকে তার পায়ের আঙুলগুলি এগিয়ে দিয়ে, জলে ভেজা মাঝ-সিঁথিতে ভাঁজ করা চুলগুলি নিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে, তার উন্মুক্ত লিঙ্গ সহ সারা শরীরটি সবাইকে আবার দেখাতে লাগল। একদিকে বেশ বড় আকারে জেগে ওঠা তার যৌনলিঙ্গটি আর অন্য দিকে সর্বদা সবার দৃষ্টি আকর্ষণকারী গলার নলিটি, সব মিলিয়ে মালকের শরীর অতি বিদঘুটে দেখালেও, কোথাও যেন একটা সামঞ্জস্য বিরাজ করছিল।

মালকে তার যৌনলিঙ্গটি নেড়েচেড়ে প্রথম বীর্যরসের পিচকিরি ছেড়েই, তারপরে আবার বারকয়েক বেশ উঁচু করে ছাড়তে শুরু করল। বন্ধু উইন্টার তার ওয়াটার-প্রুফ হাতঘড়ি দিয়ে এই পুরো প্রক্রিয়াটির সময় মেপে জানাল যে, মালকের এই কর্মটি চলে ঠিক তত সেকেন্ড সময় ধরে, যতটা ওই টরপেডো-নৌকোর জেটি থেকে বয়া পর্যন্ত পৌঁছোতে সময় নিয়েছিল। তাই, টরপেডো-নৌকোটি ঠিক যখন বয়াতে এসে হাজির হল, ঠিক সেই মুহূর্তে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মালকে প্রচুর পরিমাণে তার শেষ পিচকিরিটি ছেড়ে বীর্যত্যাগ প্রক্রিয়াটি শেষ করল। এদিকে ওপরে উড়ন্ত গাংচিলগুলিকে এই বিশেষ সাদা রঙের বস্তুটির লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে আসতে দেখে আমরা সবাই মালককেকে বাহবা দিয়ে সোল্লাসে চিৎকার শুরু করে দিলাম।

মালকের মোটেই প্রয়োজন ছিল না, পিচকিরির মতো তার বীর্যরস ছিটানোর কাজটির পুনরাবৃত্তি করার। কারণ আমাদের মধ্যে কারওই ক্ষমতা ছিল না, স্নান ও ডুব-সাঁতার সেরে, ক্লান্ত শরীরে এই ধরনের ক্ষমতা দেখিয়ে তার রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার।

তারপরে এসব ছেড়ে, স্পোর্টের বাঁধাধরা নিয়ম কানুন মেনে, আমরা আবার অন্য ধরনের সাধারণ খেলাধুলো শুরু করে দিলাম।

একমাত্র টুলা পোকরিফকা মেয়েটি, যার মনে মালকে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল, সব সময়েই নৌকোর ওপরে কিংবা অন্যত্র মালকের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। এমনকী মেয়েটি তাকে বেশ কয়েকবার কী যেন করার জন্যে অনুরোধ করলেও মালকে তার এই ইচ্ছে ভদ্রভাবেই নাকচ করে দেয়। টুলা মালককেকে প্রশ্ন করে, তোমার এই পিচকিরি ছাড়ার কাজটির জন্যে কি তোমাকে গির্জাতে গিয়ে পাদরি মশাইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে? মালকে, সম্ভবত টুলার দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে, একবার শুধু ঘাড়টি নেড়ে তার প্রিয় স্ক্রুড্রাইভারটি নিয়ে নিজের মতো আবার খেলা শুরু করে দিল।

টুলার অনুরোধ, আমাকে একবারটি জলের তলায় নিয়ে চলো, ওখানে আমার একা যেতে ভয় করে। আমার মনে হচ্ছে জলের তলায় নিশ্চয়ই একটা মৃতদেহ কোথাও লুকিয়ে আছে।

হয়তো জলের তলা থেকে নতুন কিছু শেখা বা পাওয়া যেতে পারে এই আশায়, মালকে টুলাকে শেষ পর্যন্ত জলের তলায় নিয়ে যেতে রাজি হল।

মালকে বেশ অনেকক্ষণ সময় টুলাকে জলের তলায় রেখেছিল। আর যখন সে টুলাকে ওপরে নিয়ে এল, তখন টুলা কোনওক্রমে তার ক্লান্ত আর হলুদ হয়ে যাওয়া শরীর নিয়ে, মালকের হাতের ওপরে এলিয়ে পড়ল। আর আমরা তার কিছুটা আহত হয়ে যাওয়া, হালকা শরীরটি কোনওভাবে সোজা হয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করতে লাগলাম।

এরপরে টুলা অবশ্য খুব বেশি দিন আমাদের সঙ্গে জলে নামেনি। পরে কিন্তু সে নিয়ম করে সমুদ্রের বিচে, তার বয়সি অন্যান্য মেয়েদের থেকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বেশি সাঁতার কাটতে ও স্নান করতে শুরু করে। আর মাঝে মাঝেই সে, জলে ডুবে থাকা কোনও এক অজানা মৃত সৈনিকের কথা বারবার বলে আমাদের সকলের মাথা প্রায় খারাপ করে দিত। অন্য কিছু ছাড়া, এটাই হয়তো ছিল তার কথা বলার সব চাইতে প্রিয় বিষয়। সে সবাইকে উদ্দেশ করে একদিন বলেই ফেলল, যে ওই মরা সৈনিকটির শরীর জলের তলা থেকে তুলে আনতে পারবে, সে প্রতিদান হিসেবে আমার কাছ থেকে যা চাইবে তাই পাবে।

তারপরে নিজেদের মধ্যে কোনও বোঝাপড়া না করেই, আমরা ও মালকে আলাদা আলাদা ভাবে, ডুবন্ত সেই আধা উন্মুক্ত পোলিশ জাহাজটির মধ্যে গিয়ে জিনিসপত্র খোঁজাখুঁজি করতে লেগে গিয়েছিলাম। মালকে ছিল জাহাজের সামনের দিকে আর আমরা ছিলাম পিছনের মেশিন-ঘরের দিকে। আহামারি কিছু আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে নয়, শুধুমাত্র কৌতূহল বশতই আমরা এই কাজে নেমেছিলাম। মালকে, তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, শুধু কিছু জলে প্রায় পচে যাওয়া জামাকাপড়, যে সবের মধ্যে ছোট ছোট মাছেরা লুকিয়ে খেলা করত, ওপরে নিয়ে এল। আর এগুলি দেখা মাত্রই, ওপরে উড়ন্ত গাংচিলেরা, নতুন খাবার পাওয়ার আশায় ও আনন্দে চেঁচাতে শুরু করে দিল।

না, মালকে টুলাকে নিয়ে মোটেই বেশি ভাবনা চিন্তা করেনি, যদিও অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, এই দুজনের মধ্যে কিছু একটা সম্পর্ক গড়ে উঠতে চলেছে। মালকে মোটেই কোনও মেয়েদের পিছনে, এমনকী বন্ধু শ্যিলীংয়ের বোনের পিছনেও ঘোরাঘুরি করার মতো মানুষ ছিল না।

বার্লিন থেকে আসা আমার ভাগনিদের ওপরে, সে একটিবার মাত্র তার মাছের মতো চোখদুটি দিয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিল। সত্যি কথা বলতে কী ছেলেদের সঙ্গেই তার সব কিছু কাজকর্ম চলত, মেয়েদের সঙ্গে নয় বললেই চলে। আর যখন আমরা গ্রীষ্মকালে, ওই ডুবন্ত জাহাজটিকে কেন্দ্র করে, সবাই মিলে নিয়মিত সমুদ্রের তীরে নানান ধরনের খেলায় ব্যস্ত থাকতাম, তখন আমরা কখনও ভাবিইনি যে আমরা সবাই ছেলে না মেয়ে ছিলাম।

অন্য দিকে কিন্তু মুখে মুখে গুজব রটে যায় যে, যদি কোনও মেয়ের সঙ্গে মালকের আদৌ কোনও সম্পর্ক ঘটে থাকে, তবে তা শুধুমাত্র গির্জায় দাঁড়ানো ক্যাথলিক কুমারী মারিয়া মূর্তিটির সঙ্গেই, আর কারও সঙ্গে নয়। একমাত্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এই মূর্তিটির জন্যেই সে তার সবকিছু, অর্থাৎ গলায় ঝুলন্ত তার অতি প্রিয় যাবতীয় জিনিসপত্র, যা সে ম্যারী চ্যাপেলের গির্জার মধ্যেও সবাইকে দেখিয়ে বেড়াত, তার সবকিছু বাহাদুরি, যেমন জলে ডুব দেওয়া থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের মিলিটারির কাজকর্ম, সমস্ত কর্মফলই সে কুমারী মারিয়াকেই সমর্পণ করে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, সে কেবলমাত্র তার দুরন্ত গলার নলিটির থেকে মন সরিয়ে রাখার জন্যেই, সব কিছু করে থাকবে। হয়তো এই দুটি কারণ ছাড়াও, এই ব্যাপারে আরও একটি তৃতীয় কারণও থাকতে পারে।

আর সেটি হল, আলোবাতাসহীন, দুর্গন্ধময় আমাদের স্কুলবাড়ির প্রকাণ্ড অডিটোরিয়াম হলটি। এই হলটিই মালকের স্কুল-জীবনে, আর পরবর্তী জীবনেও অনেক বড় বড় সাফল্যের পথ খুলে দেয়। আর এখন, বহুকাল পরে, এখনই উপযুক্ত সময়, মালকের সঠিক পরিচয়টি কেমন ছিল সে-সম্বন্ধে কিছু বলার।

আমাদের মধ্যে অল্প ক'জনই মাত্র আজ যুদ্ধ উতরে বেঁচে আছি, বসবাস করছি, সারা দেশের ছোট-বড় নানান শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আমাদের বয়েস বেড়েছে, শরীরে জমেছে মেদ, চুলে ধরেছে পাক, মাথাতেও পড়েছে টাক। আমরা মন্দ রোজগারপাতি করছি না, মোটামুটিভাবে দিন কেটে যাচ্ছে।

বহুকাল পরে বন্ধু শ্যিলীং-এর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল উত্তর জার্মানির ডুইসবুর্গ শহরে। আর বন্ধু ইউরগেন কুপকার সঙ্গে দেখা হল ব্রাউনস্যেআইগ শহরে। তার কানাডায় প্রবাস যাত্রার অল্প কিছুদিন আগে।

দেখা হতে না হতেই আমাদের মুখে একটাই আলোচনার প্রসঙ্গ উঠল, অর্থাৎ মালকের গলার কণ্ঠনালিটি নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে লাগল: মালকের গলায় কী একটা সবসময়েই ঝুলে থাকত না? আমরা কি তার সামনে একবার একটা বেড়াল তুলে—? তুই-ই তো একবার বেড়ালটাকে গলার একেবারে সামনে এনে তুলে ধরে—? আমি আপত্তি করলাম, ওদের কথা থামিয়ে বলে উঠলাম: ওই কাজটি আমি মোটেই আমার ভিতরের ইচ্ছা থেকে করিনি। তখনকার আমি, মালকের শরীরের শুধুমাত্র মুখ আর গলার অঞ্চলটার ওঠানামার প্রতিই আগ্রহশীল ছিলাম।

স্মৃতি থেকে আরও অনেক অনেক প্রশ্ন উঁকি মারতে শুরু করল।

কয়েকটি ব্যাপারের উত্তর সম্বন্ধে আমরা বেশ দ্রুতই একমত হয়ে গেলাম; তা হল মালকের চোখদুটি ছিল হয় ধূসর না হয় ধূসর-নীল। এ দুটি চোখ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আকারে বড় হলেও, তা দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করার মতো তেমন কোনও তীক্ষ্ণতা ছিল না। আসল কথা হল যে ওর ওই চোখদুটি মোটেই বাদামি রঙের ছিল না। তার মুখ ছিল বেশ রোগা ও ঢ্যাঙা আকারের, দু'গাল পেশিবিহীন, নাকটি বিশেষ লম্বা ছিল না, সর্বদাই সেটি থেকে কিছু না কিছু গড়াত আর ঠান্ডা আবহাওয়ায় বেশ দ্রুতই লাল রং ধারণ করত। ঝুলন্ত মাথার পিছনের অংশটির বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু, তার ওপরের ঠোঁটের আদল কেমন ছিল, তা নিয়ে আমরা সহজে একমত হতে পারলাম না। বন্ধু ইউরগেন কুপকার মত হল, তা ছিল কিছুটা ওপরদিকে পাকানো আর একটু ঘোলা ধরনের রঙের। এই কারণেই সে, একমাত্র ডুব-সাঁতারের সময় ছাড়া, কোনও সময়েই তার ওপর পাটির, অনেকটা শুয়োরের মতো উন্মুক্ত আর সামনের বাঁকা দাঁতগুলি ঢাকা দিতে পারত না। আর তারপরে আমরা আমাদের স্মরণশক্তি থেকে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারলাম না যে, হালকা পাতলা মেয়েটি, অর্থাৎ টুলা পোকরিফকা, তারও মালকের মতোই, ওপরের ঠোঁট খোলা আর দাঁতগুলি দৃশ্যমান ছিল কি না।

আরও একটি ব্যাপারেও আমরা একমত হতে পারলাম না, আর তা হল, ওই খোলা-ঠোঁট আর খোলা দাঁতের মিল থাকার জন্যে, আমরা মাঝে মাঝে, টুলা আর মালককে আদৌ একজন হিসেবে মনে করতাম কি না। এমনও হতে পারে যে, ওদের মধ্যে শুধু একজনেরই, খুব সম্ভবত টুলারই ওই রকম ঠোঁট আর খোলা দাঁত ছিল। বন্ধু শ্যিলীং থাকে ডুইসবুর্গ শহরে, আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সাক্ষাৎ হল তার বাড়িতে নয়, রেলওয়ে স্টেশনের একটি রেস্টুরেন্টে, কারণ তার স্ত্রী হঠাৎ-আসা কোনও অতিথিকে আপ্যায়ন করতে রাজি ছিলেন না।

ব্যাপারটি, কেন জানি না, স্মৃতি আমাকে আমাদের পুরনো দিনের ক্লাস ঘরে ব্ল্যাক-বোর্ডে আঁকা কোনও একটি ব্যঙ্গচিত্র স্মরণ করিয়ে দিল। ব্যাপারটি এই রকম, খুব সম্ভবত সেটা একচল্লিশ সালেই হবে। এইসময়ে একদিন কোনও একজন লম্বা আর একটু কুঁজো মতো মানুষ আমাদের ক্লাসঘরে এসে হাজির হন। এই মানুষটি ছিলেন পূর্ব ইউরোপের বাল্টিক-অঞ্চলের অধিবাসী, সেখান থেকে তিনি পাততাড়ি গুটিয়ে, আমাদের এলাকাতে এসে সপরিবারে বসবাস করা স্থির করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল কিছুটা ভাঙা, অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন। আচার আচরণে তিনি ছিলেন একজন অভিজাত চরিত্রের মানুষ, সাজগোজ ছিল একদম ফ্যাশানদারী, শিখেছিলেন গ্রিক ভাষা, বক্তৃতা করতে পারতেন পরিষ্কার কেতাবি ভাষায়, দামি চামড়ার ওভারকোট দিয়ে শরীর ঢাকা দিয়ে রাখতেন, আর তাঁর মাথায় সর্বদা শোভা পেত একটি দামি চামড়ার টুপি। আর তাঁর পিতা ছিলেন কোনও এক প্রভাবশালী ব্যারন-বংশের মানুষ।

তাঁর নাম— কী যেন নামটা ছিল তাঁর, কী যেন—, আজ আর তা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে তাঁর ডাকনামটা যে ক্যারেল ছিল, তা আমার ঠিকই মনে আছে। এই মানুষটি ছিলেন একজন যথার্থ শিল্পী, সামনে কোনও মডেল দেখে বা না দেখেই, বেশ দ্রুত ছবি আঁকতে পারতেন তিনি। যেমন, নেকড়েতে টানা স্লেজ-গাড়ি, মাতাল মানুষের দল, খেলোয়াড়ের বেগবান শরীর, সিংহের ওপরে বসা বা দীর্ঘ পা-ওলা নানান ঢঙের উলঙ্গ নারী ইত্যাদি, ইত্যাদি। মোটেই কোনও হিজিবিজি করা ছবি নয়, পরিষ্কার আঁকা ছবি।

আরও কিছু ছবির নমুনা: বলশেভিকরা, তাদের রক্তাক্ত দাঁত দিয়ে শিশুদের শরীর ছিঁড়ে খাচ্ছে, হিটলার-মশাই জার্মান রাজা কার্লের পোশাক পরে শোভা পাচ্ছেন, দামি রেসের মোটর গাড়ির মধ্যে অভিজাত রমণীরা গলায় দামি মাফলার জড়িয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ ছাড়া তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে কলম, তুলি আর এমনকী সাধারণ পেনসিল দিয়ে, হাতের কাছে পাওয়া যে-কোনও ধরনের কাগজের ওপরে অথবা ব্লাকবোর্ডের ওপরেও, স্কুলের শিক্ষক বা ছাত্রদের ক্যারিকেচার ছবি এঁকে ফেলতে পারতেন। আর আমাদের মালকের ছবিও তিনি এঁকেছিলেন, তবে কাগজের ওপরে নয়। স্কুলের মোটা খড়ি আঙুলে চেপে ধরে, ক্যাঁচর-কোঁচর আওয়াজ করতে করতে, ব্লাকবোর্ডের ওপরেই মালকেকে এঁকেছিলেন। সেই সময়কার মালকের, চিনির জলের আঠা দিয়ে শক্ত করা, মাঝ-সিঁথি করে চুল আঁচড়ানো মাথা ও তার ত্রিভুজ আকারের অদ্ভুত মুখটি ক্যারেল মহাশয় বেশ জীবন্ত করেই এঁকেছিলেন।

কিন্তু, ব্লাকবোর্ডের ওপরে আঁকা মালকের মুখটিতে তার পরিচয় চিহ্নটি, অর্থাৎ সদা-দৃশ্যমান উন্মুক্ত দাঁতগুলি, চিন্তিত চোখ ও ভাঁজকরা ভ্রুদুটি ঠিকমতো প্রতিফলিত হয়নি। হয়তো শিল্পী এগুলি আঁকতে ভুলে গিয়েছেন। গলাটি আঁকা ছিল বেশি ঝুলন্ত, আকারে ছিল আসলের থেকে মাত্র অর্ধেকের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মতো আর সেই কারণে কণ্ঠনালিটি এক ভয়াবহ রূপ ধরেছিল। কষ্টকাতর মুখসহ মাথার ঠিক পিছনে আঁকা হয়েছে গোলাকার সূর্যের সোনালি জ্যোতির্মণ্ডল— সব মিলিয়ে কিন্তু উদ্ধারকর্তা যিশু নয়, আমাদের মালকে মহাশয় স্বয়ং, তাঁর আসল রূপটি নিয়ে সশরীরে প্রকাশমান।

এই অবিশ্বাস্য আকারে মুখের চিত্রটি দেখে, বেঞ্চিতে বসা আমরা সবাই প্রবল উত্তেজনায় বেশ উঁচু পরদায়, তারস্বরে, নাকিসুরে নানান ধরনের আওয়াজ করতে শুরু করে দিলাম। আমাদের হুঁশ ফিরল তখন, যখন আমরা হঠাৎ দেখলাম যে, আমাদের মধ্যেই কেউ একজন, সেই সুপুরুষ শিল্পী ক্যারেল মহাশয়ের হাতদুটি চেপে ধরে, মালকের স্ক্রুড্রাইভারটি নিয়ে, মারধর করার ভঙ্গিতে তাঁকে টানতে শুরু করেছে। শেষে আমরা কোনওক্রমে এই দুটি উত্তেজিত মানুষকে ছাড়িয়ে দিতে সমর্থ হলাম।

আর শেষে আমি, হ্যাঁ মালকে ভাই আমিই, তোমার ওই ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা উদ্ধারকর্তা-মুখটি ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে মুছে ফেলেছিলাম।

চার

উপহাস বা বিদ্রুপ ধরনের মন্তব্য না করেও সত্যিই বলা যায় যে একজন সার্কাসের ক্লাউন না হয়েও মালকের একজন ভাল ফ্যাশান-শিল্পী হবার যোগ্যতা অবশ্যই ছিল। কারণ মালকেই ছিল সেই মানুষটি, যে আমাদের দ্বিতীয় গ্রীষ্মাবকাশের শেষে, শীতের প্রারম্ভে, সর্বপ্রথম এক বিশেষ ধরনের দড়ি দিয়ে বাঁধা গোলক-জোড়া গলায় ঝুলিয়ে, সমুদ্রের ধারে সমবেত আমাদের সবাইকে দেখায়।

এই জিনিসটি হল, টেবিল টেনিসের পিং-পং বলের সাইজের দুটি ভিন্ন রঙের, গোলক, যা ছিল সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা। এগুলি দেখতে কিছুটা নেক-টাই মতো, তার জামার কলারের তলায়, পুরনো উলের সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল। এই বলের মালার মতো জিনিসটি এমন কায়দায় বাঁধা যে দেখে মনে হত যেন মালকের গলায় ঠিক একটা বো-টাই ঝুলছে। আজ বহুকাল পরে, আমি পরিষ্কারভাবে বলতে পারি যে, ঠিক পরের শীতকালেই, মালকের এই বো-টাই হারটি প্রায় সারা জার্মানিতে, বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব জার্মানির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
স্কুলের ছাত্রমহল, মহানন্দে গলায় ঝোলাতে শুরু করে দেয়।

মালকে তার এই পিং-পং বো-টাইটি সর্বপ্রথম কিন্তু আমাদেরই দেখায়। এই জিনিসটির আবিষ্কারকর্তা হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা তার ছিল, আর সে সত্যি সত্যিই তো এটির আবিষ্কারক ছিল। মালকের কথামতো, এই বিশেষ বস্তুটি তৈরি করার জন্যে সে তার স্বর্গত পিতামহের বহুদিন ব্যবহার করা, পুরনো উলের মোজা থেকে উলের সুতো খুলে, বল দুটি বাঁধার কাজে লাগায়। আর পরে, মালকে একবার বেশ জাঁকজমক করেই, তার পিং-পং বো-টাইটি গলায় ঝুলিয়ে, সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের ক্লাস ঘরে এসে হাজির হয়।

আর এর পরেই, দশ দিন কাটতে না কাটতেই মালকের এই আবিষ্কারটি দেখা গেল স্থানীয় পোশাকের দোকানে প্যাকেটে এবং শোকেসে বিক্রির জন্যে সাজানো। চালাক ব্যবসায়ীরা এই পিং-পং বো-টাই জিনিসটির ফ্যাশান-কদর বুঝতে পেরে, অতি দ্রুত পাইকারিহারে তৈরি করে, কোনওরকমের আইনকানুন না মেনে, দামের টিকিট না লাগিয়েই বাজারে বিক্রি করতে শুরু করে দেয়। রাতারাতি এই জিনিসটি অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেলল, আর আমাদের শহরতলি ছোটলাংফুর অঞ্চলের সীমানা পেরিয়ে, সুদূর পূর্ব ও উত্তর জার্মানির একাধিক শহরে বিক্রি হতে লাগল। আজ আমি একজন সাক্ষী হিসেবে নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ক্রমে ক্রমে এগুলি এমনকী পূর্ব জার্মানির বড় শহরে, যেমন লাপপ্‌সীগ্‌ ও প্রিনাতেও দেখা গেল। আর মজার ব্যাপার হল, মালকে স্বয়ং তখন তার নিজের তৈরি এই জিনিসটি প্রায় ভুলেই গিয়েছে,

আরও দেখা গেল উত্তর জার্মানির রাইনল্যান্ড অঞ্চল ও তার আশপাশের কিছু কিছু শহরে এই পিং-পং বো-টাই গলায় পরা মানুষদের বেশ দেখা যেতে লাগল। এদিকে মজার বা দুঃখের ব্যাপারটি ছিল মালকে স্বয়ং ওই সময়ে তার নিজের এই সৃষ্টিটি প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। আমার এখনও সেই দিনটির কথা বেশ মনে পড়ে, যেদিন মালকে কোনও এক বিশেষ কারণে, তার গলা থেকে নিজের আবিষ্কৃত এই পিং-পং বো-টাইটি চিরতরে খুলে ফেলেছিল। আর তার খুলে ফেলার পিছনের কাহিনি আমি পরে যথাসময়ে বর্ণনা করব।

এর পরে বেশ কয়েক মাস ধরে আমরাও এই ধরনের টাই-টি গলায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঝুলিয়ে রাখি এবং শেষ পর্যন্ত এটিকে একটি প্রতিবাদের অস্ত্র হিসাবেও ব্যবহার করি। এই জিনিসটি আমাদের স্কুল ডিরেক্টর ক্লোশ্যে মহাশয় মোটেই ভাল চোখে দেখেননি। তিনি জানালেন যে গলায় বল ঝোলানোর এই কাজটি মেয়েলি ধরনের, ছেলেদের পক্ষে এটি মোটেই মানানসই নয়। আর প্রতিটি ক্লাসে লিখিত নোটিস পাঠিয়ে, কী ক্লাসঘরের মধ্যে, কী বিশ্রাম নেওয়ার হলে, এই জিনিসটি গলায় ঝুলিয়ে রাখা পুরোপুরি নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী তাঁর নিজের ক্লাসের মাত্র গুটিকয়েক ছাত্রই, তাঁর এই নিষেধটি ক্লাস চলাকালীন মেনে নিতে রাজি হয়। বাকিরা নয়।

এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের সবার প্রিয় একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, পাপা ব্রুনীসের কথা, তিনি কিন্তু আমাদের ওই গলায় বল ঝোলানোর খেলাটি দেখে খুব আনন্দ পেতেন। আর মালকে যখন নিজেই গলায় বল ঝোলানোর খেলাটি প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, তখন ব্রুনীস মহাশয় বেশ কয়েকবার ঘটা করে, একজন অভিনেতার মতো কায়দা করে, মালকের আবিষ্কৃত রঙিন বো-টাইটি গলায় বেঁধে, মহানন্দে ছাত্রদের সামনে গান গেয়ে উঠতেন: ক্ষুদ্র কারনিস্ বৃহৎ জানালা। এই গানটি খুব সম্ভবত তাঁর প্রিয় কবি আইসেনডরফের কোনও কবিতার একটি কলি।

এ ছাড়া তাঁর মিষ্টান্নের প্রতি প্রবল আসক্তি ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি ভিটামিন ট্যাবলেট খেতেন, তাই মাঝেমধ্যে তিনি তাঁর মিষ্টি, চকোলেট প্রভৃতি ছাত্রদের মধ্যে বিলি করতেন। তবে তাঁর এই চকোলেট বিলি করার ব্যাপারটির মধ্যে, হয়তো কোনও বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির করার ব্যাপারও লুকিয়ে থাকতে পারে। তিনি ছিলেন ফ্রাইমাওরা-নামক এক অতি দক্ষিণপন্থী প্রতিষ্ঠানের সভ্য। সেই কারণেই, তাঁকে পরে স্কুলের মধ্যেই অ্যারেস্ট করা হয় এবং তখনই শিক্ষকতার কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। আর পরে, স্কুলের পরিচালক মণ্ডলী, অনেক ছাত্রকেও তাঁর আচরণের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যতদূর মনে হয়, আমি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিনি।

পাপা ব্রুনীসের একটি পালিতা কন্যা ছিল। এই কন্যাটির মুখ ছিল পুতুলের মতো, শিখত ব্যালেট নাচ, আর সর্বদা কালো রঙের পোশাক পরে থাকত, যা লোকে সাধারণত কোনও শোক প্রকাশ করার জন্যে পরে। সে তার পিতাকে নিয়মিত স্টুটহোফ নামে কোনও একটি জায়গায় পৌঁছে দিত এবং সেখানে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তার পিতা কিছু সময়ের জন্যে থাকতেন। এই পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটির পিছনে এক জটিল ও ভয়াবহ কাহিনি লুকিয়ে আছে। এই কাহিনির যথার্থ বিবরণ হয়তো অন্য কেউ কোনও সময়ে লিখবে। আমার পক্ষে এসব কাহিনি লেখা সম্ভব নয়, আর এ সব কাহিনির সঙ্গে মালকের কোনওভাবেই কোনও সম্পর্ক ছিল না।

এবার আবার ফিরে আসা যাক পিং-পং বলের মালার প্রসঙ্গে। এ কথা নিঃসন্দেহে ঠিক যে, মালকেই এই দু'গোলকের বো-টাই জিনিসটির সৃষ্টিকর্তা, আর এটি সে সৃষ্টি করে গলায় ঝুলিয়ে রেখে তার চঞ্চল ও অশান্ত নলিকে শান্ত রাখার জন্যেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হল এই যে, এই জিনিসটি অতি দ্রুত এক চাঞ্চল্যকর ফ্যাশানের বস্তু হয়ে দুনিয়ার সর্বত্র দেখা দেওয়ার কারণে, পরবর্তী সময়ে এটি খোদ সৃষ্টিকর্তার গলাতে ঝুলতে দেখলেও, কেউ এটিকে আর তেমন আকর্ষণীয় বলে মনে করত না।

একচল্লিশ ও বেয়াল্লিশ সালের শীতকালে আমি মালকেকে যেভাবে দেখি, তাতে আমার মনে হয়েছিল, তখন হয়তো তার মানসিক অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। তখন তার আনন্দের সঙ্গে জলে ডুব দেওয়ার মহড়া, বা পিং-পং বলের খেলাটির ওপরে কোনও বড় আকর্ষণ ছিল না। এক গভীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে ডুবে থেকে কালো হাই-হিল জুতো পায়ে বেঁধে, বরফ-ঢাকা রাস্তা দিয়ে পচ্‌পচ্‌ শব্দ করতে করতে, একবার সেন্ট ম্যারী চার্চের দিকে তারপরে আবার ওসটারসাইলে অঞ্চলে ক্রমাগত যাওয়া-আসা করত। মাথায় কোনও টুপি ছিল না, প্রচণ্ড ঠান্ডায় তার খাড়া হয়ে থাকা কান দুটোর রং হয়ে উঠেছিল পুরো লাল। চিনির জল দিয়ে আঁচড়ানো সিঁথি-কাটা চুলগুলি বরফের সঙ্গে মিশে হয়ে গিয়েছিল পাথর-কঠিন। চোখের পাতাগুলি যন্ত্রণায় ঝুলে পড়েছিল, ভয়াক্রান্ত ফ্যাকাসে নীল চোখদুটি হয়তো সামনের সবকিছুই দেখছিল আবছা আর ঘোলাটে। গায়ে ঝুলছিল তার পরলোকগত পিতার থেকে পাওয়া, খাড়া কলার-ওলা পুরনো ওভারকোটটি। শীতে ও যন্ত্রণায় কাতর চিবুক ঢাকার জন্যে গলায় একটি ধূসর রঙের উলের মাফলার ঝুলছিল, আর যাতে গলা থেকে খুলে পড়ে না যায়, তাই এটিকে বেঁধে রেখেছিল একটি অতি বিরাট আকারের সেফটিপিন দিয়ে।

প্রায় কুড়ি পদক্ষেপের পর, সে তার ডান হাতটি একবার বার করছিল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ওভারকোটের পকেট থেকে আর মাফলারটি ঠিকমতো গলাতে ঝুলছে কি না দেখে নিচ্ছিল।

তাকে দেখে মনে হত যেন একটি ক্লাউনের চেহারা—আমিও তো কম ক্লাউন দেখিনি—সার্কাসে বিখ্যাত ক্লাউন ক্রুক-কে দেখেছি, সিনেমাতে চার্লি চ্যাপলিনকে দেখেছি— সবাইকে দেখেছি একই ধরনের বড় সেফটিপিন তাদের পোশাকে লাগিয়ে রাখতে। আর আমাদের মালকেও হয়তো এইসব মহান ক্লাউনদের অনুসারী হয়ে এখন অভিনয়ের অনুশীলন শুরু করেছে। সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে বরফের ওপরে পায়চারিরত নানান রঙের পোশাক পরা পুরুষ ও নারী, ইউনিফর্ম পরা সৈনিকের কুচকাওয়াজ, হইহুল্লোড়ে খেলায় মেতে থাকা শিশুদের দল ও আরও অনেক কিছু। এইসব মানুষদের শরীর থেকে, এমনকী মালকেরও নিশ্বাস-প্রশ্বাস থেকে ক্রমাগত বেরোচ্ছে সাদা ধোঁয়া এবং উড়ে যাচ্ছে তাদের কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনের দিকে। আর অন্য মানুষেরা, যারা মালককে দূর থেকে দেখছে, তারা শুধু দেখতে পাচ্ছে মালকের বাইরের রূপটি, অর্থাৎ এক অতি বেঢপ বড় আকারের সেফটিপিন দিয়ে বাঁধা গলায় ঝুলন্ত মাফলারওলা এক চিন্তারত মানুষকে। এর বেশি কিছু নয়।

ওই প্রচণ্ড শীতল ও শুষ্ক ঠান্ডার ঋতুতে আমি বন্ধু শ্যিলীং-কে ও আমার দুই ভাগনিকে নিয়ে একটি ছোটখাটো ভ্রমণের আয়োজন করে বসলাম। ওই সময়ে আমার এই ভাগনিরা তাদের বড়দিনের ছুটি কাটাতে আমাদের অতিথি হয়।

বরফে জমে যাওয়া সমুদ্র ও বরফে আটকে পড়া অর্ধেক জেগে থাকা, আমাদের বহু পরিচিত জাহাজটি তাদের দেখানো ঠিক করলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, সদ্য বার্লিন থেকে আসা এই সুন্দর, ঝকঝকে, শ্বেতাঙ্গ মেয়েদুটিকে আমাদের এখানকার বিশেষ নতুন কিছু দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়া। ধরাবাঁধা কোনও প্ল্যান না থাকলেও, আমরা চেয়েছিলাম, এই দুটি মেয়ে, যারা ট্রামে-বাসে এমনকী সমুদ্রের বিচে— সর্বত্র ও সর্বদা কিছুটা নাক-উঁচু মনোভাব নিয়ে চলাফেরা করে, তাদের জন্যে আনন্দদায়ক কিছু একটা করতে।

কিন্তু মালকে সবকিছু বরবাদ করে দিল। আমাদের সামনে বরফ-কাটার একটি জাহাজ, বন্দরের প্রবেশ-মুখের কাছ থেকে বড় আকারের বরফের চাঁই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভেঙে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ডুবন্ত জাহাজটির কাছে। সেখানে এই ঠেলা-বরফ অন্য বরফের বড় বড় চাঁইয়ের সঙ্গে একত্রে মিশে এক উঁচু খাড়া দেওয়াল গড়ে তুলেছে, যা বন্দরের প্রায় অর্ধেক অংশই দৃষ্টির আড়াল করে ফেলেছে। এদিকে আমাদের আসল মানুষ মালকের কোনও পাত্তাই নেই। আমাদের প্রায় শরীরের সমান উঁচু বরফের টিলার ওপরে উঠে, চারিদিকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরে, অবশেষে সে আমাদের দৃষ্টিগোচর হল।

আমাদের চোখের সামনে: বন্দরের একটি ব্রিজ, একটি পাইলট হাউস, পাইলট হাউসের পিছনের ভেন্টিলেশনের মেশিন, বহুকাল ধরে জলের ওপরে জেগে থাকা এইসব পুরনো জিনিসগুলি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে বড় আকারের লাল-সাদা চকচকে লবঞ্চুসের মতো। এই মিষ্টি জিনিসটিকে কেবলমাত্র কোনও শীতে জমে যাওয়া দুর্বল সূর্যই লেহন করতে পারে। কোথাও কোনও গাংচিলের পাত্তা নেই। তারা পালিয়ে গিয়েছে এ অঞ্চল থেকে অনেক অনেক দূরে, হয়তো বেছে নিয়েছে বরফে আটকে থাকা মাল বহনকারী কোনও এক স্টিমারের ভিতরের একটি গরম জায়গা।

মালকে তার ওভারকোটের কলারটি যথারীতি খাড়া করে ওপরের দিকে দাঁড়িয়ে, ভালভাবে বাঁধা, গলায় জড়িয়ে থাকা মাফলারটি, যেটি তার বিখ্যাত সেফটিপিনটি দিয়ে আঁটা, শোভা পাচ্ছে তার গলার ঠিক মাঝখানেই। মাথায় নেই কোনও টুপি, তার বদলে, কান দুটি চেপে ঢাকা রয়েছে একটি মেটালের পাত দিয়ে জোড়া লাগানো, কান ঢেকে রাখার দুটি উলের পুঁটলি দিয়ে। তাকে বড়ই আজব দেখতে লাগছিল, অনেকটা হয়তো একজন রাস্তা সাফাই করার কর্মী বা একজন ট্রাক ড্রাইভারের মতো।

মালকে বরফের টিপির বরফ পরিষ্কার করার কাজে এত ব্যস্ত ছিল যে আমাদের সে দেখতেই পায়নি। কড়া ঠান্ডার মধ্যে, এই বরফ কাটার কাজটি, তার শরীরকে সম্ভবত কিছুটা গরম রাখাতে সাহায্য করছিল। একটি ছোট আকারের বেলচা হাতে নিয়ে সে একটি বিশেষ জায়গার বরফ কেটে একটি সুড়ঙ্গ করতে চেষ্টা চালাচ্ছিল, যেখান দিয়ে জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করা যেতে পারে। বেশ দ্রুত হাত চালিয়ে সে হাইড্রেনের ঢাকনার সাইজের একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল। আমরা আর অপেক্ষা না করে, সঙ্গী মেয়েদুটিকে নিয়ে, বরফের টিলা থেকে নেমে সোজা মালকের কাছে হাজির হলাম ও মেয়েদুটিকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হাতে কোনও দস্তানা না পরেই, সে অতি দ্রুত হাত বদল করে করে, বরফ কাটার কাজ চালিয়ে গেল। আমরাও তার কাজে সাহায্য করা শুরু করলাম আর অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ করলাম যে, বেলচা ধরে এই কাজটি করতে গেলে একটুক্ষণের মধ্যেই হাতের চামড়া রগরগে লাল হয়ে ওঠে।

মেয়ে দুটির মুখ অল্প খোলা ছিল, সম্ভবত তাদের ছোট ছোট দাঁতগুলিও রীতিমতো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল।

মালকের নাক থেকে বেরিয়ে আসা ঠান্ডা নিশ্বাস ধাক্কা মারছে তার মাফলারে, শীতল আর ঘোলা চোখের দৃষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণভাবে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে শুধুমাত্র বরফ কাটার কাজেই। তার এই জেদি আচরণের জন্যে যদিও তার ওপরে আমরা বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম। তাই হয়তো তাকে কিছুটা উৎসাহ দেওয়ার জন্যেই, আমরা মেয়েদুটির সঙ্গে তার গত গ্রীষ্মকালের বীরত্বমূলক কীর্তিকলাপের কাহিনি জুড়ে দিলাম। জানালাম, কীভাবে আমাদের মালকে ভায়া জলের তলা থেকে নানান ধরনের জিনিসপত্র, যেমন ধাতুর প্লেট, আগুন নেভানোর যন্ত্র, বোতল খোলার যন্ত্র, খাবারের টিনের কৌটো, যার মধ্যে হয়তো মানুষের মাংসও ছিল, একটি আস্ত গ্রামাফোন যন্ত্র, আরও কত কী খুঁজে তুলে এনে আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল।

মেয়েদুটি এসব কথা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে, শুধু বোকার মতো কিছু প্রশ্ন করতে লাগল। আর মালককে সম্মান দিয়ে তাকে আপনি সম্বোধন করে কথা বলতে শুরু করল। এদিকে আমরা যখন বেশ উঁচু গলায় তার প্রশংসা করে চলেছি, তখন সে তার পুঁটলি দিয়ে কান-ঢাকা মাথাটি জোরে নেড়ে এসব প্রশংসার প্রতিবাদ করতে থাকল। কিন্তু এসব কাজের মধ্যেও, সে মোটেই ভুলে যায়নি তার গলায় সেফটিপিন দিয়ে আঁটা মাফলারটি ঠিক আছে কি না, তা পরীক্ষা করে নিতে।

এরপরে, প্রচণ্ড ঠান্ডায় শুধুমাত্র তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করা বা বলার ছিল না। প্রতি কুড়িবার মতো বরফে ঘা দেওয়ার পর সে একটি করে ছোট্ট বিরতি নিতে লাগল আর এই বিরতির সময়েই বেশ শান্ত ও সংযতভাবে আমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে লাগল।

সামান্য লজ্জার ভাব থাকলেও, বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই সে তার ডুবুরি জীবনের কাহিনির বিবরণ দিতে থাকল। কিন্তু সে তার দুঃসাহসী অভিযানের ঘটনাগুলি কিছুটা বাদ দিয়ে, তার অন্যান্য কাজকর্মের কাহিনির কথা জানাল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তবে কথা বলতে বলতেই, বরফ কেটে সে তার সুড়ঙ্গটি বেশ গভীর করে ফেলেছে।

আমার এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, আমার ভাগনিরা মালকের দিকে কোনওভাবে আকর্ষিত হয়েছিল। কাউকে আকর্ষণ করার মতো উপযুক্ত ভাষায় কথা বলা, উপযুক্ত ব্যবহার বা রসিকতা করা, এসব তার চরিত্রে ছিল না বললেই হয়। এ ছাড়া মনে হয়, এই দুই তরুণী রমণীর কোনওমতেই এই রকম একজন বুড়ো ঠাকুর্দার মতো, বিদঘুটে কালো রঙের বস্তু দিয়ে মাথা ঢাকা দেওয়া, মানুষকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও ইচ্ছেই ছিল না। অগত্যা আমরা চুপচাপই দাঁড়িয়ে রইলাম। অবশেষে, ঠান্ডায় কাঁপন্ত শরীর, নাক দিয়ে ক্রমাগত জল ঝরছে, একটি অসহায় শিশুর মতো মালকে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

আর এইসব ঘটনার পরে, বাড়ি ফেরার পথে, মেয়েদুটি আমার ও বন্ধু শ্যিলীং-এর সঙ্গে কিছুটা অহংকার মেশানো তাচ্ছিল্যের সুরে কথাবার্তা শুরু করে দিল।

মালকে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, তার গর্ত খোঁড়ার কাজটি শেষ করতে লাগল। হয়তো সে আমাদের কাছে প্রমাণ করতে চাইছিল যে, সে সঠিক স্থানটিই গর্ত খোঁড়ার জন্যে বেছে নিয়েছে। আমাদের কোনওভাবেই সে কোনও অনুরোধ করল না, তার এই কাজটি শেষ হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করতে। অন্যদিকে আমাদের সঙ্গে কথা না বলে সে বরফে ঢেকে থাকা স্টিমারটির সঙ্গে আপন মনে ফিসফিস করে কী যেন সব বলতে লাগল। আর এই সবকিছু দেখিয়ে আসলে সে আমাদের প্ল্যান করা বাড়ি ফেরার সময়টি বেশ কিছুটা পিছিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরে, বরফ খোঁড়ার কাজ চালাতে চালাতেই, সে আমাদের একবার তাকে একটু সাহায্য করতে অনুরোধ করল। তার এই অনুরোধটি ছিল কিন্তু ভদ্র ভাষার একটি আদেশ! যাই হোক, আমাদের কাছ থেকে সে যা চাইল তা হল: আমরা যেন প্রস্রাব করি আর আমাদের প্রস্রাবের জল দিয়ে, তার নালা কাটা জায়গাতে জমে থাকা বরফের চাঁইগুলি গলিয়ে দিই। তার মতে এর ফলে বরফ গলা জল বড় আকারে ও জোরে বইতে পারবে।

অথচ আমরা যে একটু আগেই এই কর্মটি একবার সেরে ফেলেছি, তাকে এই কথা বলার সুযোগ না দিয়েই, আমার পুঁচকে ভাগনি দুটি সোল্লাসে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বলে উঠল: হ্যাঁ, খুব মজার প্রস্তাব, আমরাও চাই যে তোমরা এই কাজটি করো, তবে কিন্তু তোমরা সবাই, আর হ্যাঁ, মালকে মশাই আপনিও দয়া করে আপনার এই জলত্যাগের কর্মটি পিছন ফিরে সারবেন।

মালকে আমাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিল, কোথায় দাঁড়িয়ে, কতটা দূরত্ব থেকে এবং ঠিক কীভাবে এই কাজটি করতে হবে। আর এও জানিয়ে দিল যে, প্রস্রাবের ধারা যেন একই স্থানে ও ঠিক একই সময়ে চালানো হয়, নইলে তা বরফ গলানোর কাজে মোটেই সাহায্য করবে না। এই বলে সে নিজে বরফের টিপির ওপরে গিয়ে উঠল, আর আমরা দু'জনও তার পাশে দাঁড়িয়ে এবং কথামতো মেয়ে দুটির দিকে পিছন করে একসঙ্গে এই কাজটি শুরু করে দিলাম। পিছনে ক্রমাগত শুনতে পেলাম, দুটি নারী কণ্ঠস্বরের চাপা ফিসফিসানি ও খিলখিল হাসির আওয়াজ। আমরা কিন্তু সেই সময়ে মনোযোগ রক্ষার্থে, চোখের দৃষ্টি সামনের একটি উইপোকার ঢিপির ওপরে রেখে, আমাদের প্রয়োজনীয় কাজটি চালিয়ে যেতে লাগলাম।

সমুদ্র তীরবর্তী বেড়ানোর রাস্তার ধারের গাছগুলি থেকে আসা মিষ্টি গন্ধ, ব্রোসেন পার্কের ভিতরের, সৈনিকদের নামে উৎসর্গ করা মনুমেন্টের শীর্ষদেশে স্থাপিত ঝলমলে সোনার গোলক, এই সবকিছু সৌন্দর্য আমাদের মন আনন্দে ভরিয়ে তুলল। চারিদিকে বিরাজ করতে লাগল রবিবারের ছুটির আনন্দ ও খুশির মেজাজ।

এরপরে, যখন মেয়ে দুটি স্নানের প্যান্টগুলি পায়ের বেশ কিছুটা ওপরের দিকে টেনে ওঠাল তখন আমরা নিজেদের উত্তেজিত ভাবটা কিছুটা সংযত ও শান্ত করে ফেললাম। সোজা হয়ে, পায়ের আঙুলের ওপরে ভর করে দাঁড়িয়ে, তাদের সঙ্গে দেখতে লাগলাম, কীভাবে মালকের বরফ কাটার গোলাকার জায়গাটি থেকে, আমাদের প্রস্রাবের জল আওয়াজ করতে করতে বয়ে চলেছে। আর এই প্রবাহমান প্রস্রাবের জল কেমন সুন্দর সোনালি-হলুদ রং ধারণ করেছে।

বরফে মেশা প্রবহমান প্রস্রাবের জলের মধ্যে থেকে কোনও এক চাপা আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল আর এমন এক ঝাঁঝালো ও কড়া গন্ধ ছিল, যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো গন্ধ দুনিয়ার কোথাও ছিল বলে মনে হয় না। আর মালকের ক্রমাগত বরফ কাটার সঙ্গে, জলের দুর্গন্ধ হয়ে উঠল আরও দুর্বিষহ কড়া ধরনের। ইতিমধ্যে মালকে দুটি বিশেষ স্থানে, বেশ গভীর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গোলাকার গর্ত খুঁড়ে ফেলেছে। তার এই বরফ কাটার কায়দাটি হল, আগে কাটা নরম বরফ সরিয়ে নিয়ে তক্ষুনি আবার শক্ত বরফ কাটা ও তা দ্রুত সরিয়ে নেওয়া।

তারপরে মেয়েদুটি যখন তাদের দৃষ্টি আমাদের দিক থেকে পিছনের দিকে ফেরাল সেই সুযোগে আমরা নিজেদের প্যান্টের বোতাম তাড়াতাড়ি লাগিয়ে, মালককেকে, গর্ত খোঁড়ার কাজে সাহায্য করতে লেগে গেলাম। দুটি গর্ত সমান গভীর করে খুঁড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে শুধু চেষ্টাই তার বেশি কিছু নয়, কাজ এগোনো গেল না তেমন। মালকে নিজে আসলে কিন্তু বেশি পরিমাণ প্রস্রাব করেনি, আর আমরা তাকে এ কাজ করতে বলিওনি। বরঞ্চ আমাদের বেশ ভয় ছিল এই ভেবে যে, মেয়েদুটি তাকে এই কর্মটি করতে বেশি চেপে ধরে না বসে।

বলতে গেলে আমাদের কর্মটি শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, আর আমার ভাগনিদের কিছু কথা বলার আগেই, মালকে আমাদের কাজে ইস্তফা দিতে বলল। পরে আমরা যখন বরফের টিপির ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে আবার তার দিকে তাকালাম, তখন দেখতে পেলাম যে, তার মুখের কিছু অংশ, গলা ও নাক, সবকিছুই মাফলার দিয়ে জড়ানো আর মাফলারটি মজবুত করে সেফটিপিন দিয়ে বাঁধা। কিন্তু তার লাল-সাদা রঙের পিং-পং বলের বো-টাইটি, ওভারকোটের কলার ও মাফলারের মাঝখানের খোলা অংশটিকে ঠান্ডা বাতাস থেকে ঢাকা দেওয়ার কাজ করছে।

মালকে তার বেলচাটি হাতে নিয়ে, শরীরটি কুঁজো করে, ফিসফিস করে ওপরে আমাদের হয়তো কিছু বলতে বলতে, আবার তার বরফ কাটার কাজ শুরু করে দিল। তার নাক-মুখ দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাদা ধোঁয়া বেরোতে লাগল। বাড়ি ফেরার পথে আমাদের কথাবার্তা হতে থাকল শুধু মালককেকে নিয়েই। আমার ভাগনি দুটি সমস্বরে, মালকের সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন ছুড়তে লাগল, যার সবকিছুর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বিশেষত মেয়েদুটি একসঙ্গে, একই প্রশ্ন করে জানতে চাইল, মালকে কেন একজন বৃদ্ধ রোগীর মতো, তার সারা গলা আর মুখ সবসময়ে মাফলার দিয়ে বেঁধে রাখে। এবার সুযোগ বুঝে, বন্ধুবর শ্যিলীং, কিছুটা অতিরঞ্জিত ভাবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তাদের জানাল যে, মালকে এইভাবেই তার দীর্ঘ গলার নলিটি আর ফুলে থাকা গলায় মোটা আকারের শিরাগুলি ঢেকে রাখার চেষ্টা করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

শ্যিলীং মালকের বিদঘুটে ধরনের নড়াচড়া ও তার মুখভঙ্গি নকল করে দেখাতে শুরু করে দিল, চেষ্টা চালাল আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়ে মালকের মতো সিঁথি কাটতে। এই সব কমিক করে সে মেয়েদুটিকে কিছুটা হাসাতে চেষ্টা করল। এমনকী তারা একবার সত্যিই হেসে ফেলল আর একসঙ্গে বলে উঠল, মালকে আসলে একটা বুদ্ধু, তার মগজে কিসসু নেই।

এই সব ছোটখাটো মজা করা আর সিনেমা হলের অন্ধকারের মধ্যে তাদের একটু জড়িয়ে ধরা ছাড়া, মেয়েদুটির সঙ্গে আর আমরা বিশেষ কিছু করে উঠতে পারিনি। এক সপ্তাহ পরেই তারা আবার বার্লিনে ফিরে গেল।

এই প্রসঙ্গে আমার অবশ্যই বলে রাখা উচিত যে, এর ঠিক পরেই, একটি গভীর কুয়াশা-ঢাকা দিনে, আমি অনুসন্ধিৎসু হয়ে আমাদের গতদিনের কাজের জায়গাতে যাই আর দেখি, মালকে সত্যিই সুন্দরভাবে তার গর্ত কাটার কাজটি সমাধা করে রেখেছে। গত রাত্রে আবার বরফ পড়ে ওই গর্তের জায়গার ওপরে একটা নতুন বরফের আস্তরণ তৈরি করে ফেলেছে। এবার আমি ওই বরফের নতুন আস্তরণের ওপরে, প্রথমে আমার জুতো দিয়ে আর পরে, বাড়ি থেকে আনা আমার বাবার পায়চারি করার, মেটালের পাতে মোড়া একটি মজবুত লাঠি দিয়ে, গর্তটি খুঁজে বার করতে চেষ্টা করলাম। লাঠিটির পুরোটাই, অর্থাৎ প্রায় হাতল পর্যন্ত ঢুকে গেল বরফের মধ্যে। লাঠিটি এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে, কিছুটা খোঁজাখুঁজির পরে, লাঠির ডগাটি একটা কোনও কঠিন বস্তুর ওপরে টোকা মারল। এই কঠিন বস্তুটি ছিল জাহাজে প্রবেশ করার ঢাকনা। আর শেষ পর্যন্ত, ঠিক ওই ঢাকনাটির পাশেই, আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত জাহাজে প্রবেশের সুড়ঙ্গটির হদিশ পাওয়া গেল।

প্রথমে মনে হল, সুড়ঙ্গের ঢাকনাটি যেন একটির ওপরে আর একটি, খাবারের ডিশ বসিয়ে রাখার মতো সাজানো, আর তার নীচেই সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ। কিন্তু পরে বোঝা গেল, ওই ধারণাটি ঠিক নয়। আসলে সুড়ঙ্গের গর্তটি, কিংবা সুড়ঙ্গের ঢাকনাটি, যে কোনও একটি অপরের চাইতে আকারে বড় ছিল। যাই হোক, ঢাকনার ঠিক নীচেই সুড়ঙ্গটি পরিষ্কারভাবে দেখা গেল। সেই মুহূর্তে, মহানন্দে আমি মালকের জন্যে বেশ গর্ব অনুভব করলাম। এমনকী মনে হল, হয়তো সে আমার কাছ থেকে আমার দামি হাতঘড়িটি উপহার পাওয়ার যোগ্য।

আর ওইখানে, প্রায় চল্লিশ সেন্টিমিটার ব্যাসের গোলাকার বরফের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চাঁইটির পাশে, আমি কমপক্ষে মিনিট দশেকের ওপর শান্তভাবে বসে রইলাম। বরফের আস্তরণের কিছুটা অংশ আমাদের গতকালের প্রস্রাব থেকে পাওয়া হলুদ রং এখনও ধরে আছে। গতকাল, মালকেকে কিছুটা সাহায্য করে আসলে আমরা ভালই করেছিলাম। মালকে একাই হয়তো আমাদের সাহায্য ছাড়াই, সুড়ঙ্গটি খুঁজে বার করতে পারত। কিন্তু প্রশ্ন হল, মালকের পক্ষে, একেবারে কোনও দর্শক ছাড়াই কোনও ধরনের কাজ করা আদৌ সম্ভব ছিল কি না অথবা শুধুমাত্র নিজের জন্যে সে জীবনে আদৌ কোনও কাজ করেছে কি না। এমনকী সামুদ্রিক গাংচিলরাও হয়তো তার এই কাজটির কোনও তারিফ করত না, যদি না আমি আজ এসে এই কাজটির শেষ অংশ সমাধা না করতাম।

তার কাজ দেখে তারিফ করার মতো দর্শক পেয়েছে সে সবসময়েই। আজ আমি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, যদি মালকে কোনওরকম দর্শক ছাড়াই, একা বরফ কাটার কাজ চালিয়ে যেত, তবে আর কেউ না হোক, কমপক্ষে, গির্জার সেই ছবির মধ্যে থেকে কুমারী ম্যারী মাতা মেয়েটি, সশরীরে তার কাছে এসে, তার কাজের জন্যে, ঘটা করে প্রশংসা করে যেত! আর এ ব্যাপারে গির্জা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই কুমারী ম্যারীকে এই প্রশংসা করার ব্যাপারে কোনওরকমের নিষেধ করত না। আর যদি নিষেধ করতও, তা হলেও আমার স্থির বিশ্বাস, কুমারী ম্যারী একবার চুপিসারে এসে, তার প্রিয় শিষ্যের কাজটি নিশ্চয়ই দেখে যেত।

এইসব ব্যাপারস্যাপার আমি ভালই জানতাম, কারণ আমি নিজে একবার যিশাস-চার্চের জাঁদরেল ফাদার ভিস্কের কাছে ও তারপরে আরও একবার ম্যারী-চ্যাপেলের ফাদার গুসেভস্কির কাছে যুব-সেবক হিসেবে, গির্জের কাজকর্ম সম্বন্ধে ভাল তালিম নিয়েছি। কিন্তু কালক্রমে বয়েস বাড়ার সঙ্গে, উপাসনার বেদির সামনে জাদুবিদ্যা জাতীয় কাঁচা কাজকর্মের অনুষ্ঠানগুলির প্রতি আমার আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি।

অপর দিকে গির্জাতে যাওয়া-আসা, কাজ করা ইত্যাদি আমাকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিলেও কিছুটা আনন্দও দিয়েছে বলতে হবে। আমার মধ্যে অন্য যুব-কর্মীদের মতো কোনও ধরনের জড়তা ছিল না। আসল কথা হল এই যে, আমি আগেও বিশ্বাস করিনি আর এখনও সঠিক ভাবে জানি না, উপাসনা চলাকালীন, পূজার বেদির সামনে কিংবা পিছনে আদৌ কোনও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা ঘটত কি না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যাই হোক, ফাদার গুসেভস্কি সর্বদাই আমাকে তাঁর পাশে, তাঁর দু'জন যুবক-সেবকের একজন হিসাবে পেয়ে আনন্দ পেতেন। কারণ আমি কখনওই অন্যান্যদের মতো উপাসনার সময়ে সিগারেট-প্যাকেটের ছবি নিয়ে খেলা করিনি, গির্জার ঘণ্টা কখনও খুব জোরে বা দ্রুত বাজাইনি আর এমনকী পূজায় ব্যবহৃত পবিত্র ওয়াইন পয়সার বদলে বিক্রি করার চেষ্টাও করিনি।

উপাসনার কাজে সাহায্যকারী মানুষগুলিই আসলে ছিল পবিত্র বজ্জাত মানুষ। বেদির ঠিক সামনের সিঁড়ির ওপরে লজ্জাজনকভাবে তারা তাদের গলার হার, পুরনো পয়সা, ব্যবহার করা পুরনো বল-বেয়ারিং প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিস ছড়িয়ে রাখত। শুধু তাই নয়, এমনকী উপাসনা চলাকালীন তারা শুরু করে দিত, কোন যুদ্ধজাহাজ এখনও জলে ভেসে আছে আর কোনগুলি জলে ডুবে গেছে, এ সবের নাড়িনক্ষত্র নিয়ে আলোচনা করতে, আর সেই সঙ্গে চলত পরস্পরকে ল্যাটিন ভাষা মিশিয়ে প্রশ্ন ছোড়ার পালা, যেমন:

কোন সালে যুদ্ধপোত এরিট্রেয়া প্রথম যাত্রা শুরু করে, কী বিশেষত্ব ছিল এই পোতটির?

একমাত্র কোন যুদ্ধপোতটি পূর্ব-আফ্রিকার জলে নোঙর বেঁধে ছিল?

দু'হাজার একশো বত্রিশ টনের জাহাজ— তার স্পিড কত হতে পারে?

ছ'শো পঞ্চাশ মিলিমিটার, না ঠিক নয়— চারশো পঁচাত্তর মিলিমিটার, সৈন্যদের ট্রেনিং দেওয়ার এই জার্মান জাহাজটির নাম কী? ইত্যাদি—ইত্যাদি।

পরে আমি অবশ্য সেন্ট-ম্যারী চার্চের নিয়মিত সাহায্য করার কাজটি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। একমাত্র ফাদার গুসেভস্কি আমাকে ডাক পাঠালেই যেতাম, কারণ তাঁর সহকারী ছেলেরা মাঝে মাঝেই, তাঁকে সাহায্য না করে, রবিবারের ভ্রমণ কিংবা ফান্ড-কালেকশানের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত।

এবার আমার এমন কিছু বলা উচিত, যা থেকে, গির্জার যে বেদিটির বিশেষ জায়গায় বসে মালকে উপাসনা করত আর আমি তাকে লক্ষ করতাম, তার বিবরণ পাওয়া যাবে।

মালকের উপাসনা করার ভঙ্গিটি ছিল কী দারুণ! তীক্ষ্ণ, বৃহৎ গোরু-চোখের মতো দৃষ্টি, ঘোলাটে হয়ে যাওয়া চোখ, মন্ত্র আওড়ানো বিরক্ত মুখের ক্রমাগত ওঠানামা— অনেকটা যেন জলশূন্য বালির চরে আটকে থাকা মাছেদের ছটফটানি। এইসব চিত্রগুলিই, মালকের উপাসনা করার পদ্ধতিটি কী বেপরোয়া ধরনেরই না ছিল তার প্রমাণ দেয়!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি আর শ্রদ্ধেয় ফাদার গুসেভস্কি, আমরা দু'জনে যখন আমাদের উপাসনার বেদিতে বসে মালকেকে লক্ষ করতাম, তখন এমন একজন মানুষকে দেখতাম, যে হাঁটু গেড়ে ডাইনে-বাঁয়ে হেলছে-দুলছে। তার গলার মাফলার ও বিরাট সেফটিপিন ভুল করে মাটিতে ফেলে রেখেছে, কঠিন চোখদুটিতে পড়ছে না কোনও পলক। চুল-আঁচড়ানো ক্লান্ত মাথাটি হেলে পড়েছে পিছন দিকে, লম্বা জিভের পুরোটাই এমনভাবে সে বাইরে ঝুলিয়ে রেখেছে যে, কোনও একটি উত্তেজিত ইঁদুর অনায়াসেই সেটির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এক অসহায় ক্লান্ত মানুষ!

হয়তো মালকে নিজেই বুঝতে পেরেছিল যে, তার চোখ আর চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত, কিছুটা স্ফীত ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কিংবা হয়তো সে ইচ্ছাকৃতভাবেই, ক্রমাগত দুলতে থাকা শরীরটি দিয়ে, তার পাশে ঝোলানো ছবির কুমারী ম্যারীকে কিছুটা প্রলোভিত করতে চেষ্টা করছিল। আর, আমি আজ পর্যন্ত একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, মালকে তার জীবনে কোনও সময়ে কোনও সামান্যতম কাজও, সামনে উপস্থিত দর্শক ছাড়া করেছিল কিনা।

পাঁচ

সেন্ট ম্যারী চ্যাপেলে কোনও সময়ই আমরা মালকেকে তার পিং-পং বলের হারটি গলায় ঝুলিয়ে আসতে দেখিনি। যদিও সেই সময়ে ওই বিশেষ বস্তুটির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল, তা সত্ত্বেও মালকে নিজে ওটি গলায় ঝোলানো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল বলা যায়। আর মাঝে মাঝে যখন আমরা তিন বন্ধু একত্রে, স্কুল-ঘণ্টার বিরতির মাঝখানে স্কুলের ফাঁকা চত্বরে, একটি বিরাট বাদাম গাছের নীচে বসে, মজা করে ওই বো-টাইটির সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাতাম, তখন দেখতে পেতাম, সে কোনও এক কারণে, তার গলা থেকে ওই মালাটি পুরোপুরি খুলে ফেলত। তার পরেই, পরের ক্লাস শুরু হওয়ার দ্বিতীয় ঘণ্টাটি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই, প্রায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও, গলায় ঝুলন্ত আর সব জিনিসগুলির ওজনের ভারসাম্য রক্ষার জন্যেই হয়তো, ওই মালাটি সে আবার গলায় ঝুলিয়ে নিত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর একবার, যখন আমাদের স্কুলেরই একজন প্রাক্তন গ্রাজুয়েট ছাত্র, যুদ্ধের ফ্রন্ট থেকে ছুটি নিয়ে আমাদের স্কুলে বেড়াতে আসেন, তখন ক্লাস চলাকালীন সময়েই, এক বিশেষ জরুরি ঘণ্টা বাজিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ সব ছাত্রদের অডিটোরিয়ামে ডেকে পাঠায়। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এই ছাত্রটি অল্প সময়ের জন্যে তার নেতার সঙ্গে দেখা করেন। আর বোধহয় সেকারণেই, আমরা তাঁকে দেখতে পাই, এক বড় আকারে লোভনীয় লবনচুস তাঁর গলায় ঝুলন্ত অবস্থায় শোভা পাচ্ছে।

এই তরুণ মানুষটি এসে দাঁড়ালেন, হলের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন কাঠের সিন্দুকগুলির পাশে। তাঁর ঠিক পিছনেই রয়েছে তিনটি বিশাল আর উঁচু জানলা এবং বেশ কিছু বড় বড় পাতাওলা, বিরাট টবে পোঁতা, গোল করে সাজানো গাছের সারি। আর এই টবগুলির সামনে অর্ধ গোলাকার হয়ে আসন নিয়েছেন শিক্ষক মহাশয়রা। গলায় লবঞ্চুসের মালা ঝুলিয়ে, বিশেষ এক শারীরিক ভঙ্গি করে, ছোট্ট লালচে মুখে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর সারা হলঘরের চারিদিকে ছড়িয়েও পড়ে।

মালকে বসেছিল ঠিক আমাদের আগের সারিতে। আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে, এই সব কিছু দেখেশুনে তার কানদুটি উত্তেজনায় স্বচ্ছ লাল রং ধারণ করেছে আর খাড়াও হয়ে উঠেছে। সে তার শক্ত হয়ে যাওয়া শরীরকে কিছুটা পিছনে বেঁকিয়ে, তার ঘাড়ের ডান বা বাঁ দিক থেকে হাত দিয়ে কী যেন কী একটা খোঁজার চেষ্টা করছে।

শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই, তার বসার বেঞ্চির নীচে বেশ কিছু জিনিসপত্র, যেমন নানান রঙের উলের সুতো, সুতো দিয়ে তৈরি হালকা লকেটের মালা, পিং-পং বল ও হয়তো আরও কিছু দ্রব্যসামগ্রী এনে জড়ো করল সে। এগুলি মালকের বাহন ছাড়া আর কিছু নয়।

এয়ার ফোর্সের তরুণ লেফটানেন্ট মশাই শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা, আড়ষ্ট ও অতি ভদ্রভাবে কিছুটা অসহায়ের ভাব নিয়ে শ্রোতাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। কথার মধ্যে বারকয়েক সংকোচ প্রকাশ করলেও তাঁর কথায় তেমন কোনও ত্রুটি ছিল না: আমার তরুণ বন্ধুরা, ভুলেও ভেবো না যে, এয়ার ফোর্সের কাজের জীবন অতি সহজ, সুন্দর ও সমস্যাবিহীন—

অপরদিকে আমাদের সবার জীবন গতানুগতিক ভাবেই কেটে চলেছে, কয়েক সপ্তাহ ধরে তেমন আকর্ষণীয় কিছু ঘটছে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর পরে কর্তৃপক্ষ আমাদের পাঠালেন নদীর ধারে। ওখানে গিয়ে আমি মনে মনে তখন ভাবলাম: এখনও যদি কোনও কিছু না ঘটে, তবে কোনও কালেই কিছু আর ঘটবে না। আমার ভাবাটা মোটেই ভুল ছিল না। সেখানে আসার একেবারে প্রথম দিনেই, আমাদের মাথার ওপরে উড়ে এসে হাজির হল এক ঝাঁক বোমারু বিমান। অবিশ্বাস্যভাবে তারা কখনও মেঘের ওপর দিয়ে, কখনও বা তলা দিয়ে, প্রচণ্ড আওয়াজ ছেড়ে শুরু করে দিল, চরকির মতো ঘুরপাক খেতে।

আমি সোজা ও আর উঁচুভাবে দাঁড়িয়ে লক্ষ করলাম, আমার মাথার ওপরেই তিন তিনটে স্পিট-ফায়ার বিমান, ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগল আর চেষ্টা চালাল মেঘের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে। মনে মনে ভাবলাম, এখন সাবধান না হলেই বিপদ। এই বলে দ্রুত মাটিতে শুয়ে পড়ে, কোনওক্রমে শরীরটা একটু বাঁদিকে ঘোরালাম আর তারপরই আমার দৃষ্টিতে পরিষ্কার ধরা দিল, কীভাবে বিমানগুলি মাটির থেকে সামান্য ওপরেই ঘুরতে লাগল। তারা এতই কাছে এল যে আমি অথবা বিমান, একজনের মৃত্যু অবধারিত হয়ে দাঁড়াল। তোমরা বুঝতেই পারছ যে আমি নয়, একটি বিমানই গিয়ে পড়ল জলে— ধ্বংস হল সঙ্গে সঙ্গেই। আমি এবার উড়ন্ত পাইলটদের বললাম, ভায়া, তোমরা তিনজন তিনটি বিমানে ছিলে, একজন ইতিমধ্যে জলে ডুবেছে, এখন তোমাদের উড়োজাহাজে পর্যাপ্ত পেট্রল থাকতে থাকতে একে একে আবার জলে ঝাঁপ মারো দেখি।

এমনকী তারপরেও দেখলাম আরও সাতটি বিমান, কিছুটা জখম হওয়া সত্ত্বেও, ভনভন করে পাক খেয়ে একটানা ঘুরতে লাগল। আমি তাদের মধ্যে একটিকে বেছে নিলাম, আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে, পাইলটের সঙ্গে খেলা শুরু করে দিলাম। আমার পিঠে এসে পড়েছে সূর্যের গরম রোদ, হয়তো সেও তা পেয়ে থাকবে। আমি আমার নিশান-লাঠিটি সজোরে পিছনে ঘোরালাম। আমাদের খেলাটি জমে উঠল। এরপরে হঠাৎ একটি অন্য বিমান আমার দিকে ধেয়ে আসছে দেখে, আমি তাকেও এবার পাকড়াও করে তার পিছন নিলাম। সে কখনও থাকছে আমার দৃষ্টির মধ্যে, কখনও লুকোচ্ছে মেঘের আড়ালে। হঠাৎ এক বিরাট আওয়াজ হল, আমার খুব সামনেই বিমানটি তিরবেগে পড়ল গিয়ে জলে। জানি না, আমি আদৌ কেমন করে তখনও পর্যন্ত আমার লাঠিটিকে উঁচু করে ধরে রাখতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পেরেছিলাম। হয়তো আমি নিজেই হয়ে গিয়েছিলাম একটি উড়োজাহাজ।

যাই হোক, এরপরে আমি আমার হাতদুটি উড়োজাহাজের ডানার মতো টানতে টানতে, বাড়ির দিকে চললাম। তোমরা কেউ কেউ হয়তো আমার এই চলাটি সাপ্তাহিক নিউজ-রিলে দেখে থাকবে। পরে আমি কিন্তু কোনওভাবেই আমার হাতদুটি আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরাতে পারছিলাম না, তারা শক্ত হয়ে আটকে গিয়েছিল। এইভাবেই সমাপ্ত হয়েছিল আমার প্রথম এমারজেন্সি-ল্যান্ডিং।

এরপরে আমি যখন অফিসারদের ক্যান্টিনে হাজির হলাম, তখন আমার মন ছিল আনন্দে ও উত্তেজনায় ভরপুর। কিন্তু বিকেল চারটে নাগাদ আমাদের আবার সেই অঞ্চলে ফিরে যেতে হল। সংক্ষেপে বলা যায়, আমরা সেখানে গিয়ে আগের মতো একই খেলা চালাতে লাগলাম, যেমন আমরা আমাদের প্রিয় ছোট্ট বিরতি নেওয়ার জায়গায় হ্যান্ডবল খেলতাম। এখনকার বড় খেলার স্টেডিয়ামটি তখন তৈরিই হয়নি।

এখন হয়তো আমাদের মালেনব্রান্ট মহাশয়ের স্মরণে আসতে পারে: আমি সেই সময়ে কোনও এক খেলাতে হয় পরপর নয়টি না হয় একবারেই কোনও গোল করিনি। তখন ব্যাপারস্যাপারই এমন ছিল। সকালের খেলায় মেরে দিলাম তিনটে আর বিকেলে মারলাম ছ'টা, অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ন'টা গোল। সেটি ছিল আমার মোট সতেরোটি গোলের মধ্যে ন'টা। আর এর পরে, ছ'মাস কাটতে না কাটতেই, আমি যখন চল্লিশটার মতো গোল দিয়ে বসলাম, তখন আমি আমাদের খেলাধুলোর অধিকর্তার কাছ থেকে পেয়ে গেলাম এক বড়সড় উপহার। এটি ছিল একটি বেল্ট, আর এই বেল্টটির ওপরে খোদাই করা ছিল চুয়াল্লিশটি গোল করার স্বীকৃতি।

আর অন্য দিকে ফিল্ডে মিলিটারির কাজকর্মে রত মানুষদের ওপরে কাজের চাপ ছিল বেশি, মজা ছিল কম অর্থাৎ আমাদের মতো নয়। তাই, এখন অন্য কিছু কথা, কিছু মজার কথা বলা যাক। আমাদের পরিচিত, বেশ ভালরকমে সুসজ্জিত লেফটানেন্ট সাহেব বলতে শুরু করলেন: প্রতি মিলিটারি এয়ারপোর্টে, ছোট কিংবা বড়, সবসময়েই একটি পাহারাদার কুকুর মোতায়েন থাকে। আমাদেরও ছিল একটি কুকুর, তার নাম ছিল আলেক্স।

প্রতি যুদ্ধের শেষে, অর্থাৎ যুদ্ধ বিরতির অবসর সময়ে, শুরু হত এইসব কুকুরদের নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করার অনুশীলন। এই বিষয়ে আমাদের কুকুরটির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মজার কাহিনিটি হল, একজন করপোরালের ওপরে ভার দেওয়া হয়েছিল, প্রতি ভোরে, ট্রেনিংয়ের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে, আলেক্স-কে নিয়ে ট্রেনিং শুরু করার। আমাদের করপোরাল মশাইটির জেগে বিছানা থেকে উঠতে উঠতে সময় লাগত বেজায় রকমের। তাই মাঝে মাঝেই দেখা যেত, ট্রেনিংয়ের অ্যালার্ম শুনে, বিছানা থেকে পড়ি কি মরি করে উঠে, ঘুমোনোর জামাকাপড় না ছেড়েই, বাইরে এসে আলেক্সের সঙ্গে খেলা আরম্ভ করে দিতেন।

এই বলে, লেফটানেন্ট সাহেব তাঁর দর্শকদের সঙ্গে বেশ জোরেই হেসে উঠলেন। সেই সঙ্গে উঁচু ক্লাসের ছাত্ররাও হেসে উঠল। কিছু শিক্ষকও মুচকি হেসে সবার হেসে ওঠাকে সায় দিলেন। লেফটানেন্ট মানুষটি তেত্রিশ সালে আমাদের স্কুল থেকেই গ্র্যাজুয়েট হন আর দুর্ভাগ্যবশত ঠিক তার দশ বছর পরেই, তেতাল্লিশ সালে উত্তর জার্মানির রুওর অঞ্চলে যুদ্ধে মারা যান। বেশ মনে পড়ে যে, এই সাদাসিধে মানুষটির চুলের রং ছিল গাঢ় বাদামি, কোনওরকমে সিঁথি ছাড়াই টান টান করে তা পিছনে আঁচড়ানো থাকত। সুন্দর ও মার্জিত এই মানুষটি দৈর্ঘ্যে ছিলেন না তেমন। তাঁর চেহারা হয়তো কিছুটা ছোটখাটোই ছিল, তাঁকে দেখে মনে হতে পারত, তিনি কোনও এক নৈশ-বারের ওয়েটার।

কথা বলার সময়ে তিনি সাধারণত একটি হাত রাখতেন তাঁর পকেটের মধ্যে, কিন্তু কোনও উড়ন্ত প্লেনের যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়ার সময়ে যখন দু'হাতের প্রয়োজন হত, তখন দ্রুত বাইরে বার করে নিতেন পকেটের হাতটি। উন্মুক্ত দুটি হাত পরস্পরকে চেপে, অতি চমৎকারভাবে তিনি অভিনয় করে দেখাতে পারতেন অনেক কিছুই। যেমন, কাঁধ অল্প বেঁকিয়ে ও একটু মোচড় দিয়ে সুন্দর ভাবে দেখাতেন, কেমন করে তাঁর প্লেনগুলি ডানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরপাক খায়। আর নাক মুখ দিয়ে বিদঘুটে আওয়াজ বার করে বুঝিয়ে দিতেন, কোনও প্লেনের মোটর বিগড়ে গেলে তার হাল কেমন হয়। দর্শকরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, তাঁর এই অভিনয়ের ব্যাপারটি, আগে তাঁর অফিসার-ক্লাব ঘরে বসে নিশ্চয়ই বারকয়েক প্র্যাকটিস করে নিয়েছিলেন। কারণ কথাবার্তার মধ্যে, তিনি বারবারই অফিসার- ক্লাবেতে তাঁর নিজের কাজকর্মের প্রসঙ্গ টানতেন।

আর এইসব হাত-পা নাড়া ও গলার আওয়াজ করে অভিনয়ের কলাকৌশল রপ্ত করা ছাড়াও, তিনি তাঁর দর্শকদের অভিভূত করার কায়দাটিও বেশ ভালভাবেই জানতেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমনকী তিনি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে, সমবেত শিক্ষকমণ্ডলীর নামগুলি নিয়ে বেশ কিছু মজাদার কথা ও চুটকি ছাড়তেন। অন্যদিকে তাঁর আচরণের মধ্যে সর্বদাই কিন্তু প্রকাশ পেত এক ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী মনোভাব। কঠিন পরিশ্রম করে তিনি যে বিস্তর কাজ করেছিলেন, সেজন্যে তিনি কখনও প্রশংসার দাবি করেননি। তার বদলে তিনি তাঁর ভাগ্যকেই নিজের সাফল্য হিসেবে ধরে নিতেন। শ্রোতাদের বললেন, স্কুলের সারটিফিকেটগুলো আমার স্কুল জীবনের সাফল্যের পরিচয় দিলেও, আসলে সবকিছুই ছিল আমার ভাগ্য।

তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন, শুধু তাঁর পরলোকগত তিনজন বন্ধুর নাম উল্লেখ করেই নয়, তাদের কর্মেরও স্বীকৃতি দিলে, শ্রদ্ধাভরে আর আমাদের বললেন, ভাই বন্ধুরা, এ কথা মনে রেখো, আমরা নিজেদের জীবনে, যুদ্ধে যাই বা অন্য আর যা কিছুই করি না কেন, আমাদের পরবর্তী জীবনে যেন সবারই সবসময়ে স্মরণে থাকে, সুখ-দুঃখে মেশানো ছাত্রজীবনের সুন্দর দিনগুলির কথা।

তাঁর এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে, আমরা প্রবল হাততালি দিয়ে তাঁকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জানলাম।

এই দীর্ঘস্থায়ী করতালি চালানোর পরে, আমার হাতদুটি যখন প্রায় আগুনের মতো গরম হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়েই লক্ষ করলাম, হাততালি দেওয়া বা কোনওরকম আনন্দ প্রকাশ না করে, চুপ করে বসে আছে আমাদের মালকে।

অন্য দিকে, আমাদের সামনের সারিতে বসা স্কুল ডাইরেকটার ড. ক্লোশ্যে মহাশয়, আনন্দ ও উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে, হাততালি দিয়ে তাঁর এই প্রাক্তন ছাত্রটিকে যথাযথ সম্মান জানালেন। আর তারপরে স্নেহভরে দুই বাহু দিয়ে তাঁকে অনেকক্ষণ আলিঙ্গন করে তাঁর পাশে বসার স্থান করে দিলেন।

এরপরে বক্তৃতা শুরু করলেন ড. ক্লোশ্যে সাহেব। বিরক্তিকর দীর্ঘ বক্তৃতা। বিরক্তির মনোভাব শুধুমাত্র শ্রোতাদের মধ্যেই নয়, হলঘরের মধ্যেকার টবের গাছপালাগুলির মধ্যে, দেওয়ালে ঝোলানো স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারন কনরাডি ও অন্যান্য তৈলচিত্রগুলির মধ্যেও দেখা দিল। এমনকী জাঁদরেল চেহারার দুটি মানুষ, ব্রুনীস ও মালেনব্রানটের মাঝখানে চেপটা হয়ে বসে থাকা, হালকা চেহারার লেফটানেন্ট মশাইও ক্লান্তি ও বিরক্তিতে তাঁর আঙুল ও হাতের নখ নিয়ে খেলা শুরু করলেন। ক্লোশ্যে মহাশয়ের ধমকানিসুলভ দীর্ঘশ্বাস, যা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সব সময়েই স্কুলের গণিতের ছাত্রদের ওপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করত, তা এখানে কোনও কাজেই লাগল না। হলের সামনে থেকে মাঝখান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তাঁর বক্তৃতার অদ্ভুত ধরনের শব্দমালা: যারা বিলম্বে আসে—, এবং এই ঘণ্টার মধ্যেই—, যখন ভ্রমণকারী ঘরে ফেরে—, ঠিক এই সময়ে আমাদের মাতৃভূমি—, আমরা কখনওই চাই না—, পরিষ্কার থেকো—, আমি ইতিমধ্যেই যা বলেছি—, সবশেষে কবি শ্যিলারের উক্তি— ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভয়াবহ বক্তৃতাপর্ব অতঃপর শেষ হল। আমরা দুটি সারি বেঁধে, অতি দ্রুত বাইরে বেরোনোর সরু পথটি ধরলাম— আমি মালকেকে ধাক্কা মেরে, তার আগে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, আর লক্ষ করলাম যে সে প্রচণ্ড ঘামছে, আর তার চিনির জল দিয়ে শক্ত করে আঁচড়ানো চুলগুলিও উসকোখুসকো হয়ে গিয়েছে। এর আগে আমি কখনও মালকেকে ঘামতে দেখিনি।

ছিপি দিয়ে আঁটা একটি বোতলের মতো, হাওয়া-বাতাসহীন বদ্ধ হলঘরটিতে জমে ছিল সাড়ে তিনশো মানুষের ঘামের পচা দুর্গন্ধ।

এদিকে আমি লক্ষ করলাম, যে তার উত্তেজিত ভুরুদুটি, এমনকী তার গলার ভাঁজগুলি উত্তাপে ও উত্তেজনায় রগরগে লাল হয়ে উঠেছে। অবশেষে থাম-ঘেরা রাস্তা পেরিয়ে, বাইরে বেরোনোর বড় দরজার সামনে এসেই, আমি তাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? তোমার শরীর কেমন? তুমি কী বলতে চাও? মালকে কোনও জবাব না দিয়ে, কেবল সামনের দিকে চেয়ে রইল। আমার দৃষ্টি দীর্ঘ গলাটির থেকে সরিয়ে নিলাম। পিছনে, দুটি থামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল একটি লম্বা গলাওলা আবক্ষমূর্তি, মালকের গলার দৈর্ঘ্য ছিল তার চাইতে লম্বা।

বেশ শান্ত ও কিছুটা ক্লান্তস্বরে, সে তার কোনও পিসিমার দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা সম্বন্ধে একেবারে অন্য প্রসঙ্গে কিছু কথা বলল, এখন তাদের প্রয়োজন একটি বড় আকারের ব্যাগ, যদি তারা এইসব মেডেল সস্তায় পেতে চায়। একেবারে প্রথম দিকে, যখন এগুলি ফ্রান্স কিংবা জার্মানিতে তৈরি হত, তখন এগুলির দাম ছিল বেশ কমই, আর এখন?

আমি মালকেকে বললাম, আমার মনে হয় লেফটানেন্টের বক্তৃতা তোমার একেবারেই ভাল লাগেনি, নইলে ওই সময়ে তুমি অন্যমনস্ক হয়ে, নিজেকে অমন করে গুটিয়ে রাখতে না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে সময়ে, প্রায় প্রতিটি জামাকাপড়ের দোকানের শো-কেসে সাজিয়ে রাখা হত, উজ্জ্বল-ঝকমকে ধরনের নানান আকারের পোস্টার ও বোতাম। এইসব নতুন জিনিসগুলির গড়ন ছিল মাছের আকারের কিংবা উড়ন্ত গাংচিলের মতো আর অন্ধকারে রাখলেই হয়ে উঠত আলোকময় জ্বলজ্বলে। তাই বয়স্ক, আতঙ্কগ্রস্ত পুরুষ ও নারীরা, অন্ধকার রাস্তাঘাটে পড়ে যাওয়া কিংবা অন্য বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে এই ধরনের আলো-পোস্টার ব্যবহার করতে শুরু করে দিলেন। পরে আবার এইসব ফসফরাস মেশানো গোলাকার জিনিসগুলি, ওভারকোটের বোতাম হিসেবে এমনকী পায়চারি করার লাঠির সঙ্গে লাগিয়েও ব্যবহার হতে লাগল।

ভাই মালকে, তোমার তো অন্ধকারে ভয়ডর পাওয়ার কোনও কারণই নেই, তবে কেন তুমি পাঁচ-পাঁচটা পোস্টার আর বেশ কিছু মাছ ও গাংচিল আকারের বোতাম, তোমার ওভারকোটে ও মাফলারে জুড়ে দিলে? তা হলে তুমি কি কোনও সার্কাসের ক্লাউন হিসেবে তৈরি হওয়ার জন্যেই, তোমার পিসিমাকে দিয়ে, ওভারকোটটির ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত আধ ডজনের মতো বোতাম লাগিয়ে নিয়েছিলে? তোমাকে দেখে আমার অন্তত সেটাই মনে হচ্ছে।

শীতকালের প্রত্যুষে কিংবা তুষার-পড়া সন্ধ্যার অন্ধকারে, একাধিক জ্বলজ্বলে বোতাম লাগানো ওভারকোটটি পরে, রাস্তার এপারে আর ওপারে পায়চারি করতে তোমাকে আগে বহুবার দেখেছি, এখন দেখছি আর পরেও হয়তো দেখব!

ওভারকোট পরা তোমার শরীরটি ছিল বেশ ভুতুড়ে ধরনের। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, কেউ কখনও কিন্তু দেখতে পায়নি, তুমি আসলে তোমার ওই ভুতুড়ে শরীরটি দিয়ে, বাচ্চাদের বা বয়স্কদের ভয় দেখানোর বদলে ভয় লাঘব করায় সাহায্য করতে।

আর তুমি তো নিজেই বলেছ ও ভেবেছ যে, কোনও কালো পদার্থই এই অতি পাকা ফলটিকে গলাধঃকরণ করবে না। প্রত্যেকেই এই জিনিসটি দেখবে, শুঁকবে, পরখ করবে, হাতে ধরার উপযোগী হলেও কিন্তু এটিকে কেউই হাতে ধরবে না আর কোনওমতেই গিলবে না।

এই ভয়াবহ শীতকালটি কোনওমতে শেষ হলে আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচব, আবার আনন্দে জলে গিয়ে ঝাঁপ দেব আর ডুব-সাঁতার কাটব!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছয়

অবশেষে সত্যিই যখন ফল-ফুলের গন্ধ, গ্রীষ্মের সুন্দর মেজাজ ও বিশেষত জলে সাঁতার কাটার মতো ভাল আবহাওয়া নিয়ে হাজির হল সুন্দর সময়, মালকে কিন্তু জানি না কী কারণে জলে নামতেই চাইল না। যদিও জুন মাসে গ্রীষ্মের আরম্ভের প্রথম দিনটিতে জলে সাঁতার কেটে, আমাদের পরিচিত জলের ওপরে শুয়ে থাকা জাহাজটির কাছে গেলাম, তবুও কেন জানি না আমাদের সাঁতার কাটার মতো ঠিক মেজাজটি ছিল না।

তার কারণ নিচু ক্লাসের কিছু কমবয়সি ছেলে, আমাদের সঙ্গে সাঁতার কেটে ও আমাদের দারুণ বিরক্ত করতে লাগল। হইহই করে তারা আমাদের সামনে সাঁতার কাটতে থাকল, সামনের সেতুটির ওপরে গিয়ে বসে, ডুব মেরে জলের তলায় গিয়ে ডুবন্ত জাহাজের মধ্যে, খুলে আনার মতো যা-কিছু জিনিস শেষ পর্যন্ত বাকি ছিল, তা খুলে নিয়ে এল।

আমাদের মনে পড়ে গেল, একদা মালকে আমাদের কাছে বিনীত অনুরোধ করেছিল, দয়া করে আমাকে তোমাদের সঙ্গে নাও, আমি এখন সত্যিই সাঁতার কাটতে পারি। আর আজ আমি ও আমার দু'জন বন্ধু একসঙ্গে ঠিক সেইভাবেই মালককে অনুনয় করে বললাম, ভাই মালকে, চলে এসো আমাদের সঙ্গে, তোমাকে ছাড়া সাঁতার কেটে কোনও মজাই নেই। রোদের উত্তাপ সঙ্গে নিয়েই আমরা জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব, আর তুমি নিশ্চয়ই জলের তলা থেকে ভাল কিছু খুঁজে ওপরে নিয়ে আসতে পারবে।

কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমাদের এই আন্তরিক অনুরোধ আর উপেক্ষা না করে, সে অবশেষে তীরবর্তী উষ্ণ জলে পা বাড়াল। মালকে আমাদের মাঝখানে, বন্ধু হটনের একটু পিছনে থেকে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল। এই প্রথম মালককে দেখলাম, কোনওরকম উত্তেজনা ও ছটফটানি ছাড়াই, শান্তভাবে, আরাম করে সাঁতার কাটতে।

এরপরে সেতুর কাছে এসে, সে ছোট কম্পাসহাউসের ছায়ার তলায় পৌঁছল। আমাদের কারও সাহস হল না, তাকে আবার জলে ডুব দেওয়ার অনুরোধ করতে। এমনকী যখন অন্য কমবয়সি ছেলেগুলি, জলের তলা থেকে হাবিজাবি তুচ্ছ জিনিসপত্র এনে বড়াই করে দেখাতে লাগল, মালকে সেদিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর প্রয়োজনও বোধ করল না। এইসব

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ছেলেরা আসলে মালকের কাছ থেকে বেশ কিছু শিখে নিতে পারত। কেউ কেউ মালকের কাছে নতুন কিছু শেখার ও জলের তলার কিছু খবরাখবর পাওয়ার আশায় তাকে প্রশ্নও করেছিল, কিন্তু মালকে এসব প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না বললেই হয়।

মালকের কোঁচকানো ভুরু ও জিজ্ঞাসু চোখদুটির দৃষ্টি, সমুদ্রের জলে ভেসে থাকা লাইফ-বয়ার ওপরেই শুধুমাত্র নিবদ্ধ ছিল। জলের ওপরে ক্রমাগত যাওয়া-আসায় ব্যস্ত বড় আকারের স্টিমার, ছোট নৌকো আর এমনকী টরপেডো বহনকারী জাহাজও তার এই নিবদ্ধ দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি।

আর এরই মধ্যে জলের নীচে গতিশীল টরপেডো-জাহাজের ওপরে জেগে থাকা পেরিস্কোপটি পরিষ্কার দেখা গেল। জলের ওপরে অতি সুন্দর ঢেউয়ের চিহ্ন রেখে এগিয়ে চলেছে সেটি। সাতশো পঞ্চাশ টন ওজনের এই বিশালকায় জাহাজটি তার আসল যাত্রা শুরুর আগে, তখন শুধুমাত্র প্রস্তুতির মহড়া দিচ্ছিল। ক্রমশ সেটি বন্দরের দিকে এগোতে থাকলে আমাদেরও সেটিকে ভালভাবে লক্ষ করার উৎসাহ বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে টরপেডো-জাহাজটি জলের ওপরে ভেসে উঠতে শুরু করল। প্রথমে পেরিস্কোপ ও পরে পুরো জাহাজটি ভেসে উঠল। জাহাজের পিঠের ওপরের সাদা জল ফেনার আকারে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে আর জাহাজের ভিতরের কর্মীরা, হ্যামাগুড়ি দিয়ে বাইরে এসে, জাহাজের পিঠের ওপরে হাজির হল।

এ এক সত্যিই দেখার মতো ব্যাপার বটে! আমরা আনন্দে চিৎকার করে বাহবা জানালাম এই জাহাজটিতে কর্মরত মানুষগুলিকে। আজ আমি সঠিক বলতে পারছি না সাবমেরিনের কর্মীরা, আমাদের এই উত্তেজনাপূর্ণ তারিফ জানানোর কোনও জবাব দিয়েছিল কি না। তবুও, সেদিনের ওই গমনরত সাবমেরিনটির চিত্র ও পিছনে ফেলে রাখা ঢেউয়ের স্রোত মনে করলে, এখনও আমার মন ও শরীরে উত্তেজনায় শিহরন জাগে।

আমাদের মালকে কিন্তু হাত তুলে বা অন্য কোনওভাবে সাবমেরিনটিকে একেবারেই তারিফ জানায়নি।

এরপরে আর একবার— আর এক অন্য গ্রীষ্মকালে— সেটা ছিল জুন মাসের শেষাশেষি— আমাদের লম্বা গরমের ছুটি তখনও ঠিক শুরু হয়নি— লেফটানেন্ট সাহেব স্কুলের বড় হলের মধ্যে বক্তৃতাও আরম্ভ করেননি—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অর্থাৎ কোনও কিছুই ঠিকমতো শুরু হয়নি—হঠাৎ মালকে আমাদের কাছ থেকে উধাও—

খবর এল, বাচ্চাদের দলের কোনও একটি ছেলে, জলের তলায় ডুবন্ত জাহাজের মধ্যে থেকে কিছু আনতে গিয়ে সেখানে আটকে গিয়েছে, ওপরে উঠে আসতে পারছে না। মালকে ডুব মারল জলে, আর কিছুক্ষণ বাদে ছেলেটিকে ওপরে তুলে আনল।

ছেলেটি জাহাজের মাঝখান বরাবর, ইঞ্জিনরুমের ঠিক সামনেই কোনও এক জায়গায় নিজেকে আটকে ফেলেছিল। মালকে তাকে নানান আকারের জলের পাইপ ও ইলেকট্রিক কেবলের মধ্যে জড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেল। মালকের নির্দেশ অনুযায়ী, বন্ধু হটন ও শ্যিলীং টানা দুটি ঘণ্টা ধরে শুশ্রূষা করতে থাকল তাকে। আস্তে আস্তে ছেলেটির চোখমুখের অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কিন্তু ফেরার পথে, তার আর সাঁতার কাটার ক্ষমতা ছিল না। আমাদের তাকে তুলে ধরে পাড়ে নিয়ে আসতে হয়।

পরের দিন, মালকে আবার তার চিরাচরিত উৎসাহ নিয়েই, সাঁতার আর ডুব-সাঁতার কাটা শুরু করে দিল। এবার কিন্তু সে জলে তার প্রিয় স্ক্রুড্রাইভারটি ছাড়াই ডুব মারল। সে তার আগের মতো দ্রুত গতিতেই সাঁতার কেটে, আমাদের দু'জনকে পিছনে ফেলে, এগিয়ে চলল তরতর করে। আমরা শুধুমাত্র সেতু পর্যন্ত আসার আগেই সে ওপারে গিয়ে হাজির।

এর পরে, ফেব্রুয়ারি মাসেই প্রারম্ভেই, প্রচণ্ড তুষার ও ঝঞ্ঝা নিয়ে হাজির হল শীতকাল। সারা জাহাজের সর্বত্র, রেলিঙের ওপরের অংশ, কর্মরত ক্রেনগুলি, কম্পাসহাউসের ছাদ, সবকিছুই ঢাকা পড়ে গেল বরফের আস্তরণে। এর মধ্যেই কঠিন হয়ে জমে থাকা, গাংচিলদের বিষ্ঠার ছোট ছোট পাহাড়গুলি, আকারে এমনকী বেশ কিছুটা বড় হয়ে, বহাল তবিয়তে জেগে রয়েছে।

মালকে আবার জলে ডুব মারল, কিন্তু জলের তলা থেকে তেমন কিছু তুলে আনল না। আমরা তাকে কোনও প্রশ্ন করলে সে তারও কোনও জবাব দিল না। অনেক পরে, বিকেলের দিকে, সে হঠাৎ দশ-বারোবারের মতো ডুব মারল জলে আর সেই সময়ে আমরা যখন আমাদের ক্লান্ত শরীর নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ভাবছি। ঠিক এমনি সময়েই, মালকে আবার একবার ডুব মারল জলে। ওপরে আর উঠল না। আমাদের সবাইকে ফেলে দিল মহা চিন্তায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এরপরে আতঙ্কে ভরা পাঁচটি মিনিট সময় কেটে গেল। এই পাঁচ মিনিট ছিল আমাদের কাছে একটা বছরের মতো লম্বা দীর্ঘ পাঁচটি মিনিট সময়। দুশ্চিন্তায় আমরা শুষ্ক গলা ও জিভ দিয়ে শুধুমাত্র ঢোক গিলতে থাকলাম। এরপরে আমরা একের পর এক, সাবধানে জলে ডুব দিয়ে, মালকেকে খুঁজে বার করার কাজে নেমে পড়লাম। জলের তলায়, বন্ধু হটনের পিছনে যেতে যেতে, জাহাজের কামরার পার্টিশনের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা অফিসারদের বড় আকারে হলঘরটি আমার চোখে পড়ল। অনেকক্ষণ জলের তলায়, আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা! তাই আবার নতুন করে দম নেওয়ার জন্যে ওপরে উঠে আসতে হল আমাকে। তারপরে আবার ডুব দিলাম জলে, দু'-দুবার চেষ্টা করলাম দেওয়াল পেরিয়ে সামনে পৌঁছতে। পাক্কা আধঘণ্টা ধরে চলল এই খোঁজার চেষ্টা। আমাদের মধ্যে ছয়-সাতজন বন্ধু, জল থেকে কোনওক্রমে ওপরে উঠে, প্রাণপণে নিশ্বাস ছেড়ে দম নিতে থাকল।

মাথার ওপরে গাংচিলেরা ঝাঁক বেঁধে গোলাকার করে উড়তে শুরু করল। হয়তো তারাও কিছু লক্ষ করে থাকবে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, ওই সময়ে, বিরক্তি সৃষ্টিকারী কমবয়সি ছেলেগুলি ওখানে ছিল না। আমরা হয় চুপ করে বসে রইলাম, নয়তো সবাই একসঙ্গে অর্থহীন কথা বলতে লাগলাম।

উড়ন্ত পাখিরা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে, আবার আমাদের মাথার ওপরে এসে ঘুরপাক খেতে লাগল। এবার আমরা আমাদের সাঁতার শেখানোর শিক্ষক, মালকের মা-পিসিমা এবং ক্লোশ্যে মশাইয়ের সম্বন্ধে কথা বলতে লাগলাম। কারণ, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুল কর্তৃপক্ষ পরে নিশ্চয়ই একটা তদন্ত কমিশন বসাবেন। আমার ঘাড়ে কিছু দায়িত্বও আসবে নিশ্চয়ই, কারণ আমি যে শুধু মালকের প্রতিবেশী ছিলাম তাই নয়, আমি তার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গেও পরিচিত হই।

বন্ধু শ্যিলীং হয়তো আমাদের সাঁতারের ট্রেনারকে বলতে থাকবে আমাদের কথা, হয়ত বলে থাকবে, আমরা যদি তাকে সত্যিই খুঁজে না পাই, তা হলে তাকে স্মরণ করে, ফুলের মালা সঙ্গে নিয়ে আমাদের সাঁতার কাটতে হবে আর একটি শোকসভারও আয়োজন করতে হবে। এজন্যে, প্রয়োজন হলে, প্রত্যেকে পঞ্চাশ ফেনিগ পয়সা দিয়ে একটা ফান্ডও তৈরি করতে হবে।

বন্ধু কুপকাও যোগ দিল আলোচনায়: আমরা তার মৃত শরীরকে হয় ওপর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
থেকে সরাসরি জলে ফেলে দেব, আর না হয় ডুবন্ত জাহাজের তলাতেই কোনও একটা জায়গায় রেখে আসব। কিন্তু কুপকা-র ওই বিদঘুটে প্রস্তাব আমাদের কারও মনেই তেমন সাড়া জাগাল না, আমরা শুনে প্রায় হেসেই উঠলাম বলা যায়। এরপরে, আমরা যখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে পরবর্তী হাসির জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই ডুবন্ত জাহাজটির কাছ থেকে ভেসে এল এক হাসি, একটি খুব সাধারণ হাসির আওয়াজ।

জল দিয়ে আঁচড়ানো মাথাটি ওপরে তুলে, জাহাজের খোল থেকে, জীবন্ত অবস্থাতেই উঠে এলেন আমাদের মালকে। অতি স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাস নিতে নিতে, রোদে ঝলসে যাওয়া ঘাড় ও গলার কিছু কিছু জায়গা হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল সে। মৃদু উপহাস ও বিদ্রুপাত্মক ভাবে সে বললে, তোমরা ইতিমধ্যে আমার সৎকারের সব আয়োজনই মনে হয় ভালভাবেই ব্যবস্থা করে ফেলেছ।

আমরা সমুদ্রের তীরে ফিরে আসার আগেই, মালকে আরও একবার জলে ডুব মারল। বন্ধু উইন্টার-এর, হয়তো আগের আলোচনার কথা ভেবেই, প্রচণ্ড কান্নাকাটি করে প্রায় ভিরমি যাওয়ার মতো অবস্থা। আমরা তাকে কিছুটা শান্ত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে ক্রমাগত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না চালিয়ে যেতেই লাগল।

মালকে আবার জলের গভীরে ডুব মারল। মিনিট পনেরো পরে মালককে দেখা গেল, জল থেকে উঠে এসে সেতুর ওপরে বসল। তার গলায় ঝুলছে মালার মতো একাধিক হেডফোন। এই হেডফোনগুলি দেখতে প্রায় নতুনের মতোই, আর এগুলি সে খুঁজে পায় জলের ওপরে, জাহাজের ওয়ারলেস-কেবিনের মধ্যে থেকে। আর সবশেষে সে এও জানাল, জলের তলায় আটকে যাওয়া ছেলেটিকে উদ্ধার করার সময়েই সে এই কেবিনের প্রবেশের পথটির হদিশ পায়। সে সগর্বে বলল, আমি কাজটা বেশ ঝটপট আর সুন্দরভাবেই সেরে ফেলেছি। আর অন্য কারও পক্ষে এ কাজ করা সম্ভবই হত না। তবে সেজন্যে আমাকে বেশ পরিশ্রমও করতে হয়েছে।

মালকে আরও বলতে থাকল, তোমাদের সবাইকে এখন এ কথা পরিষ্কার জানাই, এই জিনিসগুলি কিন্তু আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। দারুণ জিনিস এগুলো! তাই না? চলতে চলতে গরম হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি কান থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়। তবে অনেক টেকনিকাল ব্যাপার আছে এর মধ্যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ট্রান্সমিটার ও আরও কত কী। এগুলিকে সারিয়েসুরিয়ে হয়তো আবার কাজে লাগানোও যেতে পারে।

কিন্তু এই ব্যাপারে আমার মত একটু ভিন্ন ছিল। সন্দেহ নেই যে মালকে একজন চালাক চতুর, করিতকর্মা মানুষ ছিল। কিন্তু তবু আমি হলফ করে বলতে পারি যে, রেডিয়ো বা হেডফোন সারানোর কাজ তার ক্ষমতার বাইরে ছিল। চেষ্টা করলেও সে সফল হতে পারত না, আর একাজে সে হাতও দেয়নি। আর যদি সে কোনওভাবে, সবকিছু সারিয়েসুরিয়েও, বেতার মারফত তার বড় বড় কথা ও বুকনির অনুষ্ঠান প্রচার করত, তবে মেরিন-পুলিশ কিংবা বন্দর-পুলিশ নিশ্চয়ই আমাদের কাছে এসে তল্লাশি শুরু করে দিত।

এবারে সে তার আসল কাজ, অর্থাৎ ওয়ারলেস-কেবিন থেকে সবকিছু যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলার কাজটি আরম্ভ করে দিল। বেশ কিছু জিনিস সে বন্ধু কুপকাকে ও অন্য ছোট ছেলেদের দান করে দিল। নিজের জন্যে রেখে দিল শুধুমাত্র কয়েকটি হেডফোন। এরপরে, একটানা সপ্তাহখানেক ধরে, সে কানে লাগিয়ে রেখেছিল একটি হেডফোন। আর তারপরে, সে যখন পাকাপাকিভাবে ওয়ারলেস-কেবিনের আসবাবপত্র গোছানো-গাছানোর কাজ শুরু করল, তখন সে ওই হেডফোন যন্ত্রগুলিকে ফেলে দিল।

এরপরে বই বাছাইয়ের পালা— আমি এখন ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, কোন কোন বই— খুব সম্ভবত টুসীমা নামে একটা নৌযুদ্ধের কাহিনির বই, ডুইংগা সিরিজের দুটি গল্পের বই আর কিছু ধর্মীয় গ্রন্থ সে জড়ো করে। সেগুলিকে সে একটা পুরনো উলের কাপড় দিয়ে পুঁটলির মতো বাঁধে, আর এরপরে সেই বাঁধা পুঁটলিটি অয়েল-ক্লথ দিয়ে জড়িয়ে সেলাই করে ফেলে এবং সেলাই করা স্থানগুলি গালা দিয়ে জুড়ে দেয়। আমাদের সামান্য সাহায্য নিয়ে, মালকে তার এই ছোট বস্তাটি, একটি কাঠের ওপরে ভাসিয়ে, জলের ওপর দিয়ে টানতে টানতে জাহাজ পর্যন্ত নিয়ে যায়। সে নিশ্চিন্ত মনে ধরে নেয় যে, এই পুঁটলিতে বন্দি করা বইগুলি শুষ্ক অবস্থাতেই তাদের গন্তব্যস্থলে নিরাপদে পৌঁছবে।

তার পরবর্তী পরিবহনটিতে ছিল— মোমের বাতির বান্ডিল, রান্না করার স্টোভ, কেরোসিন জ্বালানি, অ্যালুমুনিয়ামের বাসনপত্র, চায়ের প্যাকেট, ওটসের প্যাকেট, শুকনো ফল ও তাজা সবজি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাঝেমাঝেই সে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় উধাও হয়ে যেত। চিৎকার করে ডাকাডাকি করেও তার কোনও জবাব পাওয়া যেত না।

অবশ্যই তার নানাবিধ গুণের জন্যে আমরা তাকে প্রশংসা করতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আমাদের এই প্রশংসা অনেক সময়েই কানে নিত না। এমনকী আমরা তাকে তার পরিবহনের কাজে সাহায্য করতে চাইলে, সে তা নিতে অস্বীকার করে।

আমাদের সবার চোখের সামনে এবার সে তার প্রিয় ম্যাডোনার ছবিটি, যেটি আমি তার ঘরের দেওয়ালে ঝুলতে দেখেছি, গোল করে পাকিয়ে, একটা শক্ত কাগজের সিলিন্ডারের মধ্যে পুরে সিলিন্ডারের খোলা প্রান্ত দুটি প্লাসটিক আঠা দিয়ে জুড়ে দিল। প্যাকেট করা এই ছবিটি সে প্রথমে জাহাজে ও পরে জাহাজের ওয়ারলেস-কেবিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিল। পরে আমি ভালভাবেই জানতে পারি, কার জন্যে এবং কেন সে পরিশ্রম করে, জাহাজের ওই ব্রডকাসটিং কেবিনটি সাজানো শুরু করে।

আমার ধারণা, ম্যাডোনার ছবিটি, হয় জলের তলায় পাঠানোর সময়ে কিংবা সেটিকে একটি বদ্ধ, গুমোট, হাওয়া-বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে ঘরে রাখায়, ছবিটির বেশ কিছু অংশ নষ্ট হয়ে যায়।

যাই হোক, এই ঘটনার কয়েকদিন পরে দেখা গেল, মালকের গলায় একেবারে নতুন একটি জিনিস ঝুলছে। এই ঝোলানো বস্তুটি মোটেই কিন্তু তার প্রিয় স্ক্রুড্রাইভারটি ছিল না। এটি ছিল একটি ছোট আকারের, ম্যাডোনার প্রতিকৃতিসহ ব্রোঞ্জের মেডেল। গলায় সুতো দিয়ে ঝোলানোর জন্যে, এই মেডেলটিতে একটা আংটা লাগানো ছিল। এই দেখে আমাদের চোখের ভুরুগুলিও হয়তো কিছু আন্দাজ করে ফেলল। আমরা বুঝতে পারলাম, মালকে তার বিচিত্র ম্যাডোনা-খেলাটি আবার শুরু করতে চলেছে।

আমরা যখন সবেমাত্র সেতুর ওপরে বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই মালকে আবার একবার উধাও হল। জলের তলায় ডুবন্ত জাহাজের সামনের অংশটিতে ঢোকার জন্যে ডুব দিল। অবশ্য মিনিট পনেরোর মধ্যেই সে আবার ফিরে এসে আমাদের পাশে বসল।

তার দিকে তাকিয়ে আমরা আবার একবার বেশ অবাক হলাম— তার গলা পুরো খালি! ম্যাডোনার-মেডেলের হারটি বা অন্য কোনও কিছুই ঝুলছে না। মুখে তার হাসিখুশি ভাব, মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে। এই প্রথম

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মালকেকে আমরা শিস দিতে শুনলাম। অবশ্য এর আগে যে কখনও সে শিস দেয়নি তা নয়, তবে এই প্রথম আমরা তার শিস দিতে থাকা মুখটি ভাল করে লক্ষ করলাম, শিস দিতে দিতে মাঝে মাঝে সে তার ঠোঁট দুটি টিপে পিচকিরির মতো থুথু ফেলতে লাগল। আর আমি— হ্যাঁ আমিই, মালকে বাদে একমাত্র ক্যাথলিক হিসেবে, ভালভাবেই বুঝতে পারলাম থুথু ফেলার ফাঁকে ফাঁকে, সে ম্যাডোনাকে উদ্দেশ করেই শিস দিয়ে কোনও ধর্মীয় গানের সুর ভাঁজতে থাকল।

এর পরে সে জাহাজের ভাঙা ও মরচে ধরা রেলিংয়ে হেলান দিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপরেই, দারুণ খুশির মেজাজে, পুরনো দেওয়ালে ঝুলন্ত দুটি রিঙে পাগুলি ঢুকিয়ে দিল। আর সেই পা দুটি এক বিশেষ তালের সঙ্গে নাচাতে লাগল। আর এই পা নাচানোর থেকে উদ্ভূত এক ভয়ানক আওয়াজের সঙ্গে, তাল মিলিয়ে শুরু করে দিল সে খ্রিস্টধর্মের ইস্টার উৎসবের, একটি দশ পর্বে বিভক্ত লম্বা গান গাইতে।

মালকে এবার অতি সহজভাবেই, তার ল্যাটিন ভাষার পাণ্ডিত্য আকাশে উড়ন্ত পাখিদের কাছে নিক্ষেপ করতে লাগল। আর আমরা অর্থাৎ আমি, হটন, এশ্য, কুপকা প্রভৃতি বন্ধুরা, অতি কৌতূহলী হয়ে শুনতে লাগলাম, মালকের গলায় ল্যাটিন ভাষার কাব্য। এরপরে আমি তার গলা থেকে পাম-সানডে কবিতাটি আশা করছিলাম। মালকে এটি ছাড়াও, একাধিক চরণে লেখা, কয়েকটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করে গেল। আমাদের মধ্যে কয়েকজন, মালকেকে বিশেষ করে সাবার্ট মাটের কবিতাটি পুনরাবৃত্তি করার জন্যে অনুরোধ করল।

তবুও আমার মনে হয় না যে, সে জাহাজের ট্রান্সমিশন বা ব্রডকাসটিংয়ের ঘরটিকে গির্জার ঢঙে, কুমারী-মাতার পূজার উপযোগী, একটি প্রার্থনাসভায় রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। বেশিরভাগ জিনিসপত্র, যেগুলি এরপরে ওই ঘরটিতে পাঠানো হল, সেগুলির সঙ্গে কুমারী ম্যারী মাতার কোনওই সম্পর্ক ছিল না। তার এই নতুন কামরাটিতে আমরা কখনও ঢুকিনি আর আমাদের পক্ষে তা সম্ভবও হয়ে ওঠেনি।

তবে সব দেখেশুনে আমাদের মনে হয়েছিল, সে হয়তো একটু ছোট আকারে, তার নিজের বাড়ির, নিজের ঘরটির মতো করেই, তার এই নতুন কামরাটি সাজাতে চেষ্টা করেছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

শুধু, ক্যাকটাস বা ওই ধরনের ছোট টবে লাগানো কিছু গাছ, যেগুলি মালকের পিসিমা বিশেষ যত্ন করে, তার ঘরের জানলার সামনে কিংবা সিঁড়ির মতো লাগানো কাঠের তাকের ওপরে সাজিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলি তার নতুন ব্রডকাস্টিংয়ের ঘরে কিন্তু তেমন কোনও ভাল জায়গায় স্থান পেল না। এ ছাড়া, এই নতুন ঘরটির সাজানো-গোছানোর কাজ সে ভালভাবেই করেছিল বলা যায়।

বই ও রান্না করার জিনিসপত্র গোছানোর পরে, ১,১২৫ স্কেলে, তার নিজের বানানো মডেল-বোট গ্রিলে ও আরও কিছু মডেল টরপেডো-বোট, সাজিয়ে রাখল সে কাঠের তৈরি মেঝের ওপরটিতেই।

অন্যান্য জিনিসপত্র, যেমন কলমের কালি, কিছু ফাউনটেন পেন, লাইন টানার রুল, জ্যামিতির কম্পাস, বাক্সবন্দি সংগ্রহ-করা প্রজাপতি, পেটে কাপড়-ঠাসা নিজের হাতে তৈরি একটি সফেদ প্যাঁচা— এসব কিছুকেই জলের তলা দিয়ে তাদের গন্তব্যস্থলে যেতে হল। ক্রমশ আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, মালকের এই সাজানো-গোছানোর পুরো ব্যাপারটি, ঘরটিকে আসলে ক্রমেই কুৎসিৎ করে তুলল। কারণ তার এই বাছাই করা ঘরটি এমনই একটা জায়গায় ছিল, যেখানে শুধুমাত্র জোলো আর গুমোট বাতাসই ছিল। বিশেষ করে, কাচের বাক্সের মধ্যে সাজানো প্রজাপতিগুলি, যেগুলি গরম স্থান ছাড়া টিকে থাকতেই পারে না, ওই ভ্যাপসা কামরায় এসে তারা নিশ্চয়ই বেশ কষ্ট পেয়ে থাকবে।

দীর্ঘদিন ধরে একটানা চলতে থাকা, মালকের এই ঘর সাজানো ও ঘর পালটানোর খেলাটি দেখে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, তার এই সমস্ত প্রয়াসটাই অর্থহীন ও ইচ্ছাকৃতভাবে একটি ধ্বংসাত্বক কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। মাত্র দু'বছর আগে, মালকে কঠোর পরিশ্রম করে, জলে ডোবা পোলিশ জাহাজটি থেকে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে,—যেমন অতি পুরনো সুন্দর পিলসুড্‌স্কির গ্রামাফোনটি, একটি তামার চাকতি যার ওপরে খোদাই করা ছিল এই যন্ত্রটি চালানোর নিয়মাবলি,—ইত্যাদি ইত্যাদি—। হায়, এখন সে এই সবকিছুই নষ্ট করতে চলেছে!

কিন্তু তবুও, এ সবকিছু নিয়েই, এমনকী জলের ধারে ছোট ছেলেদের বিরক্তিকর চলাফেরা সহ্য করেও, আমরা বলতে পারি যে, সেই গ্রীষ্মের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দিনগুলি ছিল খুবই আনন্দ আর উত্তেজনায় ভরা। এর পরে যুদ্ধ আর মাত্র সপ্তাহ চারেকের মতো চলেছিল।

এবার একটি আনন্দদায়ক ঘটনার কথা বলি, মালকে হঠাৎ আমাদের কোনও গানের অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। আপনাদের সবার নিশ্চয়ই মনে পড়বে, গত চল্লিশ সালের গ্রীষ্মকালে, আমরা সবাই, মালকের সঙ্গে কমপক্ষে ছয়-সাতবার ডুবসাঁতার দিয়ে ডুবন্ত জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। মালকে অতি কষ্ট ও পরিশ্রম করে সেখান থেকে তুলে আনে একটি গ্রামাফোন যন্ত্র। পরে সে সেটিকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, সারিয়েসুরিয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, রেকর্ড ঘোরানোর চাকতিটি সুন্দর ভেলভেটের কাপড় দিয়ে মুড়ে দেয়। এখন সে এই সুন্দর কর্মক্ষম যন্ত্রটি ও সেই সঙ্গে কমপক্ষে এক ডজনের মতো গ্রামাফোন রেকর্ড— এই সবকিছুই পরিবহন হিসেবে, তার ইচ্ছেমতো সেই ঠান্ডা ঘরটিতে পাঠানো হল আর সেগুলি গিয়ে স্থান পেল ওই স্যাঁতসেঁতে ঘরটির মেঝেতে। তার এই ব্যস্ততাময় পরিবহনের কাজটি একটানা দু'দিন ধরে চলে, আর এসব কাজের মধ্যেও সে কিন্তু জুতোর ফিতে দিয়ে বাঁধা গ্রামাফোনের হাতলটি গলায় ঝুলিয়ে রাখতে কখনওই ভুলে যায়নি।

ভাগ্য ভাল যে, গ্রামাফোন যন্ত্রটি ও এল-পি রেকর্ডগুলি ভেঙেচুরে না গিয়ে, প্রায় অক্ষত অবস্থায়, জাহাজের সামনের অংশটি পার হয়ে, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, মাঝখানের ব্রডকাসটিং ঘরটিতে পৌঁছতে পেরেছিল। আর সেইদিন বিকেলেই, মালকে তার পরিবহনের কাজ ধীরে ধীরে সমাধা করেই, আমাদের সামনে এমন একটি ঘটনা ঘটাল, যা আমাদের সবাইকে সত্যিই অবাক করে দিল। হঠাৎ আমরা জাহাজের বিভিন্ন জায়গা থেকে আর বিশেষ করে ব্রডকাসটিং কামরাটির দিক থেকে ভেসে আসা, এক ফাঁপা ও হালকা ধরনের বাজনার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমাদের ভয় হল এই অদ্ভুত আওয়াজটি জাহাজের মধ্যেকার স্ক্রু দিয়ে আঁটা জিনিসপত্র আলগা না করে দেয়।

বিকেলের সূর্য ইতিমধ্যে বেশ নীচে নেমে গেলেও, তার কিছুটা উত্তাপ, আমরা সেতুর ওপরে দাঁড়িয়েও উপভোগ করতে থাকলাম। এই উত্তাপ আর ওই বাজনার ফাঁপা আওয়াজ, এ দুয়ের প্রভাবেই হয়তো আমাদের গায়ের ত্বক কিছুটা শিউরে উঠেছিল। আমরা অবশ্যই চিৎকার করে মালককে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বলতে পারতাম এবার থামো, না না আবার চালাও— একটা নতুন রেকর্ড চালাও—

আমার সান্তা মারিয়া নামক বিখ্যাত দীর্ঘ গানটি শুনতে ইচ্ছে হল। এই চুইংগামের মতো লম্বা গানটি হয়তো, সমুদ্রের অশান্ত জলকে অল্প শান্ত করতে পারত। কিন্তু আমার ইচ্ছে থাকলেও কোনও লাভ হল না। কুমারী মেয়ে মারিয়ার মূর্তি চোখের সামনে না দেখে, মালকের পক্ষে এই গানটি বাজানো মোটেই সম্ভব ছিল না। তবে এ গানটি ছাড়াও, আরিয়া বা ওভারটুওর জাতীয় অপেরার কিছু বিখ্যাত গানও আমাদের মনে পড়েছিল।

বলাই হয়নি যে, মালকে ক্লাসিকাল গানবাজনাও বুঝত ও শুনত। সেই কারণেই, মালকে তার আন্তরিক ইচ্ছে থেকেই, আমাদের বেশ কিছু বহুল পরিচিত, উচ্চমানের অপেরার সিমফনি-মিউজিক বাজিয়ে শোনাতে থাকলে, বন্ধু কুপকা ও শ্যিলীং চিৎকার করে, কিছু একটা হালকা বা উত্তেজক বাজনা শুনতে চাইল। মালকের কিন্তু এ ধরনের বাজনার কোনও রেকর্ড ছিল না। আর সবশেষে, সত্যিই সারার গানের রেকর্ডটি চালানো হলে, পরিবেশটি তখন হঠাৎ এমন জমে উঠল যে, জলের নীচ থেকে ভেসে আসা গায়িকা সারার কণ্ঠস্বর শোনার আনন্দে, আমরা সবাই মরচে ধরা রেলিঙের ওপরে জমে থাকা গাংচিলদের বিষ্ঠার ঢিপির ওপরে গিয়ে পড়লাম। আমার ঠিক মনে নেই, গায়িকা সারার কোন কোন গানগুলি রেকর্ডে বেজেছিল। কিছু কিছু গান ছিল একই ধরণের ঢঙে ও সুরে গাওয়া। তবে এর মধ্যে একটা বিশেষ পরিচিত অপেরার গান, যেটি আমরা মাতৃভূমি নামের একটি ফিল্মে শুনেছিলাম, সেটি তিনি অতি সুন্দরভাবে গেয়েছিলেন। অর্গান যন্ত্রের আওয়াজ কণ্ঠস্বরে এনে শ্রোতাদের অভিভূত করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। আর তাঁর গান পরিবেশন করার ধরনটিও ছিল বেশ আবেগপূর্ণ।

রেকর্ডের এইসব গান শুনে আমাদের সবার মধ্যেই বিশেষ আবেগ সঞ্চারিত হয়। বন্ধু উইন্টারের তো কান্নায় প্রায় গলা বন্ধ হয়ে আসে, আর আমাদেরও ক্রমাগত চোখের জল মুছতে হয়। এই আবেগপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই, কিন্তু মাথার ওপরে চলতে থাকে উড়ন্ত পাখিদের একটানা আনাগোনা।

আমাদের মন দিয়ে গায়িকা সারার রেকর্ডের সুন্দর গানগুলি শুনছি, আর ওপর থেকে আসছে ক্ষিপ্ত গাংচিলদের, পাগলের মতো ঝটপটানির

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বিরক্তিকর শব্দ। এই সব পাখিদের গলা থেকে নিঃসৃত তীক্ষ্ণ আওয়াজ, কোনও পরলোকগত গায়কের, চড়া পরদার অনুকরণীয় কণ্ঠস্বরকেও হার মানিয়ে দেয়। মালকে তার এই সব চিড় খাওয়া রেকর্ডগুলি একাধিকবার বাজিয়ে, অতি কর্কশ ধরনের গানের আওয়াজ শুনিয়ে, তারপরে এই ধরনেরই গানের কোনও এক অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্যে আমাদের আমন্ত্রণ জানায়।

এরপরে, বেশ কিছুদিন যাবৎ কোনও ধরনের গান-বাজনাই আমাকে কোনও আনন্দ বা তৃপ্তি দিতে পারেনি। অপরদিকে, যখনই আমার আর্থিক অবস্থা একটু ভাল থাকত, তখনই আমি দোকান থেকে, মন্টিভ্যারডি থেকে শুরু করে বেলা বারটোক প্রভৃতি বিখ্যাত কম্পোজারদের শাস্ত্রীয় সংগীতের কিছু-না-কিছু এল-পি রেকর্ড কিনে আনতাম আর আমাদের রবার্ট-স্যুমান-হলের সংগীতানুষ্ঠানগুলিতে আমি একজন প্রায় নিয়মিত শ্রোতাও হয়ে গিয়েছিলাম।

এসব সত্ত্বেও, আমরা অনেকটা অনিচ্ছা ও অতৃপ্তির মনোভাব নিয়ে মালকের ওই গ্রামাফোনটিকে, শুধুমাত্র একটি আওয়াজ সৃস্টিকারী যন্ত্র হিসেবেই গণ্য করতাম। এটিকে প্রশংসা করার মতো কোনও শব্দই আমাদের মাথায় আসেনি।

একদিকে আমরা মালককে, তার কর্মকাণ্ডের জন্যে যেমন তারিফ করেছিলুম আর অন্য দিকে এই সব প্রশংসার করা সত্ত্বেও, আমরা তার মধ্যে দেখেছিলাম এক বিরক্তিকর মানুষকেও। আর এই কারণেই, মাঝে মাঝে আমরা তার মুখদর্শন করতেও চাইতাম না।

এরপরে, হঠাৎ যখন একটি নিম্নগামী বোমারু বিমান, প্রায় আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, মালকের জন্যে আমাদের একটু ভয়ও করেছিল। অথচ ঘটল উলটো ব্যাপার, কেন জানি না, সে হঠাৎ বেশ রাগান্বিত হয়ে, চোখ পাকিয়ে আমাদের দিকে গর্জন করতে থাকল। আমরা তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। এই ঘটনাটির পরে, লোকের সামনে তার সঙ্গে দেখা দিতে আমি লজ্জাবোধ করেছিলাম।

অপরদিকে, আমি কিছুটা গর্ববোধ করেছিলাম, যখন বন্ধু হটনের ছোটবোন ও প্রোকিফকের নামে ছোট্ট মেয়েটি, দু'জনে একসঙ্গে আর্ট সিনেমা হলের সামনে, আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করে।

আর একবার বন্ধু শ্যিলীং বন্ধু হটনকে সরাসরি প্রশ্ন করে বসল, সত্যি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বল দেখি, তোর ছোটবোনটি কোনও সময়ে মালকের সঙ্গে সিনেমা বা অন্য কোথাও গিয়েছে কি না? আর যদি গিয়ে থাকে, তবে এবার লুকিয়ে না রেখে বল, এ ব্যাপারে এখন তোর মত কী বা করণীয়ই বা কী?

সাত

পুরনো পোলিশ জাহাজ রিবিট্‌ভাতে, লেফটানেন্ট কমান্ডার ও জাঁকজমক সাজপোশাক পরা সাবমেরিন-ক্যাপটেন— এই দু'জন প্রভাবশালী মানুষের প্রবেশের সঙ্গেই আমাদের গ্রামাফোন বাজিয়ে গান শোনার কনসার্টটি শেষ হয়ে গেল।

তাঁরা যদি না আসতেন, তবে হয়তো আরও চার-পাঁচ দিন এই গ্রামাফোন যন্ত্রটি ও রেকর্ডগুলি, বিদঘুটে আওয়াজ করে বেজে চলত। কিন্তু তাঁরা এসে হাজির হলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গ্রামাফোনটি বন্ধ করে দিলেন। আর এই সূত্রে, মালকের সম্বন্ধে আমাদের কথাবার্তা বলার বিষয়টিও বেশ কিছুটা পালটে দিলেন।

এই লেফটানেন্ট কমান্ডার ভদ্রলোকটি সম্ভবত গত চৌত্রিশ সালেই গ্র্যাজুয়েট হয়ে থাকবেন। লোকমুখে শোনা যায় যে, স্বইচ্ছায় নেভিতে যোগদান করার আগে, তিনি হয়তো অল্প দিন কোনও ইউনিভার্সিটিতে থিওলজি ও জার্মান সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করে থাকবেন।

কিন্তু আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয়, এই মানুষটির চোখদুটি ছিল গাঢ় লাল ও রাগী ধরনের, চুল প্রাচীন রোম-সৈনিকদের মতো শক্ত ও খাড়া। গালে ছিল না নৌবহরে কর্মরত মানুষদের প্রচলিত দাড়ি, তার বদলে ছিল শক্ত, খাড়া চুলওলা দুটি ভ্রু। কপালের ভাঁজগুলি ছিল অদ্ভুত, মোটেই সমান্তরাল নয়, ঠিক নাকের ওপর দিয়ে লম্বভাবে দুটি ভাঁজ, সরাসরি ওপরের দিকে উঠেছে, বোধহয় ঈশ্বরকে খোঁজার জন্যেই তৎপর ছিল তারা। মুখের ভাঁজগুলিতে আলো পড়লে, তা বেশ নড়াচড়া করতে থাকত। নাকটি আকারে ছোট হলেও বেশ ধারালো ছিল। মুখটি খোলা অবস্থায় দেখলে বোঝা যেত যে, এটি একজন বক্তার মুখ।

অডিটরিয়াম হলটি পুরোপুরি মানুষের ভিড়ে ও গরম সোনালি রোদে

আমার বই 2 দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভরা। আমরা কোনওক্রমে জানলার তলার পাটাতনে স্থান করে নিলাম।

কার পরামর্শে গুডরুন স্কুলের দুটি উঁচু ক্লাসের ছাত্রীদের লেফটানেন্ট কমান্ডারের বক্তৃতার অনুষ্ঠানে ডাকা হয়? ওই দুই ক্লাসের মেয়েরা এসে প্রথমেই সামনের দুটি সারি দখল করে নিয়েছিল। বুকের স্তনের মাপ আর গড়ন অনুযায়ী এইসব ছাত্রীদের আসলে ব্রা পরে আসাই উচিত ছিল, কিন্তু তারা তা করেনি।

স্কুলের কেয়ারটেকার মহাশয়, যখন লেফটানেন্টের বক্তৃতার কথাটি ঘোষণা করলেন, মালকে তখন সেখানে যাওয়ার কোনও উৎসাহ দেখাল না। এর পরে আমি, হয়তো কিছুটা নিজের স্বার্থের জন্যেই, তাকে পাঁজাকোলা করে সেখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করলাম। জানলার তলার পাটাতনে, আমার পাশে, তাকে বসালাম। আর আমাদের পিছনে, স্কুলের উঠোনে নিথরভাবে দাঁড়িয়ে ছিল বিশালকায় কাস্টানিয়েন বাদাম গাছটি। লেফটানেন্টের কথা শুরু করার আগে থেকেই, কেন জানি না, মালকে ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করে দিল। সে তার দু'হাত দিয়ে পায়ের হাঁটুদুটি চেপে ধরে, শরীর শান্ত করার চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হল না, সারা শরীর কাঁপতেই থাকল।

কেয়ারটেকার মশাই, অতি নিখুঁতভাবে অর্ধচক্র আকারে, সামনের সারির চেয়ারগুলি সাজিয়ে রেখেছিলেন। চেয়ারগুলিতে আরামদায়ক গদি আর ভালভাবে হেলান দেবার ব্যবস্থা ছিল। গুডরুন স্কুলের দু'জন মহিলা শিক্ষিকাসহ আর সব শিক্ষকের জন্যে প্রথম দুটি সারি নির্দিষ্ট করা ছিল। স্কুলের প্রেসিডেন্ট ড. মুলার সাহেবের শান্তভাবে হাততালি দেওয়ার পরেই, হলের গুঞ্জন শান্ত হয়ে, পরবর্তী বক্তা ডিরেক্টর ক্লোশ্যের বলার পরিবেশ সৃষ্টি করল।

ছোট ও লম্বা বিনুনি ঝুলিয়ে বসে থাকা ছাত্রীদের ঠিক পিছনের সারিতেই, পকেট-ছুরি নিয়ে কিছু ছোকরা বসে ছিল। কোনও কোনও ছাত্রী, হয়তো আড়চোখে তাদের দেখেই, বিনুনিগুলি সামনের দিকে টেনে নিল। তবুও কিছু লম্বা বিনুনি, হয়তো ওই ছোকরাদের জন্যেই, পিছনেই ঝুলতে থাকল।

এবারে বক্তৃতার আগে ছিল একটি ভূমিকার পালা। ডিরেক্টার ক্লোশ্যে অনেক কিছু বিষয়ের ওপরে বললেন, যেমন যে সব সৈনিকরা সামরিক যুদ্ধক্ষেত্রে, নৌবাহিনীতে কিংবা বিমানবাহিনীতে কাজ করছেন, যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, অসামরিক বিভাগেও কাজের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তাঁদের সম্বন্ধে। বেশি বিনয় না দেখান, বেশ লম্বা পরিষ্কার ভাষায় বক্তৃতা। ছাত্রদের উদ্দেশ করে কোন সৈনিক কোথায় মারা গেছেন। নানান উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বোঝালেন মানব জীবনের পবিত্র ও পুণ্য কর্তব্যের কথা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। ছাত্রদের উদ্দেশ করে লেফটানেন্ট সাহেবের লেখা, একটি বিখ্যাত রচনার কিছু অংশ থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করে পড়ে শোনালেন: আমাদের মধ্যে থেকে, আমাদের এই স্কুল থেকেই—এই স্কুলের শিক্ষা, মনোবল ও সাহস নিয়েই, এখানকার কিছু ছাত্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে দেশের কাজে—।

আর ডিরেক্টার ক্লোশ্যের বক্তৃতা চলাকালীন সময়েই, কিছু লেখা একটি চিরকুট কাগজ, আমাদের বসার জায়গার সামনের দিক থেকে ছাত্রীদের বসার সারির পিছন দিকে, কী বিশ্রীভাবেই না ঘোরাফেরা করতে লাগল। ছোকরাদের লেখা এই চিরকুটটির ওপরে, আমার এখন ভাল মনে নেই, আমিও সম্ভবত, বসে থাকা দুটি বিশেষ মেয়েকে নিয়ে, আমার একটি মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলাম, যদিও তার কোনও জবাব পাইনি। এদিকে, মালকে তার হাত দুটি দিয়ে, ক্রমাগত কাঁপতে থাকা হাঁটুদুটি চেপে ধরে বসে—, অবশ্য, আস্তে আস্তে এই কাঁপুনি কিছুটা কমতে থাকল।

লেফটানেন্ট মশাই মঞ্চের ওপরে, দু'জন জাঁদরেল মানুষের মাঝখানে চিঁড়েচেপটা হয়ে বসে ছিলেন। প্রথম মানুষটি হলেন, স্কুলের শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার মি. ব্রুনীস, যিনি কোনওরকমের লজ্জা-শরমের ধার না ধেরে, সবসময়ে লজেন্স চুষতে থাকেন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হলেন আমাদের রাশভারী ল্যাটিন শিক্ষক ড. স্টাখনীথ্স মহাশয়।

এরপরে যখন বক্তৃতার ভূমিকা পর্বটি শেষ হল, যখন হিজিবিজি লেখায় ভরা চিরকুটটি আবার এধার-ওধার আনাগোনা করতে থাকল, যখন পকেট-ছুরি হাতে নেওয়া চ্যাংড়া ছেলেগুলিও ভালভাবে তৈরি হল, যখন দেওয়ালে টাঙানো ছবির মধ্যে থেকে বোঁচা গোঁফ-ওয়ালা হিটলার মশায়ের চোখদুটি, ঘরের অন্যত্র ঝোলানো রাজা-মহারাজাদের ছবির চোখগুলির সঙ্গে ক্রুদ্ধভাবে দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগল, যখন সূর্যের সুন্দর রোদ আমাদের হলের মধ্যে প্রবেশ করল—, সেই সময়ে, হ্যাঁ ঠিক সেই সময়েই, ক্যাপটেন লেফটানেন্ট রুমাল দিয়ে ভালভাবে তাঁর মুখ ও ঠোঁটদুটি মুছে, কিছুটা গোমড়া মুখ আর কটমটে চাহনি মিশিয়ে, বেশ ইচ্ছে করেই তাঁর চোখের দৃষ্টি, হলঘরে বসে থাকা মেয়েগুলির দিক থেকে সরিয়ে নিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমান্তরাল পাদুটির ওপরে ঠিকভাবে টুপিটি, আর টুপির তলাতে ঠিতমতো ভাঁজ করা দস্তানাটি রাখা, পারফেক্ট জেন্টলম্যানের মেজাজে ও পোশাক পরে বসে আছেন লেফটানেন্ট সাহেব। গলায় বিরাজ করছে সুন্দর জামার ধপধপে সাদা কলারটি। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে, তিনি চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, সেই জানলাটির দিকে, যেখানে আমরা সবাই বসে। মালকে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে কাঁপতে শুরু করে দিল, ভাবল সে নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গিয়েছে। অথচ সে আসলে ধরা পড়েনি। আমরা যে জানলার পাটাতনটির ওপরে বসে ছিলাম, সেই জানলার দিকে চোখ রেখে, তিনি হয়তো বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালকায় বাদাম গাছটি দেখে থাকবেন।

এইসব দেখেশুনে, সেই মুহূর্তে আমি ভেবেছিলাম, আর এখনও প্রশ্ন করছি, লেফটানেন্ট বাবু ও মালকে, এই দু'জনে আসলে সত্যিই কী দেখছিলেন?

এ ছাড়া আরও জানতে ইচ্ছে করে, ক্লোশ্যে সাহেব তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে, ব্রুনীস সাহেব লজেন্স চুষতে চুষতে, চ্যাংড়া ভেরা ছেলেটি চিরকুটে লিখতে লিখতে— এঁরা সবাই সেই সময়ে, কী নিয়ে— সত্যিই কী নিয়ে চিন্তা করেছিলেন?

কারণ, এই বিশেষ ব্যাপারটা জানা প্রয়োজন, কেন একজন সাবমেরিন কমান্ডার, অন্য লোকেদের কথা শুনতে থাকেন ও আর একই সময়ে তাঁর কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি চারিদিকে ঘোরাতে থাকেন, যতক্ষণ-না মালকের মতো একজন স্কুলছাত্র নিজেকে আক্রান্ত বলে মনে করে। কিন্তু আসলে এই কমান্ডার মানুষটি, তাঁর দৃষ্টি ছাত্রদের মাথার ওপর দিয়ে, মোটা কাচের জানলা ভেদ করে, স্কুলের উঠোনের সবুজ গাছপালার ওপরেই নিবদ্ধ করেছিলেন, আর বড়সড় লাল রঙের জিভটি দিয়ে তাঁর ঠোঁটগুলি একবার ভিজিয়েও নিয়েছিলেন।

এই সময়ে ক্লোশ্যে সাহেব হলের মধ্যে উপস্থিত শ্রোতাদের তাঁর বক্তব্যের শেষ কথাটি পৌঁছে দিতে চেষ্টা চালালেন, এখনই সময় এসেছে, আমরা যেন আমাদের মাতৃভূমির পরিস্থিতির কথা ভালভাবে বিবেচনা করতে আরম্ভ করি, আর তোমরা ছাত্ররা, তোমাদের এখন জানা দরকার, প্রতিটি যুদ্ধ সীমান্তে কর্মরত সৈনিক ভাইদের কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে, তাদেরকে তোমাদের কী ধরনের বার্তা পাঠানো দরকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লেফটানেন্ট মানুষটি আমাদের কিছুটা প্রতারিতই করেছিলেন। এক অতি জোলো ভাষায় তিনি নৌবাহিনীর কাজকর্মের হিসেব দিতে আরম্ভ করলেন। এই ধরনের সাধারণ জরিপের বিবরণ, যে-কেউ, যে-কোনও নৌবাহিনীর ম্যাগাজিনে খুঁজে পেতে পারে। তারপরে বলতে আরম্ভ করলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান সাবমেরিনের ভূমিকার কথা: কীভাবে বিশেষ দুটি জার্মান সাবমেরিন, ভেডিংগেন এবং ইউ ৯, শত্রুপক্ষের ১৩ মিলিয়ন টনের জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কেমন করে আমাদের ২৫০ টনের প্রীন নামক বড় সাবমেরিন, যেটি জলের তলায় ইলেকট্রনিক শক্তিতে ও জলের ওপরে ডিজেল জ্বালানিতে চলত, বিরোধী পক্ষের রয়াল ওক নামক জাহাজটিকেও জলের তলায় পাঠিয়ে দেয়—। কিন্তু এসব কাহিনি, হয়তো বা এর চাইতে বেশিই কিছু, আমরা অনেক আগে থেকেই বেশ ভালভাবেই জানতাম।

এরপরে আবার আরম্ভ হল বিরক্তিকর পুরনো কাহিনির বিবরণ:

নৌবাহিনীতে কর্মরত টিমগুলির কর্তব্য হল, কঠিন শপথ নিয়ে, জীবন ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে, সদা সর্বদা নিজেদের মধ্যে একতা বজায় রাখা, তা সে দেশের মধ্যে অথবা দেশের বাইরে বহুদূরে যে কোনও স্থানেই হোক না কেন। কাজটি মোটেই সহজ নয়, এ কাজের দায়িত্ব স্নায়ুর ওপরে মাঝে মাঝেই বেশ চাপ দেয়। তোমরা একবার ভেবে দেখো, আমাদের কর্মরত থাকতে হচ্ছে, উত্তাল আটলান্টিক মহাসাগরের একেবারে মাঝখানে কোনও স্থানে, কিংবা জমাট বরফে ঢেকে থাকা সমুদ্রের জলের তলায় কোনও সাবমেরিনের মধ্যে। যেখানে আমাদের হয়তো একটা পুরনো টরপেডোর খোলের মধ্যেই, কোনওক্রমে অল্প সময়ের জন্যে ঘুমিয়ে নিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে একটানা কয়েক দিন করার মতো কিছুই থাকে না— বিরাজ করে এক শীতল আশঙ্কাজনক নিস্তব্ধতা। তারপরে হঠাৎ এসে পড়ে কোনও বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ:— সবকিছু সুরক্ষিত রাখতে হবে— ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে কাজ চালাতে হবে— একটি মাত্র অপ্রয়োজনীয় কথা বিপদ ডেকে আনতে পারে—। এইভাবে যখন আমরা আমাদের ১৭ হাজার টন ওজনের, দুটি বড় আকারের নৌকো বহনকারী, আরনডালে নামক বিশাল ট্যাংকারটি কাজের উপযোগী করে ফেললাম, তখন আমার—আপনার কথাই,—প্রিয় স্টাখ্‌নীথ্‌স মহাশয়, হ্যাঁ, আপনার কথাই আমাদের সবার বার বার মনে পড়েছিল,—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আর আমরা সবাই, লাউডস্পিকার যন্ত্রটি বন্ধ না করেই আনন্দে সমস্বরে আবৃত্তি করে উঠলাম, মনে সাহস এনে দেওয়ার মতো একটি কবিতা।

এই আবৃত্তি একটানা চলতে থাকল, যতক্ষণ-না পর্যন্ত জাহাজের কর্তৃপক্ষ লাউডস্পিকারে আমাদের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন, বাঃ, বিরাট কাজ করেছেন ক্যাপটেন ও আপনার কর্মীরা! আপনাদের বাহবা জানাই। দিনের বাকি সময়টার জন্যে আপনাদের ছুটি বরাদ্দ রইল।

অথচ সাবমেরিনের সমগ্র কাজকর্মের ব্যাপারটা শুধুমাত্র টরপেডো ছেড়ে শত্রুকে আক্রমণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দিনের পর দিন একটানা বইতে থাকা সমুদ্রের ঢেউ, চলমান সাবমেরিনের ক্রমাগত জল কাটার আওয়াজ, আর জলের ওপরের চাঁদোয়ার মতো ঢাকা দেওয়া অন্তহীন আকাশ, দিনের শেষে নিস্তব্ধভাবে সূর্যের অস্ত যাওয়া, আর এই সবেরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানান ধরনের দায়িত্বপূর্ণ কাজ,— এই সমস্ত কিছু একসঙ্গে মিলে, মানুষের মনে প্রায়ই এনে দেয় ক্লান্তি ও হতাশা।

কিন্তু এবার তোমাদের অন্যরকম কিছু কথা বলি। গলায় মেটালের তৈরি বড় পদবি-হারটি ঝুলিয়ে, আমাদের এই লেফটানেন্ট কমান্ডার মানুষটি শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা। তাঁর আসল সামরিক সাফল্য, অর্থাৎ ২৫০ হাজার টনের একটি জাহাজ, একটি বড় ডেসট্রয়ার ও একটি ছোট্ট পরিবহন জাহাজ প্রভৃতি ধ্বংস করার কাহিনির নামমাত্র উল্লেখ করে, তার বদলে কাব্যিক ভাষায়, বহুবিধ উপমা সহযোগে, তিনি বর্ণনা করতে লাগলেন সমুদ্রের সফেদ ফেনিল ঢেউয়ের সঙ্গে চলমান জাহাজের তুননামূলক বিবাহ-মিলনের এক কাহিনি।

অন্য প্রসঙ্গ: মেয়েদের ঝুলন্ত বিনুনিগুলো দেখে চাপা হাসাহাসির ব্যাপার ছাড়াও, আরও কিছু নতুন হাসির খোরাক আমাদের সামনে এসে হাজির হল। কমান্ডার মশাই উপমা সহযোগে, যথারীতি তাঁর কাব্যিক বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন: ওই ধরনের একটি বিরাট সাবমেরিন, দেখতে যেন একটা বিশালকায় তিমিমাছের মতো, যে তার বিরাট উঁচু পিঠটি দিয়ে, কুণ্ডলী পাকানো ফেনিল ঢেউগুলি কেটে এগিয়ে চলেছে তরতর করে—।

এ ছাড়া লেফটানেন্ট কমান্ডারের আর একটি বিশেষ দক্ষতাও ছিল। নিষ্প্রাণ টেকনিকাল শব্দকে, তিনি প্রাণবন্ত উপকথার গল্পের মতো করে নিবেদন করতে পারতেন। সম্ভবত তিনি তাঁর এই বক্তৃতাটি, তাঁর এককালীন জার্মান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভাষা-সাহিত্যের শিক্ষক ব্রুনীস মহাশয়কে উদ্দেশ করেই নিবেদন করছিলেন। ব্রুনীস আমাদের সবার কাছেই কবি আইশ্যেনডরফের প্রিয় ভক্ত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় কমান্ডার মশায়ের রচিত, প্রবন্ধ জাতীয় সুন্দর কিছু লেখা, ক্লোশ্যে কর্তৃক প্রশংসিত হয়। তাই হয়তো, কমান্ডার-মহাশয় সুললিত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে, ছাত্রদের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ভাল ভাল শব্দ সঞ্চয়ন করার ক্ষমতা তাঁর এখনও পর্যন্ত আছে।

কিন্তু হায়! এইসব শব্দসম্ভারে সাজানো কাহিনি, আগে আমরা তাঁর মুখ থেকেই একাধিকবার শুনেছি। তথাপি তিনি এক বৃদ্ধা ঠাকুমার মতো অতি নরম কণ্ঠস্বরে, রূপকথা বর্ণনার ঢঙে, তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে যেতে থাকলেন। ব্যাপারটা অনেকটা দাঁড়িয়েছিল এইরকম, হঠাৎ আমরা যেন সবাই শিশু হয়ে গিয়ে, আমাদের ঠাকুমার কাছ থেকে ব্রাদার-গ্রীমের লেখা কোনও রহস্যময় রূপকথার কাহিনি শুনছি।

এরপরে পরিবেশ সত্যিই বেশ বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াল, যখন তিনি একটি সূর্যাস্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় এক ছবি আঁকা শুরু করে দিলেন।

বলতে থাকলেন,— সূর্যাস্তের পরে ও সন্ধ্যা নামার আগে, মনে হল যেন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে, হাজার হাজার পাখিরা এসে, একটি কৃষ্ণবর্ণের চাদর দিয়ে সারা আকাশ ঢেকে ফেলল। আর আকাশটা এমন একটা অদ্ভুত রং ধারণ করল, যা আমরা আগে কোনওকালে দেখিনি।...মনে হল যেন একটি অস্বাভাবিক ধরনের সুগন্ধি, বৃহৎ, হালকা ও রসাল কমলা লেবু, ধীরে ধীরে নিজেকে উন্মুক্ত করে ফেলল।...আর এই লেবুটি এমন সুন্দরভাবে আঁকা, মনে হয় যেন এটি পুরনো দিনের কোনও এক বিখ্যাত শিল্পীর একটি নিখুঁত পেন্টিং—।

আকাশের কিছু কিছু ফাঁকা অংশে মেঘের দল চলে যাচ্ছে— লাল, রক্তাক্ত রঙের সমুদ্রের জলের ওপরে ছড়িয়ে পড়ছে কী এক অস্বাভাবিক ভয়ংকর রং—।

গলায় লম্বা লবঞ্চুসের মালা ঝুলিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে চলেছেন তিনি, আর তাঁর গলার স্বর ওঠা-নামা করছে, ফিসফিসানি থেকে শুরু করে উঁচু পরদার পিয়ানো যন্ত্রের ঝংকারের মতো। কথার ঝড়ে উড়িয়ে দিচ্ছেন অনেক কিছু, প্রথমে রুপোলি রঙের, তারপরে লাল রঙের— অনেক অনেক কিছু—।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এরপরে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত বক্তব্যটি ছিল পরিষ্কার— ঠিক এইভাবেই পাখিদের কিংবা দেবদূতদের রক্তাক্ত শরীরে মারা যেতে হয়। তারপরেই হঠাৎ তিনি তাঁর কল্পিত মেঘের মধ্যে সান্ডারল্যান্ড টাইপের একটি সামুদ্রিক নৌকো দেখতে পেলেন, যেটি আওয়াজ করে আক্রমণাত্মকভাবে সাবমেরিনের সামনে এসে হাজির হল, তবে তেমন কোনও ক্ষতি করে উঠতে পারল না।

তারপরে কিছুটা শুষ্ক কণ্ঠে, অপেক্ষাকৃত কম উপমা ব্যবহার করে, তাঁর ওই বড়াই করে কথা বলার মুখটি থেকেই নিঃসৃত হল, তাঁর বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্বটি।

আমি তটস্থ হয়ে বসে আছি পেরিস্কোপ জন্ত্রটির ওপরে কড়া নজর রেখে, সন্দেহ হচ্ছে হয়তো আমরা আক্রান্ত হতে পারি।

চোখের সামনে একটা ডেসট্রয়ার বোট,—তার পিছন দিকটা ডুবতে থাকল জলের নীচে। দেখাদেখি আমরাও দশ ইউনিট জলের তলায় নেমে গেলাম।

ডেসট্রয়ারটি এবারে একশো সত্তর ইউনিট নামল—আমরা এবার বাঁদিক বরাবর দশ ডিগ্রি ঘুরে গেলাম। তারপরে, নতুন সিদ্ধান্ত নিয়ে, আবার একশো কুড়ি ডিগ্রি ঘুরে, স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

আমাদের প্রপেলারের আওয়াজ কিছুক্ষণ প্রায় থেমে গেল—ভয়াবহ অবস্থা!—কিন্তু ভাগ্যক্রমে পরে আবার চলতে শুরু করল—একশো আশিতে এসে পৌঁছল।

দূর ছাই! গতিক মোটেই সুবিধের নয়—ছয়—সাত—আট—এগারো হঠাৎ লোডশেডিং, সব আলো নিভে গেল, ঘুটঘুটে অন্ধকার—স্পেয়ার জেনারেটার ভাগ্যক্রমে আবার সময়মতো চালু হল, ফিরে এল আলো! বাঁচা গেল।

এরপরে মেন স্টেশন থেকে স্পষ্ট রিপোর্ট এল— সব ঠিকঠাক আছে চালিয়ে যাও, ভয়ের কিছু নেই। ড্রেসট্রয়ার-টি এবার থামল কিছুক্ষণের জন্যে। আমাদের আবার নিতে হল নতুন রাস্তা,—দিক্‌নির্ণয়ের যন্ত্রটি ঘোরানো হল আরও দশ ডিগ্রির মতো—এর পরে আবার নতুন স্ট্রাটেজি—এইভাবে চলতে লাগল—

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই উত্তেজনার্পূণ সুন্দর বর্ণনাটি, কিছু গদ্যকবিতা, যেমন, আটলান্টিক মহাসাগরে শীতকাল,—সাগরের জলে মরীচিকার চমকানি,—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
টরপেডোর মধ্যে বড়দিনের উৎসব, ইত্যাদি। এই সব হয়তো শেষ পর্যন্ত বড়দিনের একটি ক্রিসমাস ট্রি-র সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারত।—

আর তাঁর বক্তৃতার সমাপ্তিতে, প্রাচীন গ্রিক সাহিত্য থেকে— সাফল্যপূর্ণ যুদ্ধ শেষে দেশে ফেরার আনন্দ—এই ধরনের আধ্যাত্মিক ধাঁচের কিছু কথা, কাব্যিক সুরে বলে শোনালেন তিনি। আরও জানালেন, এরপরে কোনও এক সময়ে, উড়ে আসা গাংচিলেরা জানিয়ে দিল যে, আমরা বন্দর থেকে আর বেশি দূরে নেই।

আমার আর ঠিক মনে নেই, আমাদের ড. ক্লোশ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ কোনও কথা দিয়ে, যেমন, প্রিয় ছাত্ররা, এবার তোমরা যে যার নিজের নিজের কাজে ফিরে যাও—, এই ধরনের কোনও কথা বলে অনুষ্ঠান শেষ করেছিলেন কি না। এটা কিন্তু আমার বেশ ভালই মনে আছে যে, পুরো অনুষ্ঠানটির জন্যে সকলে ড. ক্লোশ্যে-কে, হাততালি দিয়ে সম্মান জানায়। কিন্তু এর পরেই, অনুষ্ঠানটি ঠিকমতো শেষ হওয়ার আগেই, বিনুনি ঝোলানো মেয়েগুলি, কিছুটা বিশৃঙ্খলভাবে, তাদের চেয়ার থেকে ঝটপট ওঠা শুরু করে দিল।

এরপরে, আমি যখন ঘাড় ফিরিয়ে মালকেকে খোঁজার চেষ্টা করলাম, তখন বুঝতে পারলাম সে ইতিমধ্যেই কেটে পড়েছে। বেশ কিছুটা দূরে, বাইরে বেরোনোর পথটিতে, তার পরিচিত চুল আঁচড়ানো মাথাটির নড়াচড়া দেখতে পেলাম। লাফ দিয়ে দ্রুত যে তার কাছে হাজির হব, সেটা সম্ভব হয়ে উঠল না। অনেকক্ষণ বসে থাকার ফলে আমার একটি পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গিয়েছিল। খানিকক্ষণ পরে, স্পোর্ট-হলের পাশের ড্রেসিং-রুমে তার দেখা পেলাম। কিন্তু তার সঙ্গে কী যে কথা বলব, তার মাথা-মুন্ডু ছাই কিছুই মনে এল না।

পরে, ডেসিং-রুমে, ড্রেস চেঞ্জ করার সময়ে, এমন এক গুজব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, যা আমাদের কিছুটা সম্মানিত করেই তুলল।

গুজবটি হল, লেফটানেন্ট ক্যাপটেন মশায় নাকি তাঁর এককালীন স্পোর্ট-ট্রেনার মালেনব্রান্টকে অনুরোধ জানান, তাঁকে যেন, তাঁর পুরনো দিনের সুন্দর স্পোর্ট-হলের মধ্যে একটি বারের জন্যে ট্রেনিং নেওয়ার অনুমতি দেন। প্রতি শনিবারে, যে সময়ে আমরা দু'ঘণ্টা ধরে, অন্য ছাত্রদের সঙ্গে স্পোর্ট-হলে নিয়মিত প্র্যাকটিস চালাতাম, সেই সময়ে তিনি এলেন আর প্রথম ঘণ্টায় আমাদের দেখাতে লাগলেন, কী কী ধরনের একসারসাইজ এখনও তিনি করতে সক্ষম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

স্পোর্টের প্রয়োজনীয় পোশাক যেমন, লাল রঙের ট্রাডিশানাল জিমনাসটিক প্যান্ট, দু'কাঁধে লাল স্ট্রাইপ ও বুকের ওপরে মেটালের ছাপ দেওয়া সাদা শার্ট প্রভৃতি, তিনি মালেনব্রান্ট-এর কাছ থেকে ধার করেছিলেন। ছোটখাটো, সবল ও মজবুত শরীরের আকর্ষণীয় মানুষটির, বুকের অঞ্চলটি ঢাকা ছিল ঘনকালো চুলে।—

আর যায় কোথায়! একটু পরেই, ড্রেস চেঞ্জ করার ঘরে, বেশ কিছু ছেলে এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল তাঁকে। যেমন:

আমরা কি আপনার একটু কাছে আসতে পারি?

আপনার ফিগারটা আমরা কি ভাল করে দেখতে পারি?

সবকিছু আপনার মতো রপ্ত করতে গেলে আর কত সময় লাগবে—,

আমার দাদার এক বন্ধু মেরিনে কাজ করে, আর সে বলে— ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিনি কিন্তু বেশ ধৈর্য করে সবার প্রশ্নেরই জবাব দিতে থাকলেন।

মাঝে মাঝে তিনি অকারণে হেসে উঠতে থাকলেন,—সে এক সংক্রামক হাসি,—আর তাঁর দেখাদেখি ঘরের ছেলেরাও, গলা ছেড়ে হাসতে আরম্ভ করে দিল। আর ঠিক সেই সময়েই, হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মালকের দিকে। ওকে দেখে একটু অবাক হলাম। ও এসব হাসি-তামাশায় মোটেই যোগ না দিয়ে, সবেমাত্র ছাড়া জামা-প্যান্টগুলি ভাল করে পাট করতে লাগল।

এদিকে মালেনব্রান্ট-এর হুইসিলের আওয়াজ আমাদের সবাইকে হুকুম দিয়ে ডাক পাঠাল। আমরা সবাই জিমনাসটিক হলের, প্যারালাল বারের সামনে গিয়ে জমায়েত হলাম।

এরপরে লেফটানেন্ট সাহেব, মালেনব্রান্ট-এর কড়া নির্দেশ অনুযায়ী, জিমনাসটিক ক্লাসটির পরিচালনার ভার নিজের হাতে নিলেন। তিনি জানালেন যে, আমাদের বেশি পরিশ্রম করে কোনও ব্যায়াম করার প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি নিজে কিছু ব্যায়াম করে, আমাদের শুধু দেখাতে চান। তাঁর দেখানো কিছু ব্যায়ামের মধ্যে একটি ছিল বেশ আকর্ষণীয়, কেমন করে বিরাট বিরাট ঢেউ সমুদ্রের তীরে আছড়ে পড়ে, সেটি ব্যায়ামের মাধ্যমে দেখান। সবার মধ্যে, বন্ধু হটন ছাড়া, একমাত্র মালকেই এই ব্যায়ামটি করার সাহস দেখাল। আর, সে তার শরীরটি বাঁকাচোরা করে, ঢেউয়ের ওঠানামা ও আছড়ে পড়ার ব্যাপারটি এমন এক বিদঘুটে ও কুৎসিতভাবে করতে লাগল

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যে, আমাদের পক্ষে তা দেখা অসম্ভব হয়ে উঠল, আমরা চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এরপরে ট্রেনার যখন আমাদের নিয়ে, কয়েকটি ভাল ধরনের গ্রাউন্ড-একসারসাইজ একের পর এক করতে আরম্ভ করলেন, তখন দেখা গেল যে মালকের কণ্ঠনালিটি সেই সঙ্গে নেচে চলেছে।

পরের খেলাটি, যেখানে সাতজন মানুষের ওপর দিয়ে ভল্ট মেরে, শরীর গুটিয়ে সাবধানে মাটিতে পড়তে হয়, সেটি কিন্তু সে ঠিকমতো করে উঠতে পারল না। শরীরটাকে বাঁকা অবস্থায় রেখে ভুলভাবে সে মাটিতে পাতা মাদুরের ওপরে পড়ল। তার পায়ের গোড়ালিতে হয়তো সামান্য চোট লেগে থাকবে। এরপরে সে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো একটা কাঠের মইয়ের ওপরে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে বসে পড়ল। আর তারপরে, যখন ট্রেনার সবাইকে নিয়ে দ্বিতীয় পর্বের অনুশীলন শুরু করলেন, তার আগেই মালকে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

যাই হোক, অনেকক্ষণ পরে আমরা যখন কয়েকটি খেলা শেষ করে, বাসকেটবল খেলা শুরু করলাম, মালকে তখন ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে এই খেলায় যোগ দিল। আমাদের দলের হয়ে খেলে সে অতি দ্রুত তিন-চারবার, বাসকেটবলটি নেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু তা সত্বেও আমরা সেই খেলায় হেরে গেলাম।

নয়া-গথিক আদলে তৈরি আমাদের এই নতুন স্পোর্ট-হলটি নিকটস্থ ম্যারী-চ্যাপেলের মতোই ঝলমলে ও সুন্দর দেখতে ছিল। ফাদার গুসেভস্কি, কিছু প্লাসটার দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র জানলাগুলির সামনে এনে রাখেন। সেগুলি বাদ দিলে, হলটি ছিল আলো আর হাওয়া বাতাসে ভরা ছিমছাম, খেলাধুলার পক্ষে যথাযথ উপযোগী একটি স্থান।

এই স্পোর্ট-হলটির আনাচে কানাচে অনেক গোপনীয় স্থান ছিল, তাই আমাদেরও সেই সব গোপন জায়গার্তে, আলো-অন্ধকারের মধ্যে, নানান খেলা চলতে লাগল। আমাদের এই জিমনাসটিক হলটিতে আরও ছিল কয়েকটি বেশ বড় আকারের অর্ধগোলাকার জানলা। জানলাগুলির বড় বড় পাল্লার ওপরে লাগানো ছিল পাখি ও মাছের সুন্দর কিছু রঙিন কাচের শিল্পের কাজ। দুর্ভাগ্যবশত এর অনেকগুলিই ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। আমি মনে মনে ভাবলাম, সেন্ট ম্যারী চ্যাপেলে অনুষ্ঠিত বড় আকারের এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি, যেগুলি আয়োজন করতে নানারকম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সেগুলি হয়তো সামান্য একটু পরিবর্তন করে, খুব সহজেই আমাদের স্পোর্ট-হলেও করা যেতে পারে।

এরপরে আমাদের জিমনাসটিক হলের রহস্যময় আলো-আঁধারের মধ্যে, দুটি দলের বাসকেটবল খেলাটি অল্প দশ মিনিট সময়ের জন্যে চলে । এই কম সময়ের দ্রুতগতি জমজমাট খেলাটিকে, সহজেই কোনও গির্জার বড় আকারের কোনও আনন্দময় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দশ মিনিট পরে, এই খেলার সঙ্গেই পুরো স্পোর্ট পর্বটি সমাপ্ত হল। জয়ী দলটি বিনয় ও নম্রতা সহকারে হলের পিছনে সরে গিয়ে, আস্তে আস্তে বিদায় নিল।

তারপরে, যখন ভোরের ঝলমলে সূর্যের আলো, বাইরের বাগানের গাছপালা ও হলের বড় বড় জানলার বাধা ভেদ করে, আমাদের হল ঘরটিকে আলোময় করে তুলল, অমনি প্রবল উৎসাহে ঝোলানো ট্রাপিজ ও রিংগুলিকে নিয়ে আমাদের জিমনাসটিক ব্যায়াম করা শুরু হয়ে গেল, আর হলের মধ্যে সৃষ্টি করল এক চিত্তাকর্ষক সুন্দর রোমানটিক পরিবেশ। একটু চেষ্টা করলেই, আমি এখনও আমার চোখের সামনে দেখতে পাই, কত-না আনন্দ উৎসাহ নিয়ে আমাদের কমান্ডার সাহেব, তাঁর জিমনাসটিকের পোশাক পরে, ট্রাপিজের ওপরে ঝুলে নানান কসরত দেখাচ্ছেন।

তারপরে আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, কীভাবে তিনি খালি পায়ে, ঝুলন্ত ট্রাপিজ-রডের ওপরে লাফিয়ে উঠে, হাঁটুদুটি সেখানে ঢুকিয়ে, ত্রুটিহীনভাবে সারা শরীর নীচে ঝুলিয়ে দিলেন। জানলা দিয়ে প্রবেশ করা রোদের আলোয় আমাদের সারা স্পোর্ট হলটি ঝলমল করতে লাগল। কিছুটা সাবেকি ধরনের হলেও, আমাদের এই হলটি ছিল নিঃসন্দেহে এক অতি মনোরম খেলার জায়গা। সেই জন্যেই বোধহয় আমরা এই হলটির নাম দিয়েছিলাম— আনন্দ ও ধনরত্নের ভাণ্ডার।

মালেনব্রান্ট আবার হুইসিল বাজিয়ে আদেশ দিলেন, দুটি ক্লাসের সব ছাত্রদের লাইন করে দাঁড়িয়ে, সমবেতভাবে একটি গান করতে। আর এই গান গাওয়ার পরেই আমরা অবশেষে ছুটি পেলাম। ড্রেসিং-রুমে শুরু হল আবার সেই একই কাণ্ড। বেশ কিছু ছেলে আবার লেফটানেন্ট কমানন্ডারকে ঘিরে ধরল— হয়তো অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে—। যদিও উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করেনি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমাদের ড্রেসিং-রুমে স্নানের জন্যে কোনও শাওয়ারের ব্যবস্থা ছিল না, ছিল শুধুমাত্র একটি বেসিন। কমান্ডার মশাই সেখানে তাঁর মুখ, হাত-পা ভালভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিলেন। তারপরে তিনি খুব তাড়াতাড়ি যাতে কেউ কিছু দেখতে না পায়, তাঁর আন্ডারওয়ার ও স্পোর্ট জ্যাকেটটি পালটে ফেললেন।

কিন্তু এর পরেই তাঁকে আবার হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল। তিনিও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে, বেশ শান্তভাবে ও ধৈর্য ধরে সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকলেন। আর এই সব নানান প্রশ্নের জবাব দেওয়া থেকে হয়তো কিছুটা রেহাই পাওয়ার জন্যে, উত্তর দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে, দুটি হাত নাড়াচাড়া করে কী যেন খোঁজার ভান করতে থাকলেন। বলাবাহুল্য এটি ছিল শুধুমাত্র অজুহাত।

আমি এখনই আবার ফিরে আসছি, তোমরা একটু অপেক্ষা করো,— এই বলে তিনি তাঁর নেভি-ব্লু রঙের হাফপ্যান্ট, সাদা টি-শার্ট, জুতোবিহীন মোজা পরা পা দুটির গতি বাড়িয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রদের কাটিয়ে, মেজেতে রাখা বেঞ্চিগুলি সরিয়ে সরিয়ে, কিছুক্ষণের জন্যে সরে পড়লেন। তাঁর শার্টের কলারটি ছিল খোলা আর এমনভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো, যা দেখে মনে হচ্ছিল, সেটি কোনও বিশেষ সম্মানজনক নেকটাই পরার জন্যে প্রস্তুত।

মালেনব্রান্টের অফিস ঘরের দরজাতে সবসময়ে আমাদের সাপ্তাহিক স্পোর্ট ও জিমনাসটিকের একটি প্ল্যান ঝুলত। লেফটানেন্ট দরজাতে সামান্য টোকা দিয়ে মালেনব্রান্টের ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

সেই সময়ে, আমার মতোই আর সবাই মালকের কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে থাকবে। অবশ্য আমি ঠিক জানি না যে, আমি ওই সময়েই তার কথা ভেবেছিলাম কি না। তবে এ কথা ঠিক যে, আমি কখনওই, তাকে খুঁজে বার করার জন্যে চিৎকার করে বলে উঠিনি, মালকে তুমি কোথায়? কোথায় আছ তুমি ঘাপটি মেরে? আমারই মতো বন্ধুদের মধ্যে কেউই, যেমন হটন, কুপকা প্রভৃতি, তাকে ডাকাডাকি বা খোঁজাখুঁজি করেনি।

তার বদলে আমরা সবাই মিলে আসল মানুষটি, টিকটিকে রোগা, হতভাগ্য বুশ্যমানের ওপরে চোখ রাখলাম। বুশ্যমান— দেখতে কিছুটা দুর্বল ধরনের, জন্মসূত্রে পেয়েছে এক মিটমিটে দেঁতো হাসিওয়ালা মুখ, হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চড়চাপড় খাওয়া সত্ত্বেও, এই বিচিত্র হাসিটি কোনও মতেই তার মুখ থেকে সরে না।

এরপরে, যখন কমান্ডার প্রায় আধা জামাকাপড় পরা অবস্থাতেই, মালেনব্রান্টের সঙ্গে আমাদের সামনে এসে হাজির হলেন, তখন মালেনব্রান্ট কোনও একটি মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন, কে ওখানে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছ? এখনই সামনে এসে মুখটি দেখাও তো বাছাধন!

লুকিয়ে থাকা মানুষটি বুশ্যমান ছাড়া আর কে হতে পারে? তাকে জাপটে ধরে সামনে আনা হল। এমনকী, আমি ব্যাপারটা ভালভাবে জেনেই, বুশ্যমানকে চিৎকার করে একবার ডাকলাম। ঠিকই, আমার মনে হল, এ কাজ নিশ্চয়ই বুশ্যমান করে থাকবে। সে ছাড়া আর কেই-বা আছে এ কাজ করার জন্যে?

কিন্তু যখন মালেনব্রান্ট, লেফটানেন্ট কমান্ডার ও উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা একত্রে, বুশ্যমানকে উদ্দেশ করে নানান প্রশ্ন ছুড়তে লাগল, তখন এই শুনানি দেখেশুনে, আমার মাথায় প্রায় যন্ত্রণা আরম্ভ হল। আর এই যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়তেই লাগল, যখন দেখা গেল যে সে দুই গালে দুই জোরালো থাপ্পড় খেয়েও, তার মুখের বিচিত্র মিটমিটে হাসিটি কোনওমতেই থামাতে পারল না।

এর পরে, আমি বেশ অধৈর্য হয়েই, বুশ্যমানের ভুল স্বীকার করে নেওয়ার জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। শেষপর্যন্ত আমার মনে হল সে হয়তো কোনও চিন্তা-ভাবনা না করেই, হঠাৎ এ কাজ করে বসেছে। আমি বুশ্যমানের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম। বহুবার মালেনব্রান্টের কাছে চড়চাপড় খেয়েও বুশ্যমান কোনও স্বীকারোক্তি করল না।

আর মালেনব্রান্ট মহাশয় হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র নিয়ে কোনও কথা না বলে, প্রচণ্ড গর্জন করে ব্যুশমানকে ধমক দিয়ে বললেন: এবার থামাও তোমার মুচকি হাসি, আবার বলছি আমি, এক্ষুনি থামাও! আমি তোমায় শিখিয়ে দিতে পারি, মুচকি হাসি কেমন করে করতে হয়!

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, মালেনব্রান্টের পক্ষে ব্যুশমানের হাসি থামানো শেষপর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আমি জানি না, আজ সত্যিই ব্যুশমান

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নামে কোনও মানুষ আছে কি না। আর যদি ওই ব্যুশমান নামে কোনও ডাক্তার, ভেটারিনারি ডাক্তার অথবা ডেন্টিস্ট থেকে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই আমাদের ওই মুচকি হাসির ব্যুশমানই হবে। এই বিশেষ ধরনের হাসির অভ্যাসটি সহজে কেউ ছাড়তে পারে না, যুদ্ধ কিংবা অর্থনৈতিক পরিবর্তন অতিক্রম করে, এই ধরনের অভ্যাস বেঁচে থাকে বহুদিন। আর তারপরে, একজন লেফটানেন্ট কমান্ডারের সামনে, টাই বিহীন খোলা জামা পরা অবস্থায়, নিজের বিরুদ্ধে একটি সম্ভাব্য তদন্তের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকাটাও কম সাহসের ব্যাপার ছিল না।

তাই, সবারই চোখের দৃষ্টি যখন ব্যুশমানের ওপরেই নিবদ্ধ— আমার দৃষ্টি কিন্তু সেই সময়ে মালককেকে খুঁজতে থাকল। অবশ্য তাকে বিশেষ খুঁজতে হল না, তার লম্বা ঘাড়টি দেখে আর তার গাওয়া কুমারী ম্যারী মাতার একটি প্রশস্তি করা গান থেকেই বোঝা গেল, সে কোথায়।

ঠিকঠাক পোশাক পরে, লোকজনের ভিড় এড়িয়ে, কাছেই একটি নির্জন স্থানে বসে, সে তার জামার ওপরের বোতামটি লাগানোর কাজে সচেষ্ট। কিন্তু সমস্যা হল, ওপরের বোতামটি লাগালে, তার গলায় ঝুলন্ত প্রিয় জিনিসপত্রগুলি ঢাকা পড়ে যায়! তার জামার কাটিং ও ডিজাইন দেখে মনে হয়, সেটি সম্ভবত তার বাবারই একটি পুরনো জামা। যাই হোক, এই বোতাম আঁটার পরিশ্রম ও তার গলার নলির ক্রমাগত ওঠানামা ব্যাপারগুলি বাদ দিলে, তার হাবভাব মোটামুটি শান্তই ছিল বলা যায়।

অবশেষে, সে যখন সত্যিই বুঝতে পারল, যে বোতাম লাগিয়ে তার লম্বা গলার ওঠানামা করা নলিটি কোনওমতেই ঢাকা দেওয়া সম্ভব নয়, তখন উপায়ন্তর না দেখে, তার ঝুলন্ত কোটের বুকপকেট থেকে, লুকিয়ে রাখা নেকটাইটি বার করে ফেলল। আমাদের ক্লাসের কেউই কোনও সময়ে গলায় টাই বাঁধেনি। ওপরের ক্লাসের কিছু কিছু পাকা ছেলেরা এই হাস্যকর জিনিসটি মাঝে মাঝে গলায় ঝোলাত।

ঘণ্টা দুয়েক আগে, লেফটানেন্ট মশাই যখন হলঘরে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের ওপরে তাঁর বক্তৃতা চালাচ্ছিলেন, সেই সময়ে মালকের জামার কলারটি যদিও খোলা ছিল, কিন্তু জামার পকেটে লুকানো ছিল একটি নেকটাই। এটি পরার জন্যে সে হয়তো কোনও জুতসই সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

মালকের সর্বপ্রথম নেকটাই পরা! সে এক বিরাট কাণ্ড—। হলঘরের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মধ্যে একটা পুরনো, ধুলোজমা, অপরিষ্কার আয়না ঝুলত। মালকে শুধু নিজের চেহারা দেখার জন্যেই, আয়নার সামনে না গিয়ে, বেশ দূর দাঁড়িয়েই গলায় টাইটি ঝোলাল। গাঢ় রঙে ছাপা একটি রুচিহীন, বিতিকিচ্ছিরি পুরনো কাপড়ের টুকরো ছাড়া এটিকে আর অন্য কিছু নাম দেওয়া যায় না।

মালকে তার খাড়া হয়ে থাকা জামার কলারের ওপরে এই জিনিসটি আর এক পাক ঘুরিয়ে, মারল সজোরে এক মোক্ষম ফাঁস। এরপরে রাগের চোটে, যদিও নিচুস্বরে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে সে কিছু একটা বলল, যা তখন চলাকালীন তদন্ত কমিশনের রায়ের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পরে, লেফটানেন্ট সাহেব তদন্ত কমিশনের রায় মেনে নিতে অস্বীকার করায়, ব্যাপারটা মালেনব্রান্টের দুই গালে দুই থাপ্পড় খাওয়ার মতো অপমানজনক হয়ে দাঁড়ায়।

মালকে বলল, আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে, ব্যুশমান এ কাজ কখনওই করেনি। যদিও জানা দরকার, তার পোশাকের পকেটগুলো এখনও পর্যন্ত কেউ একবার পরীক্ষা করে দেখেছে কি না। মালকে কথা বলছিল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, বলা যায় আয়নার সঙ্গেই। তবুও তার এই কথা শোনার জন্যে, নিশ্চয়ই ধারেপাশে কোনও না কোনও শ্রোতা ছিল।

মালকের টাই পরা চেহারা, তার নতুন কায়দায় চালচলন প্রভৃতি, বেশ কিছু লোকের দৃষ্টিগোচর হলেও, কেউই তা একটা মহামারি নতুন কিছু হিসেবে ধরেনি। অন্যদিকে, মালকের আয়নার সঙ্গে কথা বলার ফলও ফলল। মালেনব্রান্ট সাহেব নিজে এসে ব্যুশমানের জামা-প্যান্টের পকেটগুলোর মধ্যে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালাতে শুরু করে দিলেন আর কিছুক্ষণ পরে, হয়তো যুক্তিসংগত কারণে, বারকয়েক বেশ চিৎকার করে হেসে উঠলেন। ব্যুশমানের কোটের দু'পকেট থেকে তিনি খুঁজে বার করলেন বেশ কিছু কনডোমের প্যাকেট। ব্যুশমান উঁচু ক্লাসের ছেলেদের কনডোমের প্যাকেট সস্তায় বিক্রি করে সম্ভবত একটি ছোটখাটো ব্যাবসা চালাত। এ ছাড়া মালেনব্রান্ট, ব্যুশমানের পোশাকের ভেতর থেকে কনডোম ছাড়া আর তেমন কিছু খুঁজে পাননি।

এদিকে লেফটানেন্ট মশাই আনন্দের নিশ্বাস ফেলে, তাঁর অফিসার-টাইতে নতুন করে গিট বাঁধলেন, জামার কলার ভাঁজ করে নামালেন, কলারের একটি বিশেষ অলংকৃত জায়গায় লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে, হাত দিয়ে পালিশ করে দিলেন। তারপরে তিনি এই ব্যাপারটির ওপরে খুব বেশি গুরুত্ব না দিতে মালেনব্রান্টকে পরামর্শ দিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছাত্ররা ধরে নিল যে, এই কনডোমের কাণ্ডকারখানাটি তাদের এক কৌতুককর খেলা বই আর কিছুই ছিল না। এর ফলে মহাভারত একেবারেই অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। তাই তারা ধরে নিল যে, পরিবেশটি আবার নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে।

এদিকে ঘটল ঠিক তার উলটো। মালেনব্রান্ট কড়া হুকুম জারি করে, পোশাক পালটানোর ঘর ও অন্য সব ঘরের দরজাগুলি তালা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। দু'জন ওপরের ক্লাসের ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে, আমাদের প্রত্যেকের জামাকাপড়ের পকেট তল্লাশি চালাতে আরম্ভ করে দিলেন। সারা ঘরের আনাচে-কানাচে, যে সব জায়গায় কিছু লুকিয়ে রাখার সম্ভাবনা থাকতে পারে, সর্বত্রই চলতে লাগল খোঁজাখুঁজি।

আর লেফটানেন্ট সায়েব, এই তল্লাশির কর্মটি কিছুটা কৌতুকজনক মনে করে, নিজেই এই কাজে সাহায্য করতে লেগে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু তিনি অধৈর্য হয়ে পড়লেন, আর তারপরে, হয়তো বিরক্তির বশেই, ড্রেসিং-রুমের মধ্যেই এমন একটি কাজ করে বসলেন, যা কোনওকালেই কেউ করতে সাহস পায়নি।

একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে ধূমপান করতে লাগলেন তিনি, আর পোড়া সিগারেটগুলি লিনোলিয়াম দিয়ে তৈরি সুন্দর দামি মেজের ওপরেই ফেলতে লাগলেন। তাঁর মেজাজ এর পরে নিশ্চয়ই আরও বিগড়ে গিয়ে থাকবে, যখন মালেনব্রান্ট, কোনও কথা না বলে, চোখ পাকিয়ে, সিগারেট ফেলার জন্যে, তাঁর দিকে একটি বড় পিকদানি এনে ধরলেন। বহুকাল ধরে অব্যবহৃত এই পিকদানিটি ঘরের একটি কোণে ধুলোজমা অবস্থায় পড়ে ছিল, আর এটিকে একটি সম্ভাব্য লুকিয়ে রাখার জায়গা হিসেবে, ইতিমধ্যে তল্লাশি করাও হয়েছিল। লজ্জায় লেফটানেন্ট সাহেবের মুখটি শিশুসুলভ রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বাঁকানো গোলাকার ঠোঁটদুটিতে চেপে-ধরা নতুন সিগারেটটি বার করে পিকদানির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, ধূমপান করা আপাতত বন্ধ রাখলেন। তারপরে তিনি তাঁর হাতদুটি গুটিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। আর খানিকক্ষণ নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ কাজের মানুষ হিসেবে জাহির করার জন্যে, উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে, বারবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখতে লাগলেন।

এরপরে, বিদায় নেওয়ার আগে, হাতের দস্তানা পরতে পরতে, গমনপথের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দরজাটির সামনে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে জানালেন যে, এই তদন্ত কমিশনের কাজের ধরন ও পদ্ধতিটি তিনি কোনওভাবেই অনুমোদন করবেন না। আরও বললেন যে, এই তদন্তের জটিল ও বিরক্তিকর কাহিনির পুরো রিপোর্টটি তিনি স্কুলের ডাইরেকটারের কাছে দাখিল করবেন।

তার কারণটি হল এই: তিনি মোটেই চান না যে, এই সব অশিক্ষিত মানুষগুলির ভুলভাল কাজের জন্যে তাঁর পুরো ছুটিটি বরবাদ হয়ে যাক। এরপরে মালেনব্রান্ট স্কুলের একটি উঁচু ক্লাসের ছাত্রকে লক্ষ্য করে, চাবির থোলোটি তার দিকে ছুড়ে দিলেন। ছেলেটি কিছুটা অক্ষম ধরনের ছিল। চাবিটি হাতে নিয়ে পোশাক পালটানোর ঘরের দরজা খুলতে, সে এক অস্বস্তিকর লম্বা সময় নিল।

আট

এদিকে তদন্ত কমিশনের শুনানি চলতে লাগল একটানা বহুক্ষণ ধরে, ফলাফলও তেমন কিছু একটা বেরিয়ে এল না, অথচ মাঝখান থেকে আমাদের শনিবারের সুন্দর বিকেলটা মাঠে মারা গেল। এই শুনানি সংক্রান্ত ব্যাপারে, হয়তো কমিশনের কাছে আমারও কিছু বলার ছিল, কিন্তু এখন এ প্রসঙ্গ তোলার আর কোনও প্রয়োজন রইল না।

এদিকে মালকের ওপরেও আমাকে চোখ রাখতে হচ্ছিল। মালকে তার গলায় বাঁধা নেকটাইটি বারবার টেনে, ওপরে তুলে শক্ত করে গিট বাঁধার চেষ্টা করছিল। তবে এ কাজে সত্যি সফল হতে গেলে একমাত্র রাস্তা ছিল, প্রথমে তার গলায় একটা পেরেক লাগানো আর ওই পেরেকের সঙ্গে টাইটি বাঁধা। হায়! মালককে সাহায্য করা সবার সবরকম ক্ষমতারই বাইরে—।

আর এখন লেফটানেন্ট মশায়ের খবরই বা কী? এই প্রশ্ন তুললে তার উত্তর বেশি দীর্ঘ হবে না। তিনি দ্বিপ্রহরের কমিশনের শুনানিতে মোটেই হাজির ছিলেন না। প্রায় বিশ্বাসযোগ্য এক উড়োখবর হল, ওই সময়ে তিনি তাঁর ফিঁয়াসেকে নিয়ে শহরে বেড়াতে আর দোকানপাট দেখতে ব্যস্ত ছিলেন। এমনকী আমাদের ক্লাসের একজন ছাত্র বেশ জোরের সঙ্গেই জানাল যে, সে রবিবার বিকেলে লেফটানেন্ট মশাইকে শহরের একটি নামকরা কাফেটেরিয়া

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চার-ঋতুর-কফিচক্র-তে তাঁর ফিঁয়াসে ও ফিঁয়াসে-র বাবা-মা'র সঙ্গে বসে থাকতে দেখেছে।

লেফটানেন্টের সাজপোশাক ও জামার কলার ছিল নিখুঁত, পরিপাটি। হয়তো কাফেটেরিয়ার কোনও কোনও গেস্ট, ভুরু কুঁচকে একবার তার দিকে তাকিয়েই বুঝে নিয়েছিলেন, এই ভদ্রলোকটি আসলে কে। সবার সঙ্গে বসে, পারফেক্ট জেন্টেলম্যানের মতো ধূমায়িত কফির সঙ্গে, পরিচ্ছন্নভাবে, ধারালো ফর্ক দিয়ে এক দামি কেক কেটে কেটে খাচ্ছিলেন।

কিন্তু হায়, আমার পক্ষে আর রবিবারে কাফেটেরিয়াতে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি। কারণ আমি ফাদার গুসেভস্কিকে কথা দিয়েছিলাম যে, রবিবারে গির্জাতে গিয়ে, তাঁর প্রভাতকালীন প্রার্থনা অনুষ্ঠানে তাঁকে সাহায্য করব। সকাল সাতটার একটু পরেই, উজ্জ্বল লম্বা নেকটাইটি গলায় ঝুলিয়ে, মালকে খোশমেজাজে স্পোর্ট-হলে এসে হাজির হলেও, এই নিস্প্রাণ পুরনো হলের ঠান্ডা পরিবেশে কোনও পরিবর্তন আনতে পারল না। এরপরে সে যথারীতি হলের বাঁদিকে বসে তার প্রার্থনা সেরে ফেলল। আর খুব সম্ভবত, গতকালের তদন্ত কমিশনের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, সে সেন্ট ম্যারী চ্যাপেলের পাদ্রির কাছে গিয়ে, তার অপরাধ স্বীকার করার কাজটিও সেরে ফেলে। হয়তো বা, চ্যাপেলের পাদ্রি ফাদার ভিস্কের কানে ফিসফিস করে এই অপরাধ স্বীকার করার পিছনে কোনও কারণও থাকতে পারে।

গির্জার কর্মী গুসেভস্কি আমাকেও তাঁর অফিসে ডেকে, অনেকক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আর আমার এক ভাই, যে সেই সময়ে রাশিয়াতে যুদ্ধরত ছিল এবং যার কোনও খবর আমরাও অনেকদিন পাইনি, তার সম্বন্ধেও নানান প্রশ্ন করলেন।

গির্জাতে ব্যবহার্য বেশ কিছু সুতির জিনিসপত্র পরিস্কার ও ইস্ত্রি করার জন্যে তিনি আমাকে দু'বোতল ফলের রস উপহার দিলেন। কিন্তু এই বিশেষ উপহারটি দেওয়া সত্ত্বেও তিনি আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু কাজ আদায় করে উঠতে পারলেন না।

আমি গুসেভস্কির অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মালকে আমার আগেই সেখান থেকে চলে যায়, বোধহয় একটু আগে আগেই একটা ট্রাম ধরতে চেয়েছিল। আমি মাঞ্চ-হালে-স্কোয়ার থেকে নয় নম্বর ট্রাম ধরলাম, বন্ধু শ্যিলীং প্রায় চলন্ত অবস্থাতে সেই একই ট্রামে উঠল। ট্রামের মধ্যে হঠাৎ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আমরা আবার তিনজন, তবে কথাবার্তা হল একেবারে অন্য বিষয়ে।

হয়তো ট্রামের মধ্যে আমরা মজা করে, গুসেভস্কির দেওয়া মিষ্টি ফলের সিরাপের কিছুটা পান করে থাকব। ট্রামের বাইরে আমাদের পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে চলছিল বন্ধু হটন সোনটাগ। একটি মেয়েদের সাইকেলে, পিছনের ক্যারিয়ারে টুলা নামে মেয়েটিকে বসিয়ে, সে সাইকেলটি, তার পুরো শক্তি দিয়ে চালাচ্ছিল আর তার পিছনে দেখা যাচ্ছিল মেয়েটির লিকলিকে সরু ঝুলন্ত পা দুটি ও হাওয়ায় উড়তে থাকা তার লম্বা চুল।

আমাদের ট্রামটি সহজেই তাদের ওভারটেক করে সামনে এগিয়ে চলল। এরপরে, বিপরীত দিক থেকে একটা গাড়ি আসার জন্যে আমাদের ট্রামটি একটু থামলে, হটন সেই সুযোগে আমাদের ওভারটেক করে নিল। ট্রামটি পরের স্টপে থামলে, আমরা দেখতে পেলাম যে, সাইকেলটি একটি ওয়েস্টবক্সের ওপরে হেলান দিয়ে রেখে, তারা দু'জনে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। পরস্পরের হাত জড়াজড়ি করে তারা ভাই-বোন ধরনের কিছু একটা খেলা চালাচ্ছিল।

টুলার পোশাকের রং ছিল গাঢ় নীল, কিন্তু লম্বায় অত্যন্ত খাটো— শুধু নামমাত্রই পোশাক বলা যায়। আর তার সামনে হটন সাইকেলে করে বয়ে নিয়ে চলেছে গাদাখানেক বিছানার চাদর। আমরা বেশ কৌতূহলের সঙ্গে, টুলা-হটন ও বিছানার চাদর, এই তিনটির মধ্যে কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা, বিছানার চাদর জোগাড় করার কাজ মালকে ছাড়া আর কারই বা হতে পারে! এক তাজ্জব মানুষ মালকে!

টুলা একটু উত্তেজিত হয়ে, আঙুল দিয়ে ওই জিনিসগুলি দেখিয়ে, জানতে চাইল ওগুলি সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাবার কারণটা কী। আমাদের কাছ থেকে সে শুধু একটি ছোট্ট জবাব পেল, এ মালকে ছাড়া আর কে? ঠিকই এ মালকেই হবে!

আমি বা শ্যিলীং, আমাদের মধ্যে কেউ একজন, সাইকেলে বসা হটন সোনটাগ ও টুলা, এই দু'জনের শরীরের মাঝখানে একটি কাগজ ঢুকিয়ে দিলাম। কাগজটিতে বড় করে লেখা ছিল, মালকে, আমাদের গুরু মালকের পক্ষেই এরকম কাজ সম্ভব—

আমরা মালকের জন্যে অনেকবারই একটা জুতসই নাম খুঁজেছি, মাঝে মাঝে তাকে আমরা মুরগির সুপ কিংবা ঢেকুর তোলা মানুষ বলেও ডেকেছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে দেওয়া গুরু মালকে উপাধিটিই ভালভাবে টিকে গেল, অন্যগুলো নয়। আর এর পর থেকে যখনই আমরা গ্রেট মালকে বা গুরু মালকে শব্দ ব্যবহার করব, তখন বুঝে নিতে হবে যে, তা আমাদের মালকেকেই বোঝাচ্ছে।

এখন আমরা সবাই সুইমিং-পুলের সামনে। টুলা প্রথমে কাউন্টারে টিকিট কাটাতে গেল আর তারপরে লেডিস-ড্রেসিং-রুমে গিয়ে অন্য একটি স্নানের পোশাক কাঁধের সঙ্গে বেঁধে পরে নিল। বারান্দার আকারে তৈরি পুরুষদের স্নানের জায়গাটি থেকেই দেখা যাচ্ছে, সুন্দর হালকা মেঘে ঢাকা সমুদ্রের নীল জল। আবহাওয়া চমৎকার, জলের টেমপারেচার কুড়ি ডিগ্রির মতো। বেশি খোঁজাখুঁজি না করেই, আমরা তিনজন পরিষ্কার দেখতে পেলাম কে একজন বেশ দাপটের সঙ্গে, প্রচুর ঢেউ ও ফেনা সৃষ্টি করে, চিত-সাঁতার কেটে, সামনে জলে ডুবে থাকা জাহাজটির দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা ঠিক করলাম, আমাদের মধ্যে একজন তার পিছনে ধাওয়া করুক। কিন্তু যাবে কে? আমি ও শ্যিলীং ঠিক করলাম যে বন্ধু হটন যাক।

হটন রাজি হল না, সে চায় টুলার সঙ্গে ফ্যামিলি-বিচের নির্জন কোনও স্থানে, গরম বালির ওপরে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে আর টুলা চায় তার খোলা সরু পা দুটি দিয়ে বালির ওপরে নকশা কাটতে। শ্যিলীং-ও নারাজ। সে জানাল যে, তার ঠাকুমা তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে প্রচুর রোস্ট-করা মুরগির ঠ্যাং ও ডিম সিদ্ধ তাদের জন্য এনে দেন, আর সেই কারণে আজ সকালে তার ব্রেকফাস্টটি একটি ভুরিভোজ হয়ে দাঁড়ায়। সাঁতার কাটার ক্ষমতা এখন তার নেই বললেই হয়।

আমার মাথায় চট করে অজুহাত দেওয়ার মতো কিছু এল না। আমি নিজের হালকা ব্রেকফাস্টটি খুব ভোরেই সেরে ফেলেছি, কারণ সেটাই গির্জার অলিখিত নিয়ম। তাই জলে সাঁতার কাটার ক্ষমতা আমার ছিল না, তা বললে ভুল হয়। অন্য কারণটি হল, বন্ধুরা কেউই নয়, আমিই তো একা মালকেকে গ্রেট মালকে আখ্যা দিয়েছি।

তাই আমাকেই শেষ পর্যন্ত জলে নামতে হল। কোনও তাড়াহুড়ো না করে, আস্তে আস্তেই সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলাম। এদিকে টুলাও আমার সঙ্গে সাঁতার কাটতে চায়। ফ্যামিলি-বিচ ও লেডিস-বিচের মাঝ বরাবর অঞ্চলে, আমাদের মধ্যে প্রায় এক ঝগড়া বাধার উপক্রম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

টুলা তার ছোট্ট সাইজের ধূসর রঙের স্নানের পোশাক পরে, কিছুটা উত্তেজিতভাবে রেলিঙের ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার ছোট্ট স্তনগুলির কিছু অংশ, পায়ের ওপরের অংশের ইলাসটিক পোশাকের গভীর দাগ, আর দুটি পায়ের মাঝখানের এক সরু ফাটলের আভাস,— এ সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

টুলা তার বিস্ফারিত নাক ও খোলা পায়ের আঙুলগুলি দেখিয়ে, আমাকে রীতিমতো ধমকাতে শুরু করে দিল। টুলাকে নিরস্ত করার জন্যে হটন, তার কাছে গিয়ে, তার কানে ফিসফিস করে কিছু বলতে আরম্ভ করল। আমাদের ব্যাপারস্যাপার কিছুটা আঁচ করে, কয়েকটি কমবয়সি ছেলে সেখানে হাজির হল। তারা অবশ্যই ওস্তাদ সাঁতারু ছিল, আর হাবভাবে দেখাল যেন তারা টুলাকে সাঁতার কাটার ব্যাপারে সাহায্য করতে তৈরি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা তারা করল না, শুধু জানাল যে, তারা অন্য কোনও দিকে সাঁতার কাটতে চায়।

হটনের সঙ্গে তাদের কিছু কথা কাটাকাটি হল, আর শেষমেষ রাগের চোটে হটন ছেলেগুলোকে বলল, যে মালকের পেছন পেছন সাঁতার কাটবে, তার অণ্ডদুটি নিশ্চয়ই কাটা যাবে।

মাথাটা একটু ওপরে তুলে, একটা হালকা ডাইভ মেরে, একটি ছোট সেতুর তলা দিয়ে, সাঁতার কেটে সামনে এগিয়ে চললাম। শরীরের পজিশন একটু-আধটু ঘুরিয়ে, তাড়াহুড়ো না করে, আরামসে সাঁতার কাটতে থাকলাম।

এবার থেকে, কী সাঁতার কাটার সময়ে কী লেখার সময়েও, টুলার কথা ভাবতে চেষ্টা করতে থাকলাম । কারণ, সবসময়ে কেবলমাত্র মালকেকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে আমার আর তেমন ভাল লাগছিল না। সেই কারণে আমি আরাম করে বুক-সাঁতার কাটতে লাগলাম, এমনকী পরে লিখেও রাখলাম, আমি বুক-সাঁতার শুরু করে দিয়েছি, আমার আর চিন্তা ভাবনা নেই। আর শুধুমাত্র এই মনোভাব নিয়েই আমি টুলাকে ভালভাবে লক্ষ করতে পারলাম।

টুলা বসে আছে রেলিঙের ওপরে হেলান দিয়ে, খোলা হাড়গোড়ওলা শরীর, আরও লক্ষ করলাম যে, তাকে কেমন যেন ছোট্ট, দুর্বল ও পাগলাটে ধরনের দেখাচ্ছে। সে আমার কাছে সত্যিই এক দুশ্চিন্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সাঁতার কেটে আরও কিছুটা সামনে এগোনোর পর দেখা গেল যে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সে সেখানে আর নেই, কোথাও উধাও হয়ে গিয়েছে। এবারে আমি কিছু শক্তি দিয়ে, ধীরে সুস্থে বুক-সাঁতার কেটে, মালকের মুখোমুখি চলতে শুরু করলাম।

আমার কেন যেন মনে হল, আমি নিজে সাঁতার কাটছি না, জলই যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোনও এক অন্য জগতের দিকে। সে দিনটি ছিল আমাদের লম্বা গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হওয়ার আগের শেষ রবিবারটি—।

আর ঠিক এই সময়টিতে সারা বিশ্বে কত কী-না ঘটছিল: ক্রিম আইল্যান্ড দখল করে নিয়েছে নাতসিরা, নাতসি-জেনারেল রমেল দ্বিতীয়বার অভিযান আরম্ভ করে দিয়েছে উত্তর আফ্রিকার দিকে, আরও কত কী—।

যুদ্ধ চলছে— ইস্টারের ছুটির সময় থেকেই আমরা অপেক্ষারত ছিলাম একটি উঁচু ক্লাসে— বন্ধু এশ্য ও হটন স্বইচ্ছায় এয়ার-ফোর্সে ঢোকার জন্যে নাম লিখিয়েছে— তাদের পাঠানো হয়েছে কোনও এক উঁচু ইনফেন্ট্রি ডিভিশনে।

আমি দোনোমনো অবস্থায় রয়েছি,— ঠিক করে উঠতে পারছি না এয়ার-ফোর্সে ঢুকব কি ঢুকব না। আর মালকের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা, যুদ্ধে নাম লেখাল না, যথারীতি এক ব্যাতিক্রম হয়ে রইল। আমাদের বলল, তোমরা সব বুদ্ধু—। যদিও সে, আমাদের চাইতে এক বছর বয়স বেশি হওয়ায় মিলিটারিতে একটা ভাল পজিশন পেতে পারত।

কিন্তু কথায় বলে: যে মানুষ লেখাজোখা করে, তার তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয়—

শেষ শ'দুয়েক মিটারের মতো দূরত্ব, বেশ আস্তে আস্তে, ভালভাবে দম রেখে, বুক-সাঁতার কেটেই পার হয়ে গেলাম। জল থেকে উঠে দেখতে পেলাম, আমাদের মালকে তার প্রিয় জায়গায় অর্থাৎ পাইলট-হাউসের ছায়ার তলায় বসে। তার পায়ের হাঁটুদুটির ওপরেই অল্প রোদ এসে পড়েছে।

মাঝখানে, নিশ্চয়ই সে একবার জলের তলায় গিয়েছিল। কারণ একটা গ্রামাফোন রেকর্ডের কিছু ভাঙা টুকরো জলে ভাসতে দেখা গেল। তার কাজকর্মের ধরনটি ছিল সত্যিই অদ্ভুত— অর্থাৎ, সে ডুব মেরে ঢুকেছিল জাহাজের মধ্যে, হাতল ঘুরিয়ে দম দিয়েছিল তার গ্রামাফোন যন্ত্রটিতে, যন্ত্রের চাকতির ওপরে লাগিয়েছিল একটি রেকর্ড— তারপরে ভিজে শরীরে ওপরে উঠে, ছায়াতে বসে শুনছিল রেকর্ডের বাজনা। আর যদিও ঠিক ওই সময়েই,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তার মাথার ওপরে শ'খানেকের মতো গাংচিল, তার গ্রামাফোনের বাজনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে, তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল।

এবার বিলম্ব না করে, আমাকে আর একবার চিত-সাঁতার কেটে, জলে ভেসে থেকে, আকাশে ভেসে চলা পুঁটলি-আকারের সারি সারি মেঘগুলি ভাল করে দেখতে হবে। এই মেঘের সারিগুলি, বেশ নিয়ম করেই পাশাপাশি জুড়ে থেকে, এক ধরনের আলোর রশ্মি ও শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে, আধো-জলে-ডোবা জাহাজটির ওপর দিয়ে পুব দিকে বইতে থাকল। বছর দুয়েক আগে, আমার সাহায্যে, আমাদের স্কুলের ফাদার অলবান ছাত্রদের আঁকা ছবির একটা প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। সেই প্রদর্শনীতে আমি ওই আলুর বস্তার মতো পুঁটলি-আকারের মেঘের ছবি দেখেছিলাম। তারপরে আজ আবার একবার সেই রকমের সুন্দর মেঘ আকাশে উড়ে যেতে দেখলাম।

নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কেন শুধু আমাকে যেতে হল? কেন হটনকে কিংবা শ্যিলীংকে নয়? আমি হয়তো অন্য কাউকে কিংবা হটনের সঙ্গে টুলাকে সাঁতার কাটতে বলে থাকব। আর সবাই একসঙ্গে, টুলাকে মাঝখানে নিয়ে, অথবা টুলার আত্মীয় যে ছেলেটি সেখানে ছিল, তাকে নিয়েও সাঁতার কাটতে পারত। কিন্তু তারা কেউই তা করল না। তাই আমাকে একাই সাঁতার কাটা আরম্ভ করতে হল। তবে শান্তভাবে, ধীরে সুস্থে সাঁতার কাটতে লাগলাম, আর আর বন্ধু শ্যিলীংকে বলে রাখলাম, আমার পিছনে আর কেউ যেন সাঁতার না কাটে।

আর আমি, যার ডাকনাম পিলেন্স, ছোটবেলায় যে কাজ করেছিল চার্চের সাহায্যকারী বালক হিসেবে, সেই সময়ে যে দেখেছিল ভবিষ্যতের অনেক অনেক সুন্দর স্বপ্ন, আর এখন যে চার্চের অফিসের এক ক্ষুদ্র কেরানি মাত্র, তার কি কিছু অভাবনীয় করার থাকতে পারে? কোনও জাদুকর এসে রঙিন কোনও কিছুই এনে দেয়নি জীবনে। তবুও আছি একরকম মন্দ নয়ঃ পড়ছি গনস্টিকার, হাইনরীখ্ বোয়েল, ফ্রেডরীখ্ হেয়ারের রচনা, সুন্দর প্রাচীন সেন্ট আগুস্টিনকে স্বীকৃতি দিচ্ছি, চায়ের টেবিলে আলোচনা চালাচ্ছি প্রায় সারা রাত ধরে, উত্তপ্ত কথাবার্তা চালাচ্ছি যিশুর জীবন, ওল্ড-নিউ টেস্টামেন্ট ও আরও অনেক ধর্মীয় বিষয় নিয়ে।

এবারে ফাদার আলবানের কথা— একজন দিলখোলা ও একটু ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। আমি তাঁকে মালকে ও তার নিজের সৃষ্টি করা জগতের কাহিনি শোনাতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
লাগলাম: কুমারি মাতা ম্যারী, মালকের পিসিমা, তার দীর্ঘ কণ্ঠনালি, তার তৈরি ঘন চিনির জল, তার পরিপাটি করে মাঝ-সিঁথের আঁচড়ানো চুল, তার গ্রামাফোন যন্ত্র, তার পেঁচা, তার স্ক্রুড্রাইভার, তার পিংপং বলের হার, তার বিড়াল-ইঁদুরের খেলা— আরও অনেক অনেক কিছু—। আরও শোনালাম, মালকে নিজে কীভাবে আয়েশ করে আরামে বিশ্রাম নেয় আর আমাকে পাঠায় কষ্টকর ডুব ও চিত-সাঁতার কাটার কাজে।

তাই বলি, মালকে যদি আমার বন্ধু হতে পারে, তবে ফাদার আলবানও কেন আমার বন্ধু হবেন না? আর আমিও বেশ বুঝে ফেললাম, যে গুণী মানুষটির সঙ্গে একসঙ্গে চলতে চলতে কথাবার্তা বলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

যদি মালকে একবার শুধু বলত, এগুলি সব করে ফেল। তা হলে আমি এগুলি ছাড়াও হয়তো আরও বেশি কিছু করতাম। কিন্তু সে তো কিছুই বলল না। আমি তার পিছনে পিছনে দৌড়োতে থাকলাম, আর তাকে প্রায় তার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে ধরলাম। এ কাজ আমি করেছিলাম, শুধুমাত্র তার সঙ্গ নিয়ে, মজা করে তার পাশাপাশি হেঁটে, স্কুলে যাওয়ার জন্যে।

মালকে যখন তার পিংপং বলের হারটি সবাইকে দেখিয়েছিল, তখন আমিই কিন্তু সর্বপ্রথম, তার ওই ফ্যাশানের জিনিসটির কদর বুঝে সেটি আমার গলায় ঝোলাই। এমনকী বাড়ির মধ্যেও প্রায়ই সেটিকে, একটি স্ক্রুড্রাইভারের সঙ্গে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখি।

ফাদার গুসেভস্কিকে সঙ্গে সাহায্যকারী বালক হিসেবে, গির্জার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমার কাজ করার কারণটাই ছিল, মালকে যাতে তার লম্বা গলা ও নলিটি কঠিন কর্মক্ষম রাখতে পারে।

এরপরে, বেয়াল্লিশ সালের ইস্টারের ছুটির শেষে, কোরাল সমুদ্রের ওপরে যখন বিমান-যুদ্ধ শুরু হয়, তখনই মালকে সর্বপ্রথম দাড়ি কামায়। আর আমিও, যদিও আমার দাড়ি কামানোর তেমন কোনও কারণ ছিল না, তথাপি আমিও গালে ক্ষুর চালিয়ে দিলাম।

যদি মালকে আমায় সময়মতো একটিবার বলত, যাও— ফিতেয় ঝোলানো মালাটি এখানে নিয়ে এসো। তবে আমি নিশ্চয়ই, পেরেকে ঝোলানো লাল-সাদা রঙের ফিতে দিয়ে মেডেল বাঁধা, পুরো হারটাই তার জন্যে নিয়ে আসতাম। কিন্তু সে তো কিছুই বলল না। অন্য দিকে, মালকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কিন্তু তার নিজের প্রিয় কাজগুলি করতে কোনও ভুল করত না। সব ঠিকঠাক করে যেত।

এখন সে ছায়ার তলায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে আর জলের তলায় ডুবে থাকা, তার প্রিয় গ্রামাফোন যন্ত্রটি থেকে ভেসে আসা অদ্ভুত বাজনার আওয়াজ শুনছে। তার মাথার ওপরে গাংচিলেরা ঝাঁক বেঁধে তারস্বরে চিৎকার করা শুরু করেছে, নোঙর বাঁধার জায়গায় পড়ে আছে দুটি নৌকো, সমুদ্রের জল কখনও শান্তভাবে কখনও ছোট ছোট ঢেউ নিয়ে বয়ে চলেছে, জলের ওপরে চলতে থাকা মেঘের ছায়াগুলি দেখাচ্ছে যেন দ্রুতগামী নৌকোর মতো, আর তার মাঝখানেই দোল খাচ্ছে একটি ছোট্ট জেলে নৌকো—, এহেন পরিবেশে শুনতে পেলাম, ডুবে থাকা জাহাজ থেকে আসা এক চাপা গর্জনের আওয়াজ। কখনও বুক-সাঁতার কখনও চিত-সাঁতার কেটে ধীরে ধীরে এগোতে থাকলাম। সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে চোখ রাখলাম। জাহাজের সারি সারি জানলার একেবারে পাশ দিয়ে চলতে থাকলাম। আর আমার হাত মরচে পড়া জাহাজ ছোঁয়ার আগেই, আমি তোমায় দেখতে পেলাম— মালকে, হ্যাঁ মালকে, তোমার দেখা পেলাম— যেমনভাবে দেখা পেয়ে আসছি গত বহু বছর ধরে।

তুমি কাটছ সাঁতার আর আমি জাহাজের মরচে ধরা হাতলটি ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

তুমি শুনছ তোমার গ্রামাফোন যন্ত্রটি থেকে ভেসে আসা গান, শুনছ বারবার বেজে যাওয়া কোনও গানের কোনও প্রিয় কলি।

গ্রামাফোন বেজে চলেছে একটানা, যতক্ষণ না তার দম ফুরোয়।

ওপরে যথারীতি উড়ে চলেছে পাখিরা।

আর এ সবের মাঝখানে শোভা পাচ্ছ তুমি তোমার পিংপং বলের হারটি গলায় ঝুলিয়ে। এই হল মালকে।

শোভা পাচ্ছিল বললে ভুল হবে— তারা সারা শরীরটি, মাথা থেকে পা পর্যন্ত অদ্ভুত আর হাস্যজনক দেখাচ্ছিল। তার পরনে ছিল না কিছুই, পুরোপুরি উলঙ্গ অবস্থায়, হাড়গোড়ওলা রোগা শরীরটি নিয়ে বসে আছে ছায়ার তলায়। সূর্যের তাপে ঝলসানো ত্বক, বালির ওপরে আধা ঘুমন্ত তার লম্বা লিঙ্গটি ও অণ্ডদুটি শুইয়ে রেখে, হাঁটু দিয়ে হাতদুটি চেপে ধরে বসে আছে মালকে। মাথার চুল বালিতে মেশা ঘোলা জলের সঙ্গে শক্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, মাথার মাঝখানের সিঁথিটি ঠিক বহাল আছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর তার মুখ— তার দীর্ঘ ঢ্যাঙা মুখটির নীচে, তার একটিমাত্র বসন— প্রায় এক হাত লম্বা বিরাট লবনচুস, পিং-পং বল ও মেডেলের তিনটি মালা ঝুলে আছে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত।

আর এই প্রথম লক্ষ করলাম যে, মালকে বিশেষ কায়দায়, তার সদা চলমান কণ্ঠনালীর ওজনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে, গলার মেটালের মেডেল ঝোলানো মালাটি একেবারে শান্ত করে রাখতে পেরেছে। আর সে নিজেও শান্তভাবে, চলাফেরা না করে, নির্বিঘ্নে সময় কাটাচ্ছে। কিন্তু এই শান্তি ও সমতার পিছনে একটি কাহিনি লুকিয়ে আছে।

কাহিনিটি হল, বহুকাল আগে, ১৮১৩ সালে এই মেডেলটি তৈরি করা হয়। সে সময়ে সোনা ও লোহার ওজনদর ছিল সমান। আর সেই সময়কার সুদক্ষ স্বর্ণকার, শ্যীঙ্কেল মশাই জানতেন কেমন করে লোহার জিনিস, শুধুমাত্র সুন্দর করে তৈরি করে, মানুষের চোখ ধাঁধানো যায়। পরে অবশ্য বার তিনেক মতো, ১৮৭১, ১৯১৮ এবং হালে এর ডিজাইনের কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়। তা সত্ত্বেও শ্যীঙ্কেলের তৈরি এই শিল্পকর্মটি কখনওই তার সৌন্দর্য হারায়নি। তবুও বলতে হয় যে, শ্যীঙ্কেলের এই শিল্পসৃষ্টিটি, কারও বুকে সুন্দর হারের মতো না ঝুলে, অবশেষে মালকের লম্বা গলায় এসে স্থান পেয়েছে।

মালকে আমাকে গর্বভরে জিজ্ঞেস করল:

এই পিলেন্স, আমার নতুন কবচটি তোর কেমন লাগছে বল দেখি? মন্দ নয় তাই তো?

দারুণ! আমি এটাকে একটু টাচ করতে পারি?

কিন্তু তার আগে তোকে স্বীকার করতে হবে যে, এটি এখন আমার সম্পত্তি, অন্য কারও নয়।

আমি আগেই জানতাম যে, তুই এটি কোথাও থেকে সরিয়ে এনেছিস, তাই না?

বিলকুল ভুল, এটা মোটেই কোথাও থেকে সাফাই করা নয়। আমি এটি পুরস্কার পেয়েছি, আমি গতকাল পাঁচ-পাঁচটা সাউদামটান-গ্রুপের যুদ্ধজাহাজ খতম করে ফেলি, আর তার সঙ্গে আরও কিছু—

আমরা একটু মজা করে, মেজাজ আনার জন্যে, পাগলামির ধরনে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
উলটোপালটা কথা বলা আরম্ভ করলাম। চড়া গলায় শুরু করে দিলাম কবিতা পাঠ উই আর সেলিং— কথা ভুলে গিয়ে জুড়ে দিলাম নিজের টেক্সট। এসব নতুন টেক্সটের মধ্যে কোনও যুদ্ধজাহাজ বা টরপেডোর কথা ছিল না, হতে পারে গুডরুন স্কুলের কোনও কোনও বিশেষ ছাত্রী বা শিক্ষিকার নাম ছিল।

আধা-ডোবা জাহাজটির ভিতর থেকে একটা চাপা খনখনে হালকা গর্জনের মতো আওয়াজ আসতে লাগল। গাংচিলেরা আকাশে ঘুরপাক খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, মাটিতে জমে থাকা তাদের পুরনো সাদা রঙের পায়খানাগুলি জমে হয়ে গেছে কঠিন, এদিক-ওদিকে আনাগোনা করছে কয়েকটি ছোট আকারের দ্রুতগামী নৌকো, মাথার ওপরের মেঘমুক্ত স্বচ্ছ নীল আকাশে বিচরণ করছে মেঘপুঞ্জ, এক অতি সুন্দর আবহাওয়া এসে হাজির—।

মালকের গলায় ঝোলানো জিনিসগুলি আবার নড়াচড়া আরম্ভ করে দিল। এই কারণে নয় যে, তার গলার নলিটি ওঠানামা করছিল, বরঞ্চ বলা যায় সে নিজেই সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। প্রবল উল্লাসে সে এই মেডেলওলা মালাটি খুলল তার গলা থেকে আর তারপরে এক মেয়েলি ভঙ্গিতে জাঙিয়ার মতো সেটিকে তার কোমরে বাঁধল।

অবশ্যই সে তার দু'পা, কাঁধ, বাঁকানো শরীর ও বিশেষ মুখভঙ্গি, এ সব কিছু দিয়ে, কোনও একটি মেয়েকে অভিনয় করে দেখাচ্ছিল। কিন্তু এটাও ঠিক যে, সে ওই বড় মেটালের মেডেলটি দিয়ে, তার লম্বা লিঙ্গ ও ওই স্থানের আর সব কিছুর শুধুমাত্র এক-তৃতীয়াংশ ঢাকা দিতে পেরেছিল।

মালকের এই সার্কাস দেখানোর ব্যাপারটিতে আমার বিরক্তি ধরল। আমি তাকে প্রশ্ন করে জানতে চাই যে, সে ওই মেডেলের হারটি নিজের জন্যে রাখতে চায় কি না। তাকে এও পরামর্শ দিলাম যে, যদি সে তা চায়, তবে সে জাহাজের নীচে, তার গ্রামাফোন যন্ত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে সেটি লুকিয়ে রাখতে পারে।

মালকে আমার এই পরামর্শ সম্ভবত শোনেনি, কারণ ওই সময়ে সে মাথায় অন্য কিছু একটা প্ল্যান ভাঁজছিল।

হয়তো ভালই হত, যদি সে ওই জিনিসটিকে জাহাজের মেঝেতে লুকিয়ে রাখত, কিংবা আমরা দু'জনে মিলে সেটি যদি ট্রান্সমিশান ঘরে কোথাও লুকিয়ে রাখতাম।

আর সবচাইতে ভাল হত, যদি মালকের সঙ্গে আমার কোনও বন্ধুত্বই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
না হত, যদি শুধুমাত্র সহপাঠী হিসেবে, ওপর ওপর একটা হালকা সম্পর্ক থাকত। তা হলে আমার এইসব লেখারও কোনও প্রয়োজন থাকত না, আর ফাদার আলবানকে বলতেও হত না, এটা কি আমার দোষ, যদি মালকে পরে কোনও সময়ে—?

কিন্তু আমাকে লিখতে হবেই আর লেখা শেষও করতে হবে। কারণ এ সবকিছু মনের মধ্যে বন্দি করে রাখা যায় না।

অথচ, নিত্যদিনের এই পরিবেশ— এই উড়ন্ত সাদা পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, এই মৃদুমন্দ বহমান শীতল হাওয়া, এই সোনালি রোদের বর্ণচ্ছটা, আকাশে উড়তে থাকা গাংচিলদের এই বিরক্তিকর কনসার্ট,— এসব আমাকে কী আনন্দ দিতে পারে? কী উৎসাহ দিতে পারে?

আর ব্যাকরণের নিয়মগুলিই বা আমাকে কী শাস্তি দিতে পারে, যদি আমি বানান কিংবা পাংচুয়েশনে কিছু ভুল করি?— যাক এসব কথা।

তথাপি আমাকে বলতেই হবে যে, মালকে কিছুই করেনি। না রেখেছে তার সে জিনিসটি পোলিশ মেরিন জাহাজের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে, না ঝুলিয়েছে তার যন্ত্রটি কালো ম্যাডোনা ও মার্শাল পিলসুডস্কীর ছবির মাঝখানে। শুধু অর্ধমৃত গ্রামাফোনটির ওপরে সে ঝুলিয়ে রেখেছে তার কাপড়ের তৈরি পেঁচাটি।

আর আমি যখন আকাশে উড়ন্ত গাংচিলদের সংখ্যা গুনছিলাম, সেই সময়ে সে গলায় লবনচুসের মালা ও কুমারী মাতার মেডেলটি ঝুলিয়ে, বেশ গর্বিতভাবে, অল্প সময়ের জন্যে আবার জাহাজের সামনে এসে হাজির হল।

তারপরে, সে তার গলায় ঝুলন্ত জিনিসগুলি কোমরে স্নানের পোশাকের সঙ্গে বেঁধে, মোটামুটি দ্রুতগতিতে আমার সঙ্গে সাঁতার কেটে সুইমিং-বিচে আবার ফিরে এল। তারপরে হাতের মুঠোর মধ্যে কিছু একটা চুরি-করা জিনিস লুকিয়ে রেখে, আমাদের বন্ধু হটন, শ্যিলীং, টুলা ও আরও কয়েকজন ছেলেদের অতিক্রম করে, সে তার জেন্টস-কেবিনে গিয়ে জামাকাপড় পালটে ঝটপট বেরিয়ে পড়ল।

আমি অল্প কথায় টুলা ও অন্যদের জানালাম, মালকে পুরুষদের কেবিনে পোশাক পালটানোর জন্যে ঢোকার আগে কী সব করেছে। এরপরে আমিও তাড়াতাড়ি পোশাক পালটে নিয়ে, ন'নম্বর ট্রাম ধরে, সেখানে মালকেকে পাকড়াও করলাম। ট্রামে, পুরো সময় ধরে আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
করলাম, ওই চুরি-করা জিনিসটি লেফটানেন্ট কমান্ডারের বাড়ি নিজে গিয়ে, তাঁকে ফেরত দেওয়াই তার উচিত। আমার কিন্তু মনে হল না যে, সে আমার এই অনুরোধ আদৌ শুনল।

দিনটি ছিল একটি রবিবারের সকাল, আমরা ট্রাম স্টপেজে, ভিড়ের মধ্যে চেপটা হয়ে, ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। পরে ট্রামের মধ্যে, প্রতিটি স্টপের বিরতির সময়ে, মালকে তার দু'হাত বার করে, আমার ও তার জামার মাঝখানের জায়গায় কিছু একটা নাড়াচাড়া করে দেখাতে চাইল। আমি চোখ দুটি একটু নামিয়ে, মালকের হাতে-ধরা জিনিসটি দেখতে পেলাম। ফিতে দিয়ে বাঁধা, মেটালের তৈরি ভিজে যাওয়া সেই জিনিসটি দেখে বেশ একটু অবাক হলাম। মালকে এবার সেই মেটালের জিনিসটি ওপরে তুলে একটি আয়নার মতো তার মুখের সামনে ধরল।

বিপরীত দিক থেকে অন্য একটি ট্রাম আসায় আমাদের ট্রামটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, আর সেই সুযোগে আমি মালকের দিক থেকে চোখ সরিয়ে, বাইরের একটি প্রাচীন সেমিটারি ও তার পিছনের মিলিটারি এয়ারপোর্টের দিকে চোখ রাখলুম।

আমার ভাগ্যটাও ছিল ভাল, ঠিক সেই সময়েই এয়ারপোর্টের আকাশে একটি জেইউ ৫২ মার্কা বিমান ল্যান্ডিং করার জন্যে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করল আর আমাকে সেটি লক্ষ করতে ও মালকের ওপর থেকে পুরোপুরি চোখ সরিয়ে নিতে সাহায্য করল।

তবে, মনে হয় মালকের এই থিয়েটারটি, ভাগ্যক্রমে ট্রামের যাত্রীদের কারও চোখে পড়েনি।

সওয়ারি বোঝাই ট্রামটির মধ্যে হইহই কাণ্ড চলছিল। প্রায় সবাই সাঁতার ও স্নান সেরে ফিরছে। বাচ্চারা তাদের নানারকম স্নানের পোশাক দিয়ে ট্রামের বসার স্থানের ওপর-তলা সর্বত্র দখল করে নিয়েছে, দৌড়ঝাঁপ, ঠেলাঠেলি, লাফালাফি চলছে। বয়স্করা বিরক্ত হয়ে কথা কাটাকাটি করছে বাচ্চাদের সঙ্গে। সাঁতার কেটে ক্লান্ত হয়ে পড়া কিছু অপেক্ষাকৃত কমবয়সি বাচ্চা তারস্বরে কান্না জুড়েছে। ট্রামটির মধ্যে চলছে প্রায় এক যুদ্ধ। আর এই ভিড়ে ঠাসা যাত্রীদের টক ঘামের গন্ধটি এতই তীব্র ছিল যে, তা দিয়ে সহজেই ফোটানো দুধ থেকে ছানা কাটানো যেতে পারত।

অবশেষে, শেষ স্টপেজে আমরা ট্রাম থেকে নামলাম। মালকে কথা বলে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ও শরীরের অঙ্গভঙ্গি করে আমাকে জানিয়ে দিল যে, আমাদের প্রিনসিপাল ড. ক্লোশ্যেকে তাঁর দুপুরের বিশ্রামের সময়ে বিরক্ত করতে সে একটা প্ল্যান এঁটেছে। তাই আমার তার সঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, সে একাই সেখানে যেতে চায়।

ক্লোশ্যের থাকার জায়গাটি কাছেই ছিল ও আমরা চিনতাম। আমি একটি ভাঙাচোরা আস্তারপাস পেরিয়ে, আরও কিছুটা রাস্তা মালকের সঙ্গে গেলাম ও তারপরে তাকে একা যেতে দিতে তার সঙ্গ ছেড়ে দিলাম। সে কোনও তাড়াহুড়ো না করে, বাঁকাচোরা রাস্তা দিয়ে ধীরে সুস্থে হাঁটতে লাগল। তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও মুঠোর মধ্যে তার মালাটি ধরে ও মালার মেডেলটি দোলাতে দোলাতে সে ক্লোশ্যের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

তার মাথায় কেন এই বিদঘুটে প্ল্যানটি এল আর এটিকে কার্যকরী করারই বা ইচ্ছে কেন হল তা বলা শক্ত। তার চলার পথের দু'পাশে ছিল ঘন গাছপালায় ভরা অনেক ভিলা-বাড়ি। যদি সে একবার তার ওই গলায় ঝোলানো জিনিসটি কোনও গাছের ওপরে ছুড়ে দিত, তবে সেই সব ঘন গাছের ডালপালা ও পাতার মধ্যে সেটি গুপ্তধন হিসেবে লুকিয়ে থাকতে পারত।

পরের সোমবার মালকে স্কুলে অ্যাবসেন্ট হল। তার এই অ্যাবসেন্ট হওয়া নিয়ে ক্লাসের মধ্যে আলোচনার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। ডক্টর ব্রুনীস নিচ্ছিলেন জার্মান ক্লাস। পড়াতে পড়াতে, আগের মতো ছাত্রদের না বিলিয়েই, অভ্যাসমতো নিজেই সিবিঅন লবনচুস মুখে পুরে, চুষছিলেন।

তাঁর প্রিয় কবি আইশ্যেনডরফের বই না পড়া অবস্থায় রইল চোখের সামনে পড়ে। মিষ্টি লবনচুস ভরা মুখে ব্রুনীসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল তাঁর টেবিল থেকে। পড়তে থাকলেন তিনি অনেক কিছুই:

প্রথমে অকর্মণ্য মানুষদের ওপরে এক পৃষ্ঠার একটি রচনা, তারপরে কয়েকটি কবিতা, দুটি বলবান লোকের কাহিনি— "যে লোকের চোখ হরিণ দেখে, ভালবাসে সবকিছুই—" "যে সংগীত তন্দ্রা এনে দেয় সবার চোখে"— ইত্যাদি ইত্যাদি। মালকের সম্বন্ধে কোনওকিছু উচ্চবাচ্য না করে চুপচাপ রইলেন তিনি।

কয়েকদিন বাদে, পরের মঙ্গলবারে, ক্লোশ্যে সবার সামনে হাজির হলেন একটি মোটা ফাইল নিয়ে। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রধান শিক্ষক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ড. অ্যারডমান্ দুঃখের ভাব প্রকাশ করে হাত কচলাতে থাকলেন। এরপরে আমাদের সবার কানে ক্লোশ্যের শীতল কণ্ঠে বলা নির্মম কথাগুলি এসে পৌঁছল।

তিনি বললেন: এখন যুদ্ধের এই কঠিন সময়ে, যখন আমাদের সবাইকে একজোট হয়ে থাকা কর্তব্য, সেই সময়ে আমাদের এই স্কুলের মধ্যে ঘটেছে এক অভাবনীয় মর্যাদাহানিকর ঘটনা।

কোনও নাম উল্লেখ না করে তিনি আরও জানালেন, আর যে ছাত্রটি এই কাজের জন্যে দায়ী, তাকে ইতিমধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তবে এ খবরটি আপাতত পুলিশ বিভাগের জেলা ম্যাজিস্টেরে অফিসে না জানানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। স্কুলের ও সকলের স্বার্থে ছাত্রদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে, এই সিদ্ধান্তের খবর গোপন রেখে নীরবতা পালন করার জন্যে। কারণ শুধু এইভাবেই আমরা এই কলঙ্কজনক ঘটনাটির প্রভাব থেকে নিস্তার পেতে পারি। আর এই ইচ্ছাটি প্রকাশ করেছেন আমাদের স্কুলেরই একজন প্রাক্তন ছাত্র, আমাদের সবার সম্মাননীয়, সাবমেরিন বিভাগের কমান্ডার সাহেব।

মালকে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হল। তবে যেহেতু যুদ্ধকালীন সময়ে, কাউকে কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে পাকাপাকিভাবে বহিষ্কার করা আসলে বারণ ছিল, তাই তাকে এই অঞ্চলেরই অন্য একটি স্কুলে ভরতি করে দেওয়া হল।

নয়

যুদ্ধের আগে হরসট্ ভেসেল স্কুলটির নাম ছিল ক্রাউন প্রিন্স উইলিয়াম স্কুল, আর সেটি আমাদের এখানকার স্কুলের মতোই ধুলোবালি নোংরায় দুর্গন্ধময় ছিল। এই স্কুলটি শহরতলির পুব দিক বরাবর, একটি জঙ্গলের কাছাকাছি অঞ্চলে, ১৯১২ সালে নির্মাণ করা হয়। এই স্কুলটি দেখতে হয়তো আমাদের স্কুলের চাইতে আরেকটু সুন্দর ছিল, কিন্তু তা শুধু বাইরে বাইরেই।

আমার ও মালকের স্কুলের যাওয়ার রাস্তাদুটি কোনওখানেই একসঙ্গে মেলেনি। তাই, শরৎকালে স্কুল আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করার কোনও সুযোগ হয়ে ওঠেনি। পরে, লম্বা গ্রীষ্মের ছুটির সময়েও সে অনুপস্থিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
থাকল। মালকে বিহীন একটা লম্বা গরমের ছুটি! এ কথা ভাবাই যায় না!

অবশ্য এর একটা কারণও ছিল। সে টেলি-কমিউনিকেশনের একটা কোর্সে যোগ দেওয়ার জন্যে, মিলিটারি ট্রেনিং ক্যাম্পে নাম লিখিয়েছিল। সেই কারণে তার পক্ষেও আমাদের পরিচিত কোনও সি-বিচে, জামাকাপড় খুলে, গ্রীষ্মের রোদ পোয়ানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আর তাই তাকে সেন্ট ম্যারী চার্চে সাহায্যকারী হিসেবে পাওয়ার আশা করার কোনও অর্থ ছিল না। এই কারণে ফাদার গুসেভস্কি নিশ্চয়ই তাঁর একজন সেরা ও নির্ভরযোগ্য সাহায্যকারীকে হারালেন। তাঁর অপর এক হেলপার পিলেন্স দুঃখের সঙ্গে তাঁকে বলল, মালকেকে ছাড়া উপাসনা অনুষ্ঠানের কথা ভাবাই যায় না।

অগত্যা, মালকে ছাড়াই আমরা বাকি ক'জন, নিরুৎসাহিতভাবে, সাঁতার কেটে আধডোবা বজরাটির কাছে গিয়ে হাজির হলাম। বন্ধু হটন সোনটাগ নিরর্থক চেষ্টা চালাতে লাগল, জলে ডুবে থাকা বজরার তলায় গিয়ে, রেডিয়ো-কেবিনটিতে ঢোকার দরজা খুঁজে বার করতে। আর সেখানে সাঁতার কাটতে আসা অন্য কিছু ছেলে গুজব ছড়াল যে, জলের তলায়, বজরার ভেতরে, একটা সুন্দর ও অদ্ভুত ধরনের গোপন ঘর আছে।

এই খবর পেয়ে আমাদের বেকার নামে বন্ধুটি বেশ বারকয়েক ডুব মেরে, জলের তলার ওই ভৌতিক কামরাটিতে ঢোকার চেষ্টা করল। আর টুলার নিজের এক ভাগনি, একটি রোগা পটকা মেয়ে, বার দুয়েকের মতো সাঁতার কেটে বজরাটির কাছে গেলেও, ডুব মারেনি একবারও।

আমার এই মেয়েটির সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলতে ইচ্ছে হল। কেন জানি না, আমার তাকে একটু ভালও লেগে গিয়েছিল। কিন্তু টুলা তাকে বলে রেখেছে যে, তার সঙ্গে আগেই আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। অদ্ভুত কথা! টুলার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হলটা কবে? আসলে টুলা তার ভাগনিটিকেও, পচা দুর্গন্ধময় উলের সুতো দিয়ে, আমার মতোই ফাঁদে বেঁধে ফেলেছে।

টুলা সমুদ্রের বিচে, বালির ওপরেই দাঁড়িয়ে রইল, জলে নেমে কারও সঙ্গে সাঁতার কাটল না। হটনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ঘুচে গিয়েছে। আর আমি? আমি যদিও তাকে নিয়ে বার দুয়েক সিনেমায় যাই, তবুও আমার ভাগ্যে তেমন কিছু ঘটে ওঠেনি। এ ছাড়া, টুলা মেয়েটা সবসময়েই, যে-কোনও লোকের সঙ্গে সিনেমায় যেতে তৈরি ছিল।

লোকে শুনেছে যে, টুলা বেকারকে পছন্দ করে, আর তাই যদি হয়, তবে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তার এই ভাললাগার আপাতত কোনও অর্থ নেই। কারণ, বেকার ছেলেটি এই মুহূর্তে জলের তলায় গিয়ে মালকের নানান জিনিসে বোঝাই করা, ঘরটির প্রবেশ-পথটি খুঁজে বার করতে প্রাণপণে চেষ্টা করছে।

এইভাবে, লম্বা গরমের ছুটির শেষ পর্যন্ত, বেকারের জলে ডুব দিয়ে খোঁজাখুঁজির ব্যাপার নিয়ে অনেক সাফল্যের খবর ছড়াতে লাগল। তবে এ সব শুধু গুজবই, কোনও প্রমাণ ছিল না। সে না পেরেছে, একটা গ্রামাফোন যন্ত্র কিংবা একটা কাপড়ের তৈরি পেঁচা জলের তলা থেকে ওপরে তুলে আনতে। মালকের সঙ্গে তার তুলনাই করা যায় না!

কিন্তু, তা সত্ত্বেও গুজব ছড়াতেই থাকল, আর এসব ঘটনার প্রায় আড়াই বছর পরে, একটি কোনও অপরিচিত রহস্যময় দলকে, যাদের নেতা বেকার নামে কেউ একজন ছিল, অ্যারেস্ট করা হয়। সম্ভবত এরাই, এই বজরা-জাহাজটিকে কেন্দ্র করে আমাদের যাবতীয় কাহিনি, বিশেষ করে মালকের লুকোনো জিনিসপত্রের খবর বাইরে ফাঁস করে দেয়।

আমি প্রায় ওই সময় নাগাদ সৈন্যবিভাগের কাজে ঢুকে পড়েছি। এ সব খবর, যা-কিছু জানতে পেরেছি, তা মাত্র দু'-এক লাইন লেখা চিঠি থেকেই। কারণ শ্রদ্ধেয় গুসেভস্কি মহাশয়, যুদ্ধের মধ্যে, ডাক ও তার বিভাগ যতদিন পর্যন্ত কাজ করেছিল, ততদিন তিনি আমাকে নিয়মিত খবরাখবর দিয়ে, আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠি লিখেছিলেন।

৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে, যখন রাশিয়ান সৈন্যরা এলবিং নামক অঞ্চলটি প্রায় দখল করে ফেলেছে, সেই সময়কার কোনও একটি চিঠিতে, পবিত্র যিশু-চার্চের মধ্যে, ফাদার ভিস্কে মহাশয়ের উপস্থিতিতে, একদল অসভ্য ছেলের লজ্জাজনক এক হামলার কথা এক চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

এই চিঠিতে বেকার নামের কোনও একটি যুবককে, শুধু তার পদবি দিয়েই উল্লেখ করা হয়। আমার কিন্তু এ ধারণা হয়েছে যে, এই আক্রমণকারী দলটি, একটি বছর তিনেকের শিশুকে, সৌভাগ্য আনয়নকারী হিসেবে লালিত পালিত করে। পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও, আর গোটা চিঠির বান্ডিলটি হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও, আমি আমার স্মরণশক্তি থেকে বলতে পারি যে, গুসেভস্কির শেষ কিংবা তার আগের চিঠিতে, জলে ডোবা বজরা নৌকোটির সম্বন্ধেও কিছু লেখা ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর তা হল, বেয়াল্লিশ সালের গ্রীষ্মের অবকাশের প্রারম্ভে, এই বজরাটিকে কেন্দ্র করে অনেক আনন্দ-উৎসব পালিত হয়। আমার কাছে কিন্তু এই উৎসব আনন্দের ব্যাপারটি বিস্বাদ লেগেছিল, কারণ মালকে ছিল না। গ্রীষ্মের আনন্দ মালকে ছাড়া কি উপভোগ করা যায়!

তবে এটাও বলা ঠিক হবে না যে, মালকের অভাবে আমরা সবাই পুরোপুরি মুষড়ে পড়েছিলাম। আমি নিজেই তো, তাকে ছাড়া বেশ কিছুটা সুখেই ছিলাম। কারণ আমাকে সদাসর্বদা তার পেছনে পেছনে ঘুরতে হত না। এদিকে আমি কিন্তু চিন্তিত হয়ে ভাবছিলাম ছুটির শেষে স্কুল আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আমি মাননীয় গুসেভস্কিকে তাঁর উপাসনার কাজে সাহায্য করার জন্যে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করেছি কি না।

আমি যখন পূজার বেদিতে তাঁর পাশে বসে, বুরুশ দিয়ে তাঁর উপাসনার আলখাল্লাটি পরিষ্কার করছিলাম, তখন ভালই দেখা যাচ্ছিল, কীভাবে তাঁর হালকা চশমার ভিতরের চোখদুটিতে আনন্দ ও নিশ্চিন্ততার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। এই সময়েই কথাপ্রসঙ্গে, আমি তাঁর কাছে মালকে সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলাম। অতি শান্তভাবে, এক হাত দিয়ে তাঁর চশমাটি খুলে, বললেন, হাঁ মালকে, দলের মধ্যে সে ছিল আজ পর্যন্ত আমার সবচাইতে উৎসাহী ও নির্ভরযোগ্য সাহায্যকারী। আমার মনে হয়, এখন তাকে চার সপ্তাহের জন্যে, কোনও মিলিটারি ক্যাম্পে ট্রেনিং-এ পাঠানো হয়েছে। আর এ কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, কেবলমাত্র মালকের উপস্থিতিতেই তোমরা গির্জাতে এসে আমাকে সাহায্য করতে চাও। এ ব্যাপারে তুমি কী বলো, পিলেন্স?

এর ঠিক দু'সপ্তাহ আগে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে, আমার দাদা ক্লাউস, আর্মির একজন সারজেন্ট হিসেবে কর্মরত অবস্থায়, রাশিয়ার কুবান নামক অঞ্চলে মারা যায়। পরে গির্জার উপাসনা অনুষ্ঠানে আমি জানালাম যে, আমার ভাইয়ের মৃত্যুর কারণেই আমি গির্জাতে সাহায্যের কাজ আপাতত বন্ধ রাখতে চাই। শ্রদ্ধেয় গুসেভস্কি মহাশয় আমার মনের অবস্থা ভালভাবে উপলব্ধি করে এবং গির্জার প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্যে, আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

আমি এখন আর ঠিক মনে করতে পারছি না, আমার বন্ধু উইল্টার কিংবা হটন সোনটাগের মুখের আদল ও মাথার চুলগুলি ঠিক কেমন ছিল। তবে এটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভালই মনে আছে যে, গুসেভস্কির মাথাটি ঢেউ খেলানো ঘন কাঁচাপাকা চুলে ভরা ছিল। কিন্তু মাথার পিছনের চুলগুলি বেমানানভাবে, খুব ছোট করে ছাঁটা ছিল অনেকটা ন্যাড়া মাথার মতো। তাঁর মাথার চুল ও শরীর থেকে হেয়ার টনিক ও পালমলিভ সাবানের সুগন্ধ ভেসে আসত। মাঝে মাঝে তিনি, একটি বিশেষ ধরনের সিগারেট হোল্ডারের সাহায্যে, তুর্কি সিগারেটে ধরিয়ে, মজা করে টান মারতেন।

তিনি একজন আন্তরিক ও প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন। বয়সের বাছবিচার না করে, কোনও রকমের জড়তা না রেখে, গির্জার নবীন সহায়ক কর্মীদের সঙ্গে, অনায়াসে গল্প ও খেলা চালিয়ে যেতে পারতেন তিনি। সাদা রঙের সবকিছুই, গির্জাতে ব্যবহৃত সাদা কাপড় ইত্যাদি, তিনি ভালবাসতেন। এসব জিনিসগুলি কেচে ও ইস্ত্রি করে পাঠানোর ভার ছিল একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলার ওপরে, আর এই ভদ্রমহিলা কোনও কারণে না পারলে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে, ভার পড়ত আমার ওপরেই। এ ছাড়া তিনি নিজে, সুগন্ধি লাভেন্ডার পাউডার থলি হাতে নিয়ে, গির্জার প্রতিটি কাপড়ের জিনিস, যেমন, পরিধেয় জামাকাপড়, গাউন ইত্যাদি, তা সে আলমারির মধ্যেই থাক বা বাইরে ঝোলানো থাক, সেগুলির ওপরে বুলিয়ে দিতেন।

মনে পড়ে, আমার যখন বারো-তেরো বছরের মতো বয়স, সে সময়ে তিনি মাঝে মাঝে, তাঁর লোমহীন ছোট হাতটি, আমার শরীরের পিছন দিকে, ঘাড় থেকে প্যান্টের বোতাম পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিতেন। কিন্তু সেখানেই তাঁকে থামতে হত, তার তলায় নামতে পারতেন না। কারণ আমার প্যান্টে কোনও ইলাসটিক ছিল না, শুধু দড়ি। আমি ওই দড়িটি দিয়েই, সামনে গিট বেঁধে প্যান্টটি লাগিয়ে রাখতাম।

আমার শরীরে তাঁর এই হাত ঢোকানোর ব্যাপারটা নিয়ে আমি বেশি মাথা ঘামাইনি। তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ ও শিশুসুলভ মনোভাব আমার সহানুভূতি অর্জন করেছিল। আমি তাঁর সদাজাগ্রত দয়াশীল মনোভাবটি এখনও বেশ মনে করতে পারি, তাই মাঝেমধ্যে আমার গায়ে হাত বুলোনোর ব্যাপারের মধ্যে কোনও কিছু খারাপ ছিল না। হয়তো তিনি এইভাবে, আমার শরীরের ভিতরের ক্যাথলিক হৃদয়টি খোঁজার চেষ্টা করতেন।

সব মিলিয়ে তিনি আর দশজন পুরোহিতের মতোই একজন ছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
উন্নতমানের বইয়ে ভরা একটি পাঠাগার পরিচালনা করতেন। যদিও এই পাঠাগারে যাতায়াত করতেন শুধুমাত্র অল্পস্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা।

জীবনে বিশেষ বড় কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না গুসেভস্কি মহাশয়ের। বিশ্বাসের ব্যাপারটিও সীমার মধ্যে রেখেছিলেন। যেমন ধরা যাক, একই কণ্ঠস্বরে ও একই মাত্রায় তিনি, খ্রিস্টের শরীরের রক্তদানের কাহিনি কিংবা খেলার টেবিলে পিং-পং বলের চলাফেরা, ইত্যাদি বলে যেতে পারতেন।

যখন চল্লিশ সালের প্রথম দিকে, তিনি হঠাৎ তাঁর নাম পালটানোর জন্যে আবেদন করে বসলেন তখন আমার কাছে তাঁর এই ব্যাপারটি খুব অদ্ভুত লেগেছিল। তারপর বছর খানেকের মধ্যেই তাঁর নামটি পালটে, গুসেভস্কি হয়ে গেলেন গুসেভিং। লোকে তাঁকে তাঁর ওই নতুন নামেই, অর্থাৎ ফাদার গুসেভিং নামে ডাকতে শুরু করল।

সে সময়ে পোলিশ নামের জার্মানিকরণের ব্যাপারটি প্রায় এক ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ায়। বহু লোকই তাঁদের, কি অথবা কে যুক্ত পদবিগুলি রাতারাতি পালটে ফেলেন। যেমন, লেভানডোভস্কি হয়ে গেলেন লেনগ্রুইশ্য, আমাদের কসাইমশায় অলচেভস্কি হয়ে গেলেন ওকভাইন, ইত্যাদি। বন্ধু ইউরগেন কুপকা-র অভিভাবকরা চেয়েছিলেন কুপকা নামটি পালটে, পূর্ব-প্রুশীয়ান নাম কুপকাট নিতে, কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে তাঁদের আবেদন নাকচ হয়ে যায়।

এই পদ্ধতি অনুকরণ করে একজন সাউলোস হয়ে গেলেন পাউলোস। কোনও একজন গুসেভস্কি হতে চাইলেন গুসেভিং, কিন্তু ইয়াখিম মালকে তা না মঞ্জুর করায়, আমাদের কাছে রয়ে গেলেন তিনি গুসেভস্কি হিসেবেই।

এর পরে, দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের শেষে, যখন আমি গির্জার উপাসনার কাজে সাহায্য করছি, তখন হঠাৎ সেখানে দেখা পেলাম মালকের। আর ঠিক পরেই, ফাদার গুসেভস্কি যখন লোকজনের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের কাজে ব্যস্ত, তখন উপাসনার বেদির সামনের দ্বিতীয় বেঞ্চিতে, এক সম্পূর্ণ নতুন চেহারা নিয়ে সে বসে আছে। কিন্তু এর বেশ কিছুক্ষণ পরে পত্রপাঠ, সাক্ষাৎকার ও গসপেল ধর্মবাণী বলা ও গাওয়া শেষ হওয়ার পরেই, মালকের সাজপোশাকের পরিবর্তনের ব্যাপারটি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখার সময় পেলাম আমি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিনির জল দিয়ে মেশানো, মাথার মাঝখানের সিঁথিকাটা চুলগুলি ঠিক আগের মতো থাকলেও, লম্বায় হয়ে গিয়েছিল বেশ কয়েক ইঞ্চি দীর্ঘ। শক্ত হয়ে যাওয়া আঁচড়ানো চুলের ঢেউ, ছাদের কার্নিসের মতো, ঢাকা দিয়ে রেখেছিল তার কানদুটি। সে তার হাত দুটিকে, কনুই ভাঁজ না করে, সুন্দরভাবে ওপরে তুলে ধরে রেখেছিল। এই বিশেষ মুদ্রাটির সাহায্যে মালকে হয়তো সহজেই যিশুর ভূমিকায় অভিনয় করে পারত।

তার জোড়া হাতের নীচেই, দেখতে পাওয়া গেল তার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত পরিচিত দীর্ঘ গলাটি। জামার উঁচু খোলা কলারটি, অনেকটা কবি সীলারের জামার কায়দায়, ভাঁজ করে রাখা তার জ্যাকেটের কলারের ওপরে। তার গলাটি সত্যিই পুরো খালি, না ঝুলছে পিং-পং বল, রঙিন নেকটাই, কোনও মেডেলের মালা, স্ক্রুড্রাইভার অথবা অন্য কিছু যন্ত্রপাতি।

সারা ফাঁকা মাঠের মধ্যে, জন্তু বলতে ছিল একটিমাত্রই ইঁদুরই, আর সেটি হল মালকের গলার স্বরযন্ত্রের নীচে সদা চলমান কণ্ঠনালিটি। এটি দিয়েই সে একদা একটি বেড়ালকে হিপনোটাইস করেছিল আর আমাকেও সেই সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে, সেই বেড়ালটিকে, তার ওই গতিশীল নলিটির সামনে তুলে ধরে রাখতে। তাই তার চিবুক ও কণ্ঠনালির মাঝখানে, আজও বেশ কিছু বেড়ালের নখের আঁচড়ের দাগ দেখতে পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে, ঘণ্টা বাজিয়ে, গির্জার অনুষ্ঠান শুরু হতে চলল। তাড়াহুড়ো করা সত্ত্বেও, আমার সেখানে হাজির হতে একটু দেরিই হয়ে গেল। মালকেকে সামনের কমিউনিয়ন বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখা গেল, আর তার হাবভাবে অনুষ্ঠানের প্রতি তেমন কোনও আগ্রহ চোখে পড়ল না।

সে তার ভাঁজ করা হাতদুটি কণ্ঠা পর্যন্ত নামাল, তার পরে মুখ থেকে এমন দুর্গন্ধময় নিশ্বাস ছাড়তে লাগল, যাতে ধরে নেওয়া যায় যে, তার পাকস্থলীতে বোধহয় বেশ কয়েকদিন ধরে পচা বাঁধাকপি জমে ছিল।

এর পরে, উপাসনার শেষে, সে পবিত্র রুটির টুকরোটি মুখে পুরেই, শুরু করল এমন একটা কিছু করতে, যা আমার চোখে, একটি সম্পূর্ণ নতুন সাহসী কাজ হিসেবে দেখা দিল। সেটি হল, আগে সে বরাবরই প্রতিটি কমিউনিয়ন অনুষ্ঠানের শেষে, উঠে গিয়ে তার দ্বিতীয় সারির বাঁধা জায়গাটিতে বসত। কিন্তু এবারে সে তা না করে, অতি ধীরে ধীরে, একটি অন্য পথ ধরে, হলের নিস্তব্ধতা কিছুটা ভঙ্গ করে, প্রথমে কুমারী যিশু-মাতার মূর্তির সামনে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সেখানে না থেমে, সে গিয়ে হাজির হল উপাসনার বেদির সিঁড়ির সামনে। আর শেষপর্যন্ত পরিষ্কার পাথরের মেঝেতে না গিয়ে, একটি অপরিষ্কার কার্পেটের ওপরেই দু'হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ল।

ভাঁজ করা হাতদুটি সে এবার আস্তে আস্তে ওপরে তুলতে থাকল, প্রথমে চোখের সামনে, তারপরে সিঁথিকাটা চুল বরাবর। তারপরে আরও ওপরে তুলতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার শরীরটি, তার উলটোদিকে, একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি রুপোর থালার ওপরে দাঁড়ানো কুমারী মাতার দীর্ঘ মূর্তিটির সমান লম্বা হয়। এই মাতার মূর্তিটির কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীর প্রুশীয়ান নীল রঙের পোশাকে আবৃত ছিল, দীর্ঘ আঙুলের জোড়াকরা হাতদুটি বুকের ওপরে চেপে ধরে, ফ্যাকাসে চোখদুটি মেলে, একদৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন পুরনো জিমনাসটিক হলটির ছাদের দিকে।

এরপরে মালকে যখন ধীরে ধীরে তার হাঁটুদুটি ওপরে তুলে, হাতদুটি উন্মুক্ত করল, তখন কার্পেটের ওপরে পরিষ্কার দেখা গেল তার দুই হাঁটুর মালাই চাকির গভীর ছাপ।

এমনকী, আমি শ্রদ্ধেয় গুসেভস্কিকে কোনও প্রশ্ন না করেও বেশ বুঝতে পারলাম যে, মালকের এই নতুন হাবভাবের কিছু কিছু অংশ তিনি উৎসাহ সহকারেই লক্ষ করেছেন। এমনকী, নিজের ইচ্ছেতে তিনি মালকেকে কিছু সাহায্য করতেও চাইলেন। তাই, উপাসনা শেষ হওয়া মাত্রই তিনি সপ্রশংসভাবে মালকের গভীর ধর্মবিশ্বাসের সাহসী প্রচেষ্টাগুলির ওপরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন।

আর হ্যাঁ, তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে এও বললেন যে, অন্তরের কোন বিশেষ টানে মালকে উপাসনাতে যোগ দেয়, তা তাঁর জানা নেই— তবে কুমারী মাতার মূর্তির সামনে তার অভিনয়ের ব্যাপারটা কিছুটা পৌত্তলিক মূর্তিপূজার মতো হয়ে দাঁড়ায়!

মালকে, আমার জন্যে বাইরে যাওয়ার দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলাম, তাই তাকে এড়ানোর জন্যে, আমি প্রায় ফিরেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু তা হল না, সে দ্রুত এসে আমার হাতটা চেপে ধরল। আমার দিকে তাকিয়ে, এক প্রাণখোলা হাসি হেসে, যা আগে সে বড় একটা করেনি, একটানা কথা বলতে শুরু করে দিল।

মালকে, যে আগে কিছুটা লাজুক ধরনের ছিল, কথা বলত গতানুগতিক

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বিষয়ে যেমন আবহাওয়া, ঝড়বৃষ্টি, গরমের রোদ ইত্যাদি, সেই মালকেই এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্পষ্টভাবে, উঁচু গলায় বলতে আরম্ভ করল:

গির্জার কাজ আমি স্বইচ্ছাতেই, আমাকে নিয়ে এখানে যে সব কথা চলছে, তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তুই ভালভাবেই জানিস যে আমি কতটা অনিচ্ছায় আমার মিলিটারির কাজ করে চলেছি। মিলিটারি, যুদ্ধপরিকল্পনা, সৈন্যদের কাজকর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা— এসব আমার একেবারেই ভাল লাগে না।

একবার বল দেখি, কোন ধরনের কাজে আমার যোগ দেওয়া ঠিক ছিল? আমাকে লজ্জায় ফেলিসনি— এয়ারফোর্সে এখন আর তেমন কোনও কাজ নেই, প্যারাসুট বাহিনীতে কাজ? ভুল, পুরোপুরি ভুল। ভেবে দেখ একবার সাবমেরিনে কাজ নিলে কেমন হয়? হ্যাঁ, সেটাই শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র বিভাগ, যেখানে কিছুটা ভবিষ্যৎ আছে। যদিও এই সব ধরনের কাজই, মানুষকে ক্রমে ক্রমে একটা গাধা বানিয়ে দিতে পারে। এ সবকিছু বাদ দিয়ে, অর্থপূর্ণ কিছু, যা জীবনে আনন্দ কিংবা মজা আনে, এমন কিছু করতে। তুই তো জানিস, একদা আমি একজন ক্লাউন হতে চেয়েছিলাম। এ ছিল ছেলেবেলার স্বাভাবিক ইচ্ছে! তবুও, আমার আজও মনে হয় এই ইচ্ছেটি আদৌ মন্দ ছিল না। সেই সময়ে আরও কি কিছু পাগলামি করার ইচ্ছে আমার মাথায় আসেনি?

তোর কি সেই জিনিসটির কথা মনে পড়ে? আমার সেই লম্বা যন্ত্রটির কথা? কী বিপদেই না পড়েছিলাম আমি সেই সময়ে ওটি নিয়ে। আর অভ্যস্ত হয়ে উঠতে সময়ও লেগেছিল অনেকটা। প্রথমদিকে তো ভেবেছিলাম ওটা একটা রোগ, জানতাম না যে ওটা আসলে একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। পরে আমার বেশ কিছু লোকের সঙ্গে চেনাজানা হয়, যাদের শরীরে এইরকম জিনিস আছে, আর তারা এ নিয়ে কোনওমতেই দুঃখিত বা লজ্জিত নয়। আসলে সবকিছুর ঘটার সূত্রই ছিল ওই বিড়ালটি— তোর কি এখনও মনে পড়ে সেই দিনটার কথা, যেদিন আমরা সবাই শুয়ে ছিলাম পার্কের ঘাসের ওপরে। পাশেই চলছিল ভলিবল খেলার কম্পিটিশন। আমি শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম কিংবা দিবাস্বপ্নে বিভোর ছিলাম, ঠিক মনে নেই। মাথার ওপরে উড়ছিল একটা ছোট প্লেন। এমন সময়ে ধূসর কিংবা কালো রঙের একটা জন্তু, একটা ছোট বিড়াল, আমার গলা দেখেই মারল এক ঝাঁপ। তুই কিংবা শ্যিলীং, তোদের মধ্যে কেউ একজন, দু'হাতে তুলে ধরলি সেই জন্তুটিকে একটু ওপরে, আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তারপরে—। যাই হোক, এসব অনেকদিন আগেকার কথা। বজরার দিকে? না সেদিকে আমি যাইনি মোটেই। কে গিয়েছিল? বেকার? হতে পারে, সে সময়ে আমি তার নামই শুনিনি। আমি কি জলে আধা-ডোবা বজরাটিকে আদৌ জয় করেছিলাম? আমাদের কাছে এসে একবার দেখা করিস ভাই!

পুরো শরৎকালটা ধরে, মালকে আমাকে গির্জার এক বাঁধা হেলপারের কাছে জুড়ে দিয়েছিল। আমাকে সারা বড়দিনের ছুটিতে গির্জার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, কারণ গুসেভস্কি মহাশয়ের পক্ষে অন্য কোনও হেলপারকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এই সব কারণেই, মালকের বড়দিনের তৃতীয় রবিবারের নিমন্ত্রণটি আমি গ্রহণ করলাম। আসলে আমার ইচ্ছে ছিল, বড়দিনের প্রথম রবিবারটিতেই মালকের সঙ্গে দেখা করে তাকে কিছু উপহার দিয়ে আসি। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে বাতির সরবরাহ ঠিকমতো হত না। আর মালকেকেও গির্জার অনুষ্ঠানের জন্যে প্রয়োজনীয় বাতি জোগাড় করতে সপ্তাহখানেকের মতো অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সে আমাকে জিগ্যেস করল, তুই কি কয়েকটা বাতি জোগাড় করতে পারবি? গুসেভস্কি আমাকে একটাও বাতি দিতে চায় না। আমি বললাম, দেখি কী করতে পারি।

যুদ্ধের সময়ে, ওই বড় আকারের বাতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। যুদ্ধে আমার দাদার মৃত্যু হওয়ায় আমরা রেশন অফিস থেকে কিছু বিশেষ সুবিধে পেতাম। আমি পায়ে হেঁটে রেশন অফিসে গিয়ে, দাদার ডেথ সার্টিফিকেট দেখিয়ে, সেখান থেকে একটা কুপন জোগাড় করলাম। তার পরে, কুপনটি নিয়ে, ট্রামে চড়ে অলিভা অঞ্চলের ধর্মীয় জিনিসপত্রের বিশেষ দোকানে গিয়ে জানতে পারলাম যে, সেখানে বাতি সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। অবশেষে, এক সপ্তাহ অপেক্ষা করার পরে, সেই দোকানটিতে আর একবার গিয়ে, কুপনটি দেখিয়ে, সেখান থেকে কয়েকটি বাতি জোগাড় করা সম্ভব হল।

তাই বিলম্ব হলেও, শেষ পর্যন্ত মালকে এগুলি পাবে, যাতে সে গির্জাতে গিয়ে কুমারী মাতার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে, এগুলি জ্বালাতে পারে।

দ্বিতীয় অ্যাডভেন্টের রবিবারে, গির্জার মধ্যে, যেভাবে উপাসনার বেদির সামনে জ্বালানো বাতি সাজিয়ে রাখা হয়, সেরকম কোনওকিছু সেখানে আমার চোখে পড়ল না। অ্যাডভেন্টের নিয়ম মেনে, আমি এবং গুসেভস্কি, দু'জনেই যখন বেগুনি রঙের পোশাক পরেছিলাম, তখন মালকের গলায়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তার জামার সাদা রঙের বিরাট উঁচু কলারটি দেখা যাচ্ছিল। শরীরটি সে ঢেকে রেখেছিল, দুর্ঘটনায় নিহত কোনও এক মৃত ইঞ্জিন ড্রাইভারের মেরামত করা পুরনো এক ওভারকোট দিয়ে। বড় সেফটিপিন দিয়ে বাঁধা মাফলার ও বাবার ব্যবহৃত ওভারকোটটি দেখা গেল না তার শরীরে। এ হল তার আর এক নতুন রূপ!

মালকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অ্যাডভেন্টে, অর্থাৎ দুটি রবিবারেই গির্জাতে গিয়ে, অমসৃণ নোংরা কার্পেটের ওপর হাঁটুগেড়ে, জোড় হাতে সটাং হয়ে শুয়ে রইল। আমি তার এই কাজকর্ম দেখে বেশ অবাক হলাম। কারণ ওই সময়েই, কোনও এক বিকেলে তার বাড়িতে তার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা হয়েছিল।

আর, আমি যখন পূজার বেদির সামনে কিছু কাজ করছিলাম, তখন তার সাদা কাচের মতো চোখদুটি পিটপিট করে, জ্বলন্ত বাতির পিছনে দাঁড়ানো কুমারী মাতার মূর্তিটির মধ্যে থেকে কিছু খুঁজে বার করতে ব্যস্ত ছিল। দুটি হাতের আঙুলগুলি চেপে ধরে কপালের সামনে এনে, চিন্তা করার ভান করলেও, সে হাতের কোনও আঙুলই কপালে ঠেকাল না।

আমি ভাবলাম, আজই আমি তার কাছে যাব, হ্যাঁ আজই। তাকে ঠিকভাবে লক্ষ করব, তাকে পরীক্ষা করব! হ্যাঁ, ঠিক তাই করব। তা ছাড়া সে আমাকে এমনিতেই নিমন্ত্রণ করেছে। তার কাছে যাওয়ার বাধাটা কোথায়?

মালকেরা ওস্টারসাইলে নামক যে জায়গায় থাকত আসলে তা মোটেই দূরে ছিল না। পায়ে হেঁটে চললাম সেদিকে। চোখে পড়ল, পাশাপাশি দাঁড়ানো একই ধরনের কিছুটা জীর্ণ হয়ে যাওয়া বাড়ির সারি। বাড়িগুলির সামনের সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো দেওয়াল পুরনো হয়ে গিয়েছে, মাটিতে পড়ে আছে বেশ কিছু খালি ফুলের টব। বাড়িগুলির সামনের বেড়ায় লাগোয়া গাছগুলি ভরে গিয়েছে আগাছায়। বড় লিন্ডেন ফুলের গাছের বেশ কয়েকটি কাণ্ড ভেঙে গিয়েছে, অবশ্যই গাছটিকে কোনওভাবে সোজা করে দাঁড় করিয়ে বাঁচানো দরকার।

যদিও আমাদের অঞ্চলের, অর্থাৎ ওয়েস্টারসাইলের, বেড়া দিয়ে ঘেরা, বাগানওলা ছোট ছোট বাড়িগুলি দেখতে মোটামুটি একই ধরনের কিন্তু মালকেদের পাড়ায় এসে, সবকিছু দেখে, কেন জানি না, মনটা বড় মুষড়ে পড়ল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এমনকী এখনও, যদি আমি বাড়ি থেকে, কবরখানা ও ছোট বিমানবন্দরটির মাঝখান দিয়ে, স্টোকুম বা হোহাউসেন অঞ্চলে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখন রাস্তার দু'পাশে ওই কোয়ার্টার বাড়িগুলি চোখে পড়ে। পরপর পাশাপাশি দাঁড়ানো একই ধরনের বাড়িগুলি, তাদের একই রকমের বাগান ও গাছপালা দেখতে দেখতে বিরক্তি এসে যায়। তবুও এই ক্লান্তিকর রাস্তা ধরেই, মালকের মা ও পিসিমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হয়।

এর পরে কোনও এক সময়ে চোখে পড়ে মালকেদের বাড়ি। বাড়ির দরজা খোলার জন্যে যে বেলটি বাজাতে হয়, সেটি আঠা দিয়ে কোনওরকমে কাঠের দরজার সঙ্গে আঁটা। খুব সামান্য কোনও আঘাতেই, এই নড়বড়ে যন্ত্রটি যে কোনও সময়েই খুলে পড়ে যেতে পারে।

ভেতরে ঢুকে, কয়েক পা এগোতেই চোখে পড়ে, তুষারহীন, কিন্তু বেশ ঠান্ডা এক ছোট্ট বাগান। এক জায়গায় মোটা মোটা বান্ডিল বাঁধা কিছু শুকনো ফুলের তোড়া পড়ে রয়েছে। ফুলহীন ফুলের বাগানে, দেখা যাবে সামুদ্রিক শামুকের শুকনো খোলস দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। খরগোশের মতো বড় মাপের, পোড়া মাটির তৈরি একটি বেঙ, হয়তো লাফাতে লাফাতে, বাগানের মাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে, একটি ভাঙা নোংরা পাথরের ওপরে বসে আছে।

আর বাগানের মাঝখানের সরু রাস্তাটির উলটোদিকের ফুলবাগান বরাবর একটু এগিয়ে তিন ধাপের মতো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলে, চোখে পড়বে একটা গেরুয়া রং করা গোলাকার দরজা। দরজার সামনে, একটি চার-পাঁচ ফুট মতো উঁচু গাছের ডালে, একটি কাঠের তৈরি ছোট্ট বাড়ি ঝুলছে, যেখানে শীতের সময়ে পাখিরা এসে আশ্রয় নেয়, আর তাদের জন্যে পুঁটলির মধ্যে রাখা শস্যদানা খায়। বাগানের মধ্যে আর কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলে সহজেই বোঝা যাবে যে, এই সারা অঞ্চলটির মধ্যে বিরাজ করছে, শীত ঋতুর পরিষ্কার তাজা হাওয়ার গন্ধ ও এক সুন্দর শান্ত পরিবেশ।

আর যুদ্ধের বছরগুলিতে, আমাদের পরিচিত ওস্টারসাইলে, ওয়েস্টারসাইলে, বেয়ারেনভেগ, লাঙফুওর প্রভৃতি সব স্থানে, সারা পশ্চিম প্রুশিয়াতে তো বটেই, এমনকী বলা যায় সারা জার্মানিতে, বাগান থেকে পিঁয়াজের গন্ধ আসত আর রান্নাঘর থেকে পিঁয়াজকলি দিয়ে মাংস রান্নার গন্ধ পাওয়া যেত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

খুব বেশি চিন্তা না করে বলতে পারি যে, রান্নাঘর থেকে আসা গন্ধটি ছিল কড়া করে কষা তাজা পিয়াঁজের। অথচ সে সময়ে বাজারে পিঁয়াজের টানাটানি চলছিল। একদা যুদ্ধবাজ নাতসি মার্শাল গোয়েরিং, পিঁয়াজের আকাল নিয়ে রেডিয়োতে কিছু একটা মন্তব্য করে, আর তার ওই মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করে সেই সময়ে, সারা জার্মানির সর্বত্র রসিকতা চলতে থাকে। এই রসিকতার দুর্গন্ধও কিছু কম ছিল না। আর আমি যদি একবার আমার টাইপরাইটার মেশিনটা, পিঁয়াজের রস দিয়ে পরিষ্কার করতাম, তা হলে তার থেকে নিশ্চয়ই এমন এক কড়া গন্ধ বেরোত, যা হয়তো পচা মৃতদেহের গন্ধকেও ছাড়িয়ে যেতে পারত।

এবার বাগানে গিয়ে, সেই তিন ধাপের সিঁড়িটি একলাফে নেমে, সামনের দরজার হাতল ধরে যেই খুলতে যাব, ঠিক সেই সময়ে ভিতর থেকে দরজা খুলে হাজির হল মালকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেহারা। দেখে মনে হল, একটু আগেই সে মাঝখানে সিঁথি কেটে, তার চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়েছে। শক্ত হয়ে যাওয়া চুলগুলি, ঠিকভাবে ওপরদিকে টেনে, মাথার দু'পাশে সযত্নে আঁচড়ানো। কিন্তু এরপরে, তার লাল হয়ে যাওয়া লম্বা কানদুটি নিয়ে, ঘণ্টাখানেকের মতো সময় ধরে, একটানা কথা বলার পরে, তার সেই পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুলগুলি আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে।

আমরা বসেছিলাম বাড়ির পিছন দিকের বড় ড্রইংরুমে। বাইরের বারান্দাটির কাচের জানলা দিয়ে রোদ এসে ড্রইংরুমটি আলোকিত করে রেখেছিল।

খাবার জন্যে রান্নাঘরে তৈরি ছিল কেক। যুদ্ধের সময়কার কোনও এক প্রণালীতে তৈরি আলুর কেক। ককেটি থেকে বেরোনো ঝাঁঝাল গোলাপজলের গন্ধটি ছিল বেশ কড়া, যা মারচপানের গন্ধ মনে করিয়ে দিয়েছিল।

এর পরের পদটি ছিল আলুবোখরার চাটনি। আলুবোখরা ফলটি ছিল মালকেদের নিজের বাগানের গাছের, আর খেতেও হয়েছিল ভারী সুস্বাদু।

বারান্দার বাঁদিকের কাচের জানলা দিয়ে, শীতকালের পাতাবিহীন ফল ও ফুলের গাছগুলি ও কিছু কাঠের আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, শরৎকালে গাছের শুকনো হলুদ রঙের পাতাগুলি ঝরে পড়ে, সারা বাগানের মাটি ঢেকে ফেলেছে। আমার চেয়ারটাই বোধ করি আমাকে মনে করিয়ে দিল যে, আমি সারাক্ষণ বাগানের দিকেই তাকিয়ে আছি, আর মালকে আমার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঠিক উলটোদিকে বসে, আমার দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে।

আমার বাঁদিকে বসে ছিলেন মালকের পিসিমা, যেদিক থেকে আলো পড়ে তাঁর ধূসর চুলগুলি একটু ঝকমকে দেখাচ্ছিল। আর মালকের মা'র চেয়ারটি ছিল আমার ডানদিকে, যেদিকে আলো কিছুটা কম ছিল, আর তাঁর চুলগুলি চেপে আঁচড়ে রাখার ফলে মোটেই ঝকমক করছিল না।

যদিও ঘরটি হিটারের তাপে বেশ গরমই ছিল, তবুও বোধ হয় শীতের ঠান্ডা আলোতেই মালকের মা'র কান ও চুলগুলি কেমন যেন ঝাপসা দেখাচ্ছিল। আর মালকের জামার উঁচু বড় কলারের ওপরের অংশটি হয়ে উঠেছিল ঝকঝকে সাদা, আর নীচের অংশটি খয়েরি। মালকের দীর্ঘ গলার ওপরে আলো পড়েনি, পড়েছিল ছায়া।

এই বয়স্কা মহিলা দু'জন ছিলেন শক্ত হাড়ের গ্রামের মানুষ। গ্রামেই জন্ম গ্রামেই মানুষ। কথা বলছিলেন একনাগাড়ে উঁচু গলায়, আর হাত-পা নেড়ে। তাঁরা একসঙ্গে কথা বলেননি, কিন্তু যখন যা কিছু বলছিলেন, তা সবই মালকের দিকে তাকিয়ে। এমনকী তাঁরা যখন আমার কাছে আমার মায়ের শরীরের খবর জানতে চাইছিলেন, তখনও প্রশ্ন করছিলেন মালকেকে উদ্দেশ করে।

আমার সঙ্গে তাঁদের সবকিছু কথাবার্তাই হচ্ছিল ভায়া মালকে। বলা যেতে পারে, মালকের কাজ ছিল এক অনুবাদকের। আর্দ্র গলায় পিসিমা বললেন মালকেকে, এখন তোমার দাদা তো আর নেই, সে চলে গেছে। তাকে শুধু আমার চোখের দেখাই, কোনওদিন কোনও কথা আর বলা হয়ে ওঠেনি। কী সুন্দর আর সুপুরুষ ছিল সে। এমন ছেলেটি চলে গেল!

মালকে পিসিমার কথা শান্তভাবে আর খুব মন দিয়ে শুনল। কথাবার্তার বিষয় ক্রমে হয়ে উঠল খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে। যেমন, কেন আমার মা, গ্রিস থেকে সদ্য পাঠানো আমার বাবার চিঠিগুলি না পড়ে, অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন তাঁর বাড়ির মিলিটারি অতিথিদের নিয়ে। এই ধরনের আরও অনেক ব্যক্তিগত ঘটনার কথা—

মালকে আলোচনার প্রসঙ্গ একটু পালটে, তার পিসিমাকে বলল, পিসিমা, তুমি এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ো না। আর এখন, এই ভয়ংকর সময়ে, যখন কোনও কিছুই নিয়মমাফিক চলছে না, তখন কার পক্ষেই বা সম্ভব এই সব নিয়ে সঠিক বিচার করা। তা ছাড়া, এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করাটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তোমার দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে না। তবে হ্যাঁ, আজ বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই, এসব ঘটনাগুলি কোনও মতেই বরদাস্ত করতেন না, আর তোমাকে এইসব আলোচনা করার সুযোগও দিতেন না।

হয় এই দু'জন ভদ্রমহিলা মালকের কথা, কিংবা মৃত ইঞ্জিন ড্রাইভারটির কথা মেনে নিয়েছেন, নয় ওই ড্রাইভারটিকেও বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন, মা ও পিসিমা পরচর্চা বা গল্প শুরু করলে, কোনও কথা না বলে চুপচাপ থাকতে।

আর এই বৃদ্ধারা যখন যুদ্ধ নিয়ে গল্পগাছা করতেন, তখন প্রায়ই রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্র গুলিয়ে ফেলতেন। মালকের কিন্তু রেগে না গিয়ে, ধৈর্য ধরে ভদ্রমহিলাদের ভুল ভৌগোলিক চিন্তাকে শুধরে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। সে বলত, না না পিসিমা, তোমরা ভুল করছ, যে নৌযুদ্ধটির কথা তোমরা বলছ, সেটি ঘটে গুয়াডেলকানেলে, কারেলিয়াতে নয়।

পিসিমাই আলোচনার সুত্রটি ধরিয়ে দিলেন। আর আমরা অনুমান করতে করতে, খেই হারিয়ে ফেলে, ঠিক ধারণা করতে পারলাম না, কোন কোন ও কতগুলি আমেরিকান ও জাপানি বিমানবাহী জাহাজ গুয়াডেলকানেলের জলে নিমজ্জিত হয়।

এর পরে মালকে কিছুটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলল, ১৯৩৯ সালে তৈরি হরমেট ও ভাম্প নামে দুটি জাহাজ ও তার সঙ্গে রেনজার নামে আরও একটি বিমানবাহী জাহাজ, যেটি ওই সময়েই যুদ্ধে নামার জন্যে প্রস্তুত ছিল, সবক'টিই সম্ভবত জলে নিমজ্জিত হয়। এগুলি ছাড়াও সারাটোগা ও লেকসিংটন নামে দুটি জাহাজের একটি অথবা দুটিই ধ্বংস হয়ে যায়। এসবের সঙ্গে আরও যুক্ত হয়, আকাগি ও কাগা নামক দুটি বৃহৎ আকারের জাপানি বিমানবাহী জাহাজ, যাদের ভাগ্যে সঠিক কী ঘটেছিল, তা আমাদের অজানাই থেকে যায়।

তারপরে বেশ জোরের সঙ্গেই সে তার মত প্রকাশ করে বলল যে, ভবিষ্যতের নৌযুদ্ধে কেবলমাত্র বিমানবাহী জাহাজগুলিই আসল ভূমিকা নেওয়ার যোগ্য।

সে আরও বলল, এই সব বিরাট আকারের যুদ্ধজাহাজ ভবিষ্যতে তেমন কোনও কাজ করে উঠতে পারবে না, যা আসলে কাজ করতে পারবে, তা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হল, দ্রুতগামী ও ছোট আকারে বিমানবাহী জাহাজ।

তারপরে মালকে, এসব ঘটনাগুলির খুঁটিনাটি আরও বিস্তারিতভাবে বলতে থাকলে, দুই বৃদ্ধা মহিলা হতবাক হয়ে তা শুনলেন। আর যে মুহূর্তে, সে তার মুখ থেকে ইটালিয়ার এসপ্লোরাটোরি জাহাজটির নাম উচ্চারণ করল, ওই দুই মহিলা, আনন্দ ও উত্তেজনায় সজোরে হাততালি দিতে আরম্ভ করলেন। মালকের কথা শুনতে শুনতে, বেশ বিমূঢ় হয়ে, কমবয়সি মেয়েদের মতো চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চুল টানতে শুরু করে দিলেন।

মালকে তার হর্‌স্ট্ ভেসেল স্কুল সম্বন্ধে একটিও কথা বলল না। তার বদলে, আমি যখন বাড়ি ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছি, মালকে, তার লম্বা গলাটি নিয়ে, পুরনো দিনের নানা মজার কাহিনি শুরু করল। তার বেড়াল-ইঁদুরের জমাটি উপকথা শুনে মা ও পিসিমা হাসতে শুরু করে দিলেন। তার এখনকার বেড়ালের গল্পতে, সে আমাকে সরিয়ে, ইউরগেন কুপকাকে বসাল আমার জায়গায়, যা মোটেই সত্যি ছিল না। আমার জানতে ইচ্ছে করছিল, এই নতুন গল্পটি কোথা থেকে এল? আমার থেকে না তার থেকে? আর এ কাহিনি লিখছেটাই বা কে? আমি না সে?

আর যা কোনও বানানো গল্প ছিল না, যা ছিল সত্যি, তা হল, আমি সেখান থেকে চলে আসার আগে, মালকের মা কয়েক টুকরো আলুর কেক কাগজে প্যাক করে আমার হাতে দিলেন। বাড়ির করিডোরে, তার চিলকোঠার ঘরে ওঠার সিঁড়ির পাশের দেওয়ালে, একটি ঝুলন্ত ছবি মালকে আমাকে দেখাল। আড়াআড়িভাবে, বেশ সুন্দর ও যত্ন করে তোলা এই ফোটোগ্রাফটি ছিল একটি আধুনিক পোলিশ লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের। ছবিটির ওপরে, পোলিশ কমিউনিস্ট পার্টির নাম পি-কে-পি অক্ষরগুলি পরিষ্কার পড়া যাচ্ছিল, আর তা ছাড়া ইঞ্জিনের সামনে হাত ভাঁজ করে, সপ্রতিভ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা দুটি মানুষকে দেখা যাচ্ছিল।

আমাদের গ্রেট মালকে বলল, আমার বাবা ও তাঁর বন্ধু আবুডা, ১৯৩৪ সালের ঠিক আগেই, পোল্যান্ডের ডীরস্যাও নামক একটি স্থানে, এক দুর্ঘটনায় মারা যান। তবুও আমার বাবার পক্ষে শেষ পর্যন্ত অনেক কিছুই ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে কিছুটা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। সেই কারণে মিলিটারি কর্তৃপক্ষ, তাঁকে একটি সোনার মেডেল প্রদান করে, মরণোত্তর সম্মানে ভূষিত করেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দশ

নতুন বছরের আরম্ভেই বেহালা বাজানো শেখা শুরু করব মনস্থ করলাম। যুদ্ধে নিহত আমার দাদা বেহালা বাজনো শিখেছিল আর তার বেহালাটিও ছিল আমাদের ঘরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমরা যুক্ত হয়ে পড়লুম যুদ্ধে, এয়ার ফোর্সের কাজের সঙ্গে। আবার এও মনে হল, এত দেরিতে এই বাজনা শেখা শুরু করাটা হয়তো ঠিক হবে না।

ফাদার আলবান কিন্তু বরাবরই আমাকে বলে এসেছিলেন বেহালা শিখতে। এবং তিনিই আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন, বেড়াল ও ইঁদুরের কাহিনি লেখার জন্যে। আমাকে বলেছিলেন, খাতা কলম নিয়ে বোসো আর লেখা শুরু করে দাও। এ কথা ঠিক যে, তোমার প্রথম কবিতা ও গল্পগুলির মধ্যে সাহিত্যিক ফ্রান্স কাফকার প্রভাব গভীরভাবে পড়েছে। তা সত্ত্বেও, তোমার নিজস্ব একটা স্টাইল আছে। তাই অনুরোধ করি, বেহালা যদি না শিখতে চাও, তবে লেখা শুরু করো। ঈশ্বর ভুলে জাননি যে, তিনি তোমাকে একটা প্রতিভা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

এখন আমি: ব্রোসেন-গ্লেটকাউ নামক বিচ্ ব্যাটারি ও ট্রানিং ব্যাটারি সঙ্গে নিয়ে, সমুদ্রের সৈকতের ধারের পাথর ছড়ানো রাস্তাটি পেরিয়ে, কিছু কোয়ার্টার বাড়ির সামনে এলাম। এখানে, সমুদ্রের জলে পচে যাওয়া ঘাস ও গুল্মাদি, পড়ে থাকা পচা জামাকাপড়, মোজা, রং, আলকাতরা প্রভৃতি থেকে এক উৎকট দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল, যা আমার পক্ষে সহ্য করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

অথচ এই আমার মতো একজন সাধারণ এয়ারফোর্স হেলপারের রোজকার কর্মজীবনের, একটা বড়সড় তালিকা দেওয়া যায়— প্রতিদিন প্রত্যুষে, পরিপাটিভাবে ইউনিফর্ম পরে, সাদা চুলওলা বয়স্ক ট্রেনারের কাছ থেকে প্রথাগত ট্রেনিং নেওয়া,— আর বিকেলে, কামান ছোড়ার খুঁটিনাটি নিয়ম থেকে শুরু করে, বহুবিধ অন্যান্য অস্ত্র নিক্ষেপাদির গোপনীয় নিয়ম কানুন মুখস্থ করে শেখা— ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু এখন এই স্থানে, আমি নিজের সম্বন্ধে কিংবা সরল চরিত্রের মানুষ বন্ধু হটনের আর এমনকী অন্য বন্ধু শ্যিলীঙের গতানুগতিক জীবনের কাহিনি বর্ণনা করতে চাই না। তার বদলে, এখন শুধু মালকেরই কথা বলা দরকার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মালকে নামে মানুষটি কখনওই এয়ারফোর্স স্টাফ হয়ে উঠতে পারেনি। সে ছিল হরসট ভেসেল স্কুলের একজন সাধারণ ছাত্র, যে পরে অবশ্যই এয়ারফোর্স হেলপারের একটা ট্রেনিং নিয়েছিল। সে আমাদের বেড়াল ও ইঁদুরের কাহিনি সুসংগতভাবে বর্ণনা না করলেও, হাজির করল হঠাৎ অনেক কিছু নতুন সংবাদ:

বড়দিনের ছুটির ঠিক পরেই তাকে রাইখ্ লেবার সারভিসে কাজের জন্যে ডাকা হল। সে সেখান থেকে, যথাসময়েই একটি বিশেষ যুদ্ধকালীন ডিপ্লোমা নিয়ে গ্রাজুয়েট হল। অবশ্য এটা তার পক্ষে তেমন কিছু আহামরি ব্যাপার ছিল না। পড়া ও পরীক্ষা দেওয়ার কাজগুলি তার কাছে কোনও সময়েই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। এ ছাড়া বয়সেও সে ছিল আমাদের সবার চাইতে কিছুটা বড়।

খবর এল, যে ব্যাটেলিয়ানে তাকে কাজ করতে হবে, সেটি ইতিমধ্যেই টুখলার নামক এক প্রান্তরে পৌঁছে গিয়েছে। সেখানে গেরিলা যোদ্ধারা তৎপর হয়ে উঠেছে। কাজটি হয়তো গেরিলাদের নজরে রাখা থেকে শুরু করে জলে পচে যাওয়া ঘাস ও গুল্ম পরিষ্কার করারও হতে পারে।

ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ওলিভা অঞ্চলের এয়ারফোর্স হাসপাতালে বন্ধু এশ্যকে দেখতে গেলাম। কলারবোনে ফ্র্যাকচার হওয়ায় সে বিছানায় শয্যাগত। আমার কাছে সিগারেট চাইল, দিলাম তাকে কয়েকটা। বদলে সে আমাকে তিত লিকার অফার করল।

বেশিক্ষণ ছিলাম না। ফেরার পথে, ট্রাম স্টপেজ গ্লেটকাউ যাওয়ার সোজা রাস্তাটি না ধরে একটা অন্য পথ ধরলাম। ইচ্ছে হল, একবার দেখি স্লোসগারটেন অঞ্চলের সেই পুরনো ফিসফিস করে কথা বলার সুড়ঙ্গটি এখনও আছে কি না। গিয়ে দেখলাম সেটি সত্যিই আছে। হয়তো স্বাস্থ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণরত, আল্পস্ অঞ্চলের কিছু মানুষ, এই গুহার ফুটোওলা পাথরের দু'পাশে দাঁড়িয়ে, নিজেদের মধ্যে কথা বলে ও হেসে থাকবে।

ফিসফিস করে হেসে কথা বলার মতো কোনও মানুষ কিন্তু আমার জন্যে সেখানে ছিল না। তাই আমি অন্য কিছু ভাবতে ভাবতে, একটা শুকনো পাথুরে রাস্তা ধরলাম। সেই রাস্তাটি আমাকে গুহার অঞ্চলটি থেকে সরাসরি সোপর্ট হাইওয়ের দিকে নিয়ে আসল। রাস্তাটি প্রায় একটি সুড়ঙ্গের মতোই

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দেখতে ছিল, কারণ মাথার ওপরে, পথের দু'পাশের গাছের ডালপালাগুলি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে প্রায় একটি ছাদের সৃষ্টি করেছিল।

আর এই রাস্তাতেই দেখা পেলাম দু'জন নার্সের, যারা একজন অসুস্থ কিন্তু হাসিখুশি মুখের এক সামরিক কর্মচারীকে, হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

আর দেখা মিলল দু'জন ঠাকুমার বয়সি বৃদ্ধা মহিলার, যাঁরা একটি বছর তিনেকের ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। ছেলেটি ওই ঠাকুমাদের সঙ্গে একেবারেই যেতে চাইছে না। একটা ঢোলক গলায় ঝুলিয়ে, সেটি না বাজিয়ে, সে স্বাধীনভাবে একা হাঁটতে চায়। এদিকে আমার উলটো দিক থেকে, ধূসর কুয়াশা আস্তরণ ভেদ করে, একটা অন্য কিছু জিনিস ক্রমশ আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল: মালকে

এই হঠাৎ দেখা হওয়াটা, আমাদের দু'জনকেই কিছুটা অপ্রস্তুত করে ফেলল। মাদুলি, কাঁটা-চামচ, স্ক্রুড্রাইভার ছাড়া, এমনকী খোলা আকাশ ছাড়াই, এক বড় সাজানো পার্কে এই দেখা হওয়াটা, আমার কাছে একটা ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হল। এই রকোকো-স্টাইলের বড় বাগান-পার্কটির ফরাসি সৃষ্টিকারের ভাগ্যেই হয়তো, আমাদের আজকের এই দেখা হওয়াটা লেখা ছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত, এই ধরনের ফরাসি লে নরটে ঘরানার সাজানো বাগানে বেড়ানো আমি বন্ধ করে দিই।

অবশ্যই কথাবার্তা আরম্ভ করতে আমাদের বিলম্ব ঘটল না। কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টি শুধুমাত্র তার মাথায় লাগানো টুপিটির ওপরে নিবদ্ধ হল।

লেবার সার্ভিসের কর্মীদের ব্যাবহার করার এক বেঢপ বড় আকারের টুপি। মালকে বা আর যে-কেউ মাথায় পরুক না কেন, এটি আদতে ছিল একটি কুৎসিত জিনিস। মালকের চোখমুখ প্রায় ঢাকাই পড়ে গিয়েছিল এই কদর্য টুপিটিতে, আর এই টুপির রং? তা ছিল অনেকটা শুকিয়ে যাওয়া পায়খানার মতো ধূসর। সাধারণ নাগরিকদের টুপির মতো এটি মাঝখান বরাবর, ভাঁজ করা ছিল কিন্তু বাঁধার জন্যে বেল্টটি ছিল অত্যন্ত ছোট।

এই কারণেই বোধ হয়, লেবার সার্ভিসের কর্মীদের মাথা ঢাকা দেওয়ার এই সরঞ্জামটিকে হাতল লাগানো খোলা পোঁদ আখ্যা দেওয়া হয়। আর বিশেষত মালকের জন্যে, পুরো মাথা ঢাকা দেওয়ার ব্যাপারটি ছিল সত্যিই বেদনাদায়ক। লেবার সার্ভিসের হুকুম মানতে গিয়ে, তাকে তার সাধের আঁচড়ানো মাথার মাঝ সিঁথিটি, সবসময়ে ঢাকা দিয়েই রাখতে হত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর আমরা দু'জনে যখন গাছগাছালির মাঝখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, এমন সময়ে দেখা গেল সেই তিন বছরের ছেলেটিকে। একা, ঠাকুমাদের ছাড়াই, গলায় ঝোলানো ড্রামটি বাজাতে বাজাতেই হাসিমুখে আমাদের সামনে এসে, আমাদের মাঝখানে রেখে, একটি গোল চক্কর মেরে, তার ড্রামের আওয়াজ উঁচু পরদায় বজায় রেখে, সরু নিস্তব্ধ রাস্তাটি দিয়ে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালকে আমার কিছু প্রশ্নের ছোট ও দায়সারাভাবে উত্তর দেওয়ার পরে, আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমার প্রশ্নগুলি ছিল টুখলা অঞ্চলে যুদ্ধরত গেরিলাদের সম্বন্ধে, হেলথ সারভিসের খাওয়াদাওয়া নিয়ে। আমি আরও জানতে চেয়েছিলাম আমার লেবার সারভিসের প্রথম দিনের ডিউটিটা কোথায় পড়েছে, অলিভা অঞ্চলে সে এখন ঠিক কী কাজ করছে, ফাদার গুসেভস্কির সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয় কি না, ইত্যাদি।

মালকে জানত যে, গেরিলা যুদ্ধের কাহিনিটি অতিরঞ্জিতভাবে ছড়িয়ে পড়লেও তা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। তার কমান্ডার, কিছু স্পেয়ার পার্টস আনার কারণ দেখিয়ে তাকে দু'দিনের জন্যে অলিভা অঞ্চলে পাঠায়। কারণটি ছিল লোক দেখানো অফিসের কাজ! মালকে বললে, আজ সকালেই ফাদার গুসেভস্কির সঙ্গে, তাঁর প্রভাতকালীন উপাসনার শেষে, কথা বলেছি।

তারপরে, কিছুটা নিরুৎসাহ ও হতাশা প্রকাশ করে বললে: তাঁর স্বভাব একই রকম রয়ে গিয়েছে, যা ঘটবে তাই মেনে নেওয়া— এই ধরনের স্বভাব আর কী।

আমাদের দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকল, কারণ আমরা জোর কদমে হাঁটছিলাম। যদি বলি, তার দিকে আমি তাকাইনি, তবে তা ঠিক হবে না। আর যদি এবার বলি, মালকেও আমার দিকে মোটেই তাকায়নি। তা হলে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবে না।

বেশ কয়েকবার আমাকে পিছনে তাকাতে হয়েছিল, কারণ সেখানে কোনও মানুষই ছিল না, এমনকী সেই ছোট্ট ছেলেটি, তার ড্রামটি বাজাতে বাজাতে আমার কাছে এসে আমাকে সঙ্গ দেয়নি।

এর পরে, অবশেষে, তোমার দেখা মিলল, মালকে! ভাল করে হিসাব করলে দেখা যায়, পাক্কা এক বছর পরে! আর তোমাকে দেখেছি কিংবা দেখিনি, এ কথা বলারও কোনও যুক্তি নেই। তোমার বিদঘুটে ও ভয়াবহ অবয়বটি এখনও পর্যন্ত কারও পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এ ছাড়া হাতের সামনে রয়েছে প্রমাণ—

যদি কোনও সময়ে আমার চোখের সামনে একটা বেড়াল এসে পড়ত, তবে সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তা করতাম একটি ইঁদুরের কথা। কিছুটা দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে ভাবতাম, ইঁদুরকে রক্ষা করব না বেড়ালকে তাড়াব?

যাই হোক, এর পরে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত আমরা থেকে গেলাম সমুদ্রের তীরে ট্রেনিং সেন্টারে। প্রতিদিন বালির চরে চলতে থাকল ভলিবল খেলা। সাজগোজ করে সমুদ্রের তীরে নিয়মিত বেড়ানোর কাজটিও বাদ গেল না। সেখানে রোজ মুখোমুখি একই মেয়েদের কিংবা তাদের বোনেদের সঙ্গে দেখা হতে থাকল। আমার ভাগ্যে কিন্তু কিছুই জুটল না। দ্বিধা ও লজ্জা— এ দুটিই ছিল আমার আসল সমস্যা। এই দুর্বলতাটি এখনও আমার মধ্যে রয়ে গেছে আর তা আমাকে প্রায়ই উপহাস করে।

আর কী সব কাজ নিয়ে আমরা দিন কাটাতাম?

পিপারমেন্ট লজেন্স ভাগ করে মুখে পোরা, যৌনরোগের প্রতিকারের ওপরে বক্তৃতা শোনা, সকালে হ্যেরমান ও ডরোথিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, বিকেলে ৯৮-কে মেশিনগান নিয়ে প্র্যাকটিস করা, ইত্যাদি—ইত্যাদি—।

আমরা এমনকী, ডিউটির মাঝখানে সাঁতার কাটারও সুযোগ পেতাম। সাঁতার কেটে জাহাজ পর্যন্ত যাওয়ার সময়ে, নিয়মিত নতুন কিছু ছোঁড়াদের সঙ্গে মিলতে হত, যারা আমাদের বেশ বিরক্ত করত। সাঁতার শেষে, পাড়ে ফিরে এসে মনে মনে অবাক হয়ে ভাবতাম, পাখিদের বিষ্ঠা জমে থাকা এই নোংরা সমুদ্রের পাড়টি, গত তিন-তিনটি গ্রীষ্মকাল আমাদের কী এমন শক্তি দিয়ে আকর্ষণ করে রেখেছিল।

এর পরে, প্রথমে আমরা পেলোনকেন নামক একটি স্থানে ৮৮ মিলিমিটার কামান বিভাগে, আর তারপরে সিগানকেন অঞ্চলের একটি মিলিটারি বিভাগে বদলি হয়ে গেলাম।

এই সময়ে বেশ বারকয়েক, আমাদের মাথার ওপরে শত্রুবাহিনীর আক্রমণের অ্যালার্ম বেজে ওঠে, আমরাও একবার একটা চার-মোটরের বোমারু বিমানকে, গুলি মেরে ধ্বংস করে ফেলি। আর এই গুলি করার ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে, এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ওপরওলাদের মধ্যে অনেক বাদবিতণ্ডা হয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এরই মাঝে যথারীতি, রোজকার জীবনে, পিপারমেন্ট লবনচুস, হ্যেরমান, ডরোথিয়া, বহুবিধ শুভেচ্ছা বিনিময়, ইত্যাদি, আসা-যাওয়া করতে লাগল।

সমবয়েসি হলেও, ইচ্ছাকৃতভাবে যোগ দেওয়ার কারণে, বন্ধু হটন ও এশ্য, আমার আগেই এয়ারফোর্সে কাজ শুরু করতে পারে।

আমি মনস্থির করতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ায়, ভলেনটারি সারভিসে আবেদন করতে দেরি করে ফেলি আর সেই কারণে সে কাজটি হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, ক্লাসের অন্য কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে, যুদ্ধকালীন বিশেষ ফাইনাল পরীক্ষায় বসি এবং পাশ করে গ্রাজুয়েট সারটিফিকেট পেয়ে গেলাম।

এয়ারফোর্সের হেলপারের কাজ থেকে আমাকে বরখাস্ত করা হল। যত শীঘ্র সম্ভব, লেবার অফিস গিয়ে দেখা করার তলব পড়ল। কাজও পেয়ে গেলাম তখনই। এর পরে আমার হাতে ছিল পুরো দু'সপ্তাহ মতো সময়। ভাবতে থাকলাম, এই সময়টি অন্য কিছু কোর্স করে, কাজে লাগানো যায় কি না।

আমি একা। ভাবছিলাম কোথায় বা কার কাছে যাই। ষোলো-সতেরো বয়সি টুলা পোকরিফকে মেয়েটি মন্দ ছিল না, সবসময়ে সবার কাছেই যেতে রাজি। কিন্তু আমার ভাগ্যটা মোটেই ভাল ছিল না। অন্য দিকে বন্ধু হটন সোনটাগের বোনের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক কিছু এগিয়ে উঠতে পারিনি। এই রকম যখন মনের অবস্থা, তখন আমার এক ভাগনির পাঠানো একটি চিঠি আমাকে কিছুটা সাহস ও সান্ত্বনা দিল। চিঠিতে সংবাদ দিল যে, বোমারু বিমানের আক্রমণে তাদের শহরটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বাড়িঘর ছেড়ে, তাদের সবাইকে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে।

মনস্থ করলুম, কাজে যোগ দেওয়ার আগে, একবার মাননীয় গুসেভস্কির সঙ্গে দেখা করে আসি। দেখা করে পরে তাঁকে কথা দিলাম, ছুটি পেলেই, গির্জার উপাসনার কাজে তাঁকে সাহায্য করতে আসব। তাঁর কাছ থেকে গির্জার সাহায্যকারীদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করা, একটি সুন্দর ছোট ক্রশ উপহার পেলাম।

আর তারপরে, বাড়ি ফেরার পথে দেখা হল মালকের পিসির সঙ্গে। নাকে মোটা পাওয়ারের ঝুলন্ত চশমাওলা এই বয়স্কা মহিলাকে এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তাঁর কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি, গ্রামের ভাষায় দ্রুত কথা বলতে আরম্ভ করে দিলেন। পথচারীরা সামনে এলে, তিনি আমার কাঁধদুটি চেপে ধরে এমনভাবে কাছে টানতে থাকলেন যাতে, আমার একটি কান তাঁর মুখের কাছে গিয়ে পৌঁছল— এক অদ্ভুত ধরনের ভিজে ও গরম স্পর্শ। ফিসফিস করে উলটোপালটা অর্থহীন কিছু বলতে থাকলেন। যেমন, আমরা কিছুই পাচ্ছি না, এমনকী রেশনে যা পাওয়ার কথা, তাও নয়।

এই পিসিমার কাছ থেকে যুদ্ধের বাজারের কিছু খবর পাওয়া গেল। জানালেন যে পিঁয়াজ আর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু যবের ও বার্লির গুঁড়ো এখনও বাজারে আছে। মাংসর দোকানের মালিকেরা আশা করছে, টিনের কৌটোতে বন্দি করা কিছু মাংসের সাপ্লাই তারা পাবে।

এর পরে, আমার কোনও কথা কিছু না শুনেই, তিনি আসল প্রসঙ্গে এলেন। বললেন, আমাদের মালকে এখন ক্রমশ ঠিক দিকেই যাচ্ছে, যদিও সে তার চিঠিতে এ ব্যাপারে তেমন কিছু লেখে না। সে তার বাবার মতোই কখনও, কারও কাছে কিছু অভিযোগ অনুযোগ করেনি। তার বাবা সম্পর্কে ছিল আমাদের নিকট আত্মীয়। আর মিলিটারি এখন মালককে পাঠিয়েছে ট্যাংক ডিভিশনে, আমার মনে হয় এখনকার কাজটি ইনফেনট্রি ডিভিশনের চাইতে নিরাপদ, কমপক্ষে বৃষ্টিবাদলার দিনে মাথার ওপরে একটা ছাদ তো থাকবে।"

এর পরে পিসিমা, আমার কানে ফিসফিস করে মালকের নতুন কিছু অভ্যাসের কথা বললে, আমি জানতে পারলাম, মালকে কেন প্রতি চিঠিতে তার নামের নীচে ছোট ছোট ছবি আঁকত। তিনি আরও বললেন, মজার ব্যাপার হল এই যে, ছোট বয়সে সে মোটেই ছবি আঁকেনি, শুধুমাত্র স্কুলেতেই সে তুলি আর রং দিয়ে মাঝে মাঝে ছবি আঁকত। এই দেখো, তার শেষ চিঠিটা এখন আমার ব্যাগেই আছে। কী আর দেখাব তোমাকে! হায় ঈশ্বর, এ তো চিঠি নয়, দলা পাকানো একটা কাগজ—। তোমায় একটা কথা বলি ভাই, কত যে লোক আমার কাছে এসে মালকের খবর জানতে চায়, তার ইয়ত্তা নেই। আমি কি ছাই তার সমস্ত খবর জানি?

এই বলে পিসিমা, মালকের কয়েকটি চিঠি আমাকে দেখিয়ে বললেন, নাও, পড়ো একবার। আমি পড়লাম না, চিঠির কাগজ আঙুলের ফাঁকেই রয়ে গেল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ পুব দিক থেকে এল এক শুকনো ঝোড়ো হাওয়া, চরকির মতো বইতে থাকল চারিদিকে। কোনও কিছুই দু'আঙুলের মাঝে চেপে ধরে রাখা গেল না। মনে হল এই ঝড়, যেন তার বুট জুতোর হিল দিয়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করে ফেলতে চায়, ঘরের দরজা চুরমার করে ভেঙে ফেলতে চায়। মনে হল, আমার মাথার মধ্যে বহু মানুষ এসে কথা বলতে শুরু করেছে, কিন্তু কেউই একটুও কিছু লিখছে না। মাটিতে পড়ে আছে চিঠির পাতা, ধূসর বাদামি রঙের কাগজে। হাওয়ার সঙ্গে মিশে আছে হালকা পেঁজা বরফের দানা, তবুও মালকের হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

আজ হয়তো আমি বলতে পারি যে, আমি সমস্ত কিছুই ঠিক বুঝেছিলাম। শুধু না দেখা ও না জানার ভান করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম ওই চিঠিগুলির দিকে।

সত্যি কথা বলতে কী, ওই চিঠিগুলি আমার চোখের সামনে ধরার আগেই, পিসিমার কথা থেকে আমি বেশ বুঝে নিয়েছিলাম যে, মালকে আবার অ্যাকশানে নেমে পড়েছে। আর তার চিঠি ও আঁকা ছবিগুলি ছিল, পরিষ্কার হরফে লেখা ও রেখচিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

মালকে যেমন ভাবে এই ছবিগুলি এঁকেছিল, তা হল:

সে ছবি আঁকার জন্যে প্রথমে একটা সোজা করে লাইন টানতে বেশ পরিশ্রম করেছিল। কিন্তু তার কাগজটিতে রুল টানা না থাকায়, তার আঁকা লাইনটিও সোজা না হয়ে, বেঁকাচোরা ধরনের হয়ে যায়। তারপরে সে এঁকেছিল বারো-চোদ্দোটির মতো অসমান বৃত্ত, আর প্রত্যেকটি বৃত্তের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল একটি ছোট গোলাকার আঁকড়ি। প্রতিটি আঁকড়িতে আবার জুড়ে দেওয়া হয়েছিল একটি বয়লার, যা কাগজের বাঁদিক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। সব মিলিয়ে, এ চিত্রকে একটা যুদ্ধের ট্যাংক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। আর এ ছবিটি খারাপ ভাবে আঁকা সত্ত্বেও, আমার এটিকে একটি রাশিয়ান টি-৩৪ মার্কা ট্যাংক হিসেবে চিনে নিতে অসুবিধে হল না। এই সব ট্যাংকে, সব সময়েই বয়লার ও চুড়োর মাঝখানে একটা বিশেষ ক্রস-চিহ্ন থাকত, আর মালকে এ চিহ্নটিকেও এঁকেছিল। এ সবকিছু ছাড়া, এই ছবির শিল্পী, দর্শকদের এই ছবি ঠিকভাবে বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই সন্দেহ রেখেছিল। আর সেই কারণেই সে, চোদ্দোটি ট্যাংক আঁকা ছবিগুলি, মোটা নীল পেনসিল দিয়ে কেটে, বাতিল করে দিয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এসব দেখে, আমি একটু গর্বভরেই পিসিকে বললাম যে, মালকের আঁকা এই যুদ্ধের ট্যাংকটি নিশ্চয় সেইটাই, যেটি সে নিজে গুলি করে ধ্বংস করেছে। তিনি কিন্তু এই প্রশংসাবাণী শুনে মোটেই অবাক হলেন না, কারণ বহু লোকেই হয়তো তাঁকে এ কথা অনেকবার বলে থাকবে।

আর যে ব্যাপারটি উনি সত্যিই জানতে চান, তা হল, মালকের খবর নেওয়ার জন্যে তাঁর কাছে কেন, হয় খুব কম আর না হয় খুব বেশি লোক হাজির হয়? যেমন, মালকের আগের চিঠি আসার সময়ে এসেছিলেন আটজন আর এবারের চিঠিটি এলে, হাজির হলেন সাতাশজন।

এর পরে তিনি শান্তভাবে আমাকে বললেন, হতে পারে পোস্ট অফিসের চিঠি বিলি করার কাজটা আজকাল অনিয়মিতভাবে চলছে, আর তাই এসব ঘটছে। কিন্তু এখন তোমাকে ভাই পড়তে হবে, মালকে তার চিঠিতে কী সব লিখেছে। আলো জ্বালানোর বাতি জোগাড় করার ব্যাপারে, সে তোমার কথাও তার চিঠিতে লিখেছে। ভাগ্য ভাল যে, আমরা ইতিমধ্যেই কিছু বাতি জোগাড় করে ফেলেছি।

আমি দ্রুত তার চিঠিটির ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। বোঝা গেল যে, মালকে বাড়ির ব্যাপারে বেশ চিন্তিত আছে।

মালকের চিঠিটা তার মা ও পিসিমা, এই দু'জন মহিলাকে উদ্দেশ করে লেখা। সে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চেয়েছে, তাঁদের ছোট-বড় শারীরিক সমস্যার কথা, গায়ের শিরা ফুলে ওঠা কিংবা পিঠের ব্যথার কথা। এমনকী তাদের বাগানের কাজকর্ম কেমন চলছে, তাও সে জানতে চেয়েছে। চিঠিতে আরও লেখা: আমাদের কুলগাছে এবারে কেমন ফল ধরেছে? আমার ফণীমনসা গাছগুলি কেমন বাড়ছে?

নিজের কাজকর্ম সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে জানিয়েছে যে, তার এখনকার কাজ কষ্টকর ও দায়িত্বপূর্ণ। সে আরও লিখেছে, অবশ্যই ভুললে চলবে না যে, এই যুদ্ধে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ মোটেই কম নয়, তবে আশা করি, ঈশ্বর ও কুমারী মাতা নিশ্চয়ই আমার জীবন রক্ষা করবেন।

চিঠির শেষে মা ও পিসিমাকে বিনীত অনুরোধ জানিয়ে লিখেছে, তারা যেন দয়া করে, শ্রদ্ধেয় গুসেভস্কির কাছে, গির্জার উপাসনার জন্যে, একটি কিংবা সম্ভব হলে দুটি বাতি পাঠিয়ে দেন। হয়তো পিলেন্সও এগুলি জোগাড় করতে পারে, কারণ এসব জিনিস সস্তায় কেনার জন্যে তার কাছে কুপন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আছে। এ ছাড়াও ছিল তার আর একটি অনুরোধ— পরলোকগত পবিত্র পিতা সেন্ট জুডাস ঠাডেওস-এর স্মৃতির উদ্দেশে, গির্জাতে একটি পূজা-উপাসনার আয়োজন করতে আর বেদির ওপরে লিখে রাখতে: ঈশ্বরকে চিনে নেওয়ার পথটি খুঁজে পাবার আগেই, তিনি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন।

চিঠির সবশেষে অপরিষ্কারভাবে কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা রয়েছে। মালকে লিখেছে, তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না, আমাদের এখানকার অবস্থা এখন কী ভয়াবহ রকমের! ভাবতেও পারবে না, মানুষেরা কিংবা শিশুরাও কী এক অকল্পনীয় অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়তে পারে! মাথার ওপরে ছাদ নেই! বিদ্যুতের আলো নেই! পানীয় জল নেই! কেউ নেই— কিছুই নেই।

মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবতে থাকি, এই সব ঘটনা আসলে কেন ঘটছে? কার জন্যে? কীসের জন্যে? তারপরে আবার ভাবি, এসব হয়তো ভাগ্যেরই লিখন, এড়ানো যায় না কোনও মতেই!

পিসিমাকে বললাম, যদি তোমাদের কোনও সময়ে ইচ্ছে হয়, আর আবহাওয়া ভাল থাকে, তবে গরমের পোশাক পরে, ট্রেনে চেপে ব্রোএসেন বন্দর পর্যন্ত চলে যাও। বন্দরের প্রবেশমুখের কাছেই লক্ষ করে দেখো, সেখানে এক বিরাট আকারের আধ-ডুবন্ত জাহাজ দেখা যাচ্ছে কি না। এটি আগে ছিল একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ। খালি চোখে দেখলেই তা বোঝা যায়।

যদ্যপি, মালকের পিসির কানে লাগানো মোটা পাওয়ারের চশমা, জানতে ইচ্ছে করে চশমার কাচগুলি ঠিকমতো কাজ করে কি না।

যাই হোক, আমি তাঁকে আবার বললাম, তোমাদের সেখানে যাওয়ার আসলে তেমন কোনও প্রয়োজন নেই। নৌকোটি জলের ওপরে, নড়াচড়া না করে, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আর দাঁড়িয়েও থাকবে। আর হ্যাঁ, তুমি যদি মালককেকে আবার লেখো, তবে তাকে অবশ্যই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাবে। সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, এখানে চট করে তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটবে না, আর নৌকোটি এত সহজে কেউ চুরিও করে নেবে না।

আর যদি ওই ডকইয়ার্ডটি মেরামত করে পালটানো হয়, ওখান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, কিংবা আদৌ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাতে মালকের কী আসে যায়?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মালকে, তুমি তো দিব্যি কতবার নিজের চিঠির ওপরে, সুন্দর করে রাশিয়ান ট্যাংকের ছবি এঁকে সেটি আবার পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি কেটে নষ্ট করেছ। কিন্তু কখনও কি তুমি এই অভ্যাসটি পুরোপুরি ত্যাগ করতে চেষ্টা করেছ?

তুমি ছাড়া আর কে কুমারী মাতার ছবিটি নষ্ট করতে পারে? তুমি ছাড়া আর কে, আমাদের ওই সুন্দর স্কুলটিকে জাদুমন্ত্রে একটা নোংরা পাখির খাঁচায় পরিণত করে থাকবে? আর এর পরেও জানা দরকার, ওই বেড়াল ও ইঁদুরের ব্যাপারটা আসলে কী ছিল? তোমাকে নিয়ে এমন কোনও কাহিনি আছে কি, যার কোনওকালে সমাপ্তি হয়?

এগারো

মালকের জটিল আর হিজিবিজি অক্ষরে লেখা স্কুল-সারটিফিকেটগুলি দেখতে দেখতে ও সেই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আমার দু'-তিন দিনের মতো সময় চলে গেল। আর বাড়িতে, আমার মা এক বড় কোম্পানির কোনও এক সিভিল-ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে অতিথি-সেবায় ব্যস্ত। এ ছাড়া মা মাঝে মাঝে, পাকস্থলী নিয়ে অসুস্থ, স্টীয়েভে নামে একজন মিলিটারি অফিসারের জন্যে লবণ-ছাড়া খাবারদাবার তৈরি করতেন, যা তিনি খেতে খুব ভালবাসতেন।

এই দুই ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে বেশ স্বচ্ছন্দেই ঘোরাফেরা করতেন। আর এদের মধ্যে একজন, আমার মৃত পিতার স্মৃতি হিসেবে যত্ন করে রাখা চটি জুতাটি যথাযোগ্য সম্মান না দিয়ে, মজা করে পরে বেড়াতেন। সব মিলিয়ে এক ধরনের আরামদায়ক জমাটি পরিবেশ, যা কেবল ম্যাগাজিনের ছবির সঙ্গেই তুলনা করা যায়।

বাবার পরলোকগমনের কারণে, মা সবসময়ে কালো রঙের শোক-প্রকাশক পোশাক পরে থাকতেন, শুধু বাড়ির মধ্যে নয়, বাইরেও।

এ ছাড়া মা, ঘরের আলমারির ওপরে যুদ্ধে নিহত তাঁর সন্তান, আমার দাদার বেশ কয়েকটি স্মৃতিচিহ্ন যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছিলেন।

একটি বেশ বড় এনলার্জ করা পাসপোর্ট ছবি, মাথায় টুপি পরা না থাকলেও বোঝা যায় যে, এই সৈনিকটি একজন সাব-অফিসার ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কালো ফ্রেমে ছবির মতো করে বাঁধানো, দুটি সংবাদপত্র থেকে সংগ্রহ করা, মৃত্যুর বিবরণ ও সংবাদ।

কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা, আমাদেরকে লেখা, তার এক বান্ডিল চিঠি।

তার ছবির বাঁদিকে সাজিয়ে রাখা ছিল, এই সৈনিকটির যুদ্ধে অর্জন করা কিছু মেডেল।

এ সবের পাশে আরও ছিল তার একটি বেহালা বাজানোর ছড়, তার নিজের হাতে লেখা, নিজের কমপোজ করা, ভায়লিন বাজনার কিছু নোটেশন।

আজ আমি যদিও মাঝে মধ্যে আমার মৃত দাদা ক্লাইসের অভাব অনুভব করি, তবুও ওই সময়ে, তার সাজানো স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখে আমার হিংসাই হত। মনে মনে, বড় আকারের কালো ফ্রেমে বাঁধানো, নিজেরই একটা ছবি কল্পনা করে নিতাম। কিন্তু তবুও, ঘরের মধ্যে ওই জিনিসগুলির সামনে একা দাঁড়ালে, নিজেকে কেন জানি ছোট বলে মনে হত, আর রাগের চোটে আঙুল কামড়াতে শুরু করতাম।

হয়তো কোনও একদিন সকালে, মিলিটারি অফিসার স্টীয়েভে, যখন সোফাতে আরাম করে বসে তাঁর পাকস্থলী ম্যাসেজ করতে থাকতেন, আর মা রান্নাঘরে নুন-বিহীন খাবার তৈরি করায় ব্যস্ত আছেন, তখন হয়তো ঘুসি মেরে ওই সব ছবি, বেহালার ছড়— সব স্মৃতিচিহ্নগুলি ভেঙে চুরমার করেই ফেলতাম।

কিন্তু করা আর হয়ে উঠল না। এ সব কিছু ঘটার আগেই, আমার নিজেরই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার দিন এসে গেল। এই সংবাদটি, আমাদের কাছে হঠাৎ এমন কিছু চিন্তাভাবনা এনে দিল, যা ছিল বহুকাল ধরে মনে রাখার যোগ্য।— যুদ্ধে মৃত্যুবরণ— আহা, কী এক অভাবনীয় সুন্দর ব্যাপার—, মা মৃত দাদার স্মৃতিচিহ্নগুলির সামনে দাঁড়িয়ে, আর আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লিখছি চিঠি।

না, না— এসব ভাবনা-চিন্তা করার বদলে, আমি ঝটপট আমার চামড়ার সুটকেসটি প্যাক করে, ট্রেন ধরে, বেরনেট শহরের ওপর দিয়ে কোনিথ্‌স অঞ্চলে স্টেশনে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে, তিন মাসের মতো সময় পেয়ে গেলাম, টুখলার হাইডে নামক গাছগাছালি ও বালিতে ঢাকা এক বিশাল প্রান্তরের কাছে থেকে, সে অঞ্চলটিকে, ভাল করে বুঝে ও চিনে নেওয়ার জন্যে।

এ অঞ্চলটি ছিল সত্যিই ভারী আকর্ষণীয়, সব সময়ে ও সর্বত্র বইছে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বালি মেশানো ঝড়, চারিদিকে ছড়ানো-ছিটানো অনেক ধরনের জাম ও ছোট ফলের গাছ। পোকামাকড় সংগ্রহে উৎসাহী মানুষদের জন্যেও রয়েছে অনেক কিছু। আর যেদিকেই চোখ পড়ছে, দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট গুল্মের ঝাড়, যার মধ্যে লুকিয়ে আছে সুন্দর নানান ফুল বা ফল।

কিন্তু এখানে আমাদের যা করার জন্যে আসা, তা ছিল একেবারেই অন্য কিছু। কাজটি ছিল, মাটিতে পোঁতা দুটি কার্ডবোর্ড মানুষকে, মোটামুটি দূরত্ব বজায় রেখে, গুলি করার অনুশীলন।

তথাপি এই সারা অঞ্চলটিতে যে সারি সারি ভূর্জবৃক্ষের দল দাঁড়িয়ে আছে তাদের ওপরের অনন্ত আকাশ জুড়ে উড়ছে রংবেরঙের প্রজাপতির দল, ভেসে চলেছে পথ-হারানো মেঘের পুঞ্জ। আর রয়েছে কৃষ্ণবর্ণ জলে ভরা গোলাকার পুকুরগুলি, যেখানে মাছেরা এমনভাবে বিচরণ করছে যেন হাত দিয়েই তাদের ধরা যেতে পারে।

কিন্তু এইসব লতাগুল্ম গন্ধ, উড়ন্ত মেঘের সারি, জলে মাছের খেলা—এই সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে আসলে যা ঘটেছে, সংক্ষেপে তা হল: আমাদের আগে যে ব্যাটেলিয়ানটি এখানে ট্রেনিং নিয়েছিল, তারা রেখে গিয়েছিল বহু পতাকা দণ্ড, বালির বস্তা আর এমনকী পায়খানার ক্লোর মধ্যে জমা হয়েছিল পর্বতপ্রমাণ দুর্গন্ধময় আবর্জনা। এ কথাও বলা দরকার যে, বছর খানেক আগে, আমাদের কোনও বন্ধুরা, যেমন, উইল্টার, কুপকা, বানসেমার প্রভৃতি এখানে আসার আগে, মালকে এখানে এসেছিল আর তার নামটিও দেওয়ালে খোদাই করে এখানে লিখে রেখে গিয়েছিল।

পায়খানার ঢাকাটি ছিল খোলা, আর তারই ভিতরে অনেক কিছু আবর্জনার মধ্যে, একটি কাঠের ওপরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, কষ্ট করে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে লেখা, মালকের নামটি। কোনও ডাকনাম ছাড়াই দুই অক্ষরের একটি মাত্র শব্দ। আর তার ঠিক নীচেই ল্যাটীন ভাষায় লেখা তার কোনও প্রিয় কবিতার একটি কলি।

তাই এতদূরে এসেও, মালকের ভূত আমাকে মুক্তি দিচ্ছিল না। আর অনেক কষ্ট করে, আমি যখন সত্যিই আমার রাশিকৃত চিন্তা-ভাবনা সরিয়ে রেখে, নিজেকে একটু হালকা করার চেষ্টা করছিলাম, তখনও দেখি সে আমার শান্তি কেড়ে নিচ্ছে।

আমি ভালভাবেই জানতাম যে, কোনও সময়েই মালকের কোনও কৌতুক

আমার বই 2
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
করার ইচ্ছে ছিল না। কারণ, তা সে করতেও পারত না। মাঝেমধ্যে সে যদিও চেষ্টা করত একটু উপহাস বা কৌতুককর কিছু বলতে, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াত, এক ধরনের বড় বড় জাঁকজমক কথার বাগাড়ম্বর। মোদ্দা কথা হল যে, ওই অঞ্চলের পায়খানার মধ্যে, কাঠের ওপরে খোদাই করা তার নামটি থেকে গিয়েছিল।

পায়খানার পুরো দেওয়াল জুড়ে আরও অনেক কিছুই লেখা ছিল। যেমন, খাদ্য হজম করার উপদেশ, নিম্নরুচির গানের কিছু কিছু লাইন, যৌনসংযোগের ও মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কদর্য চিত্র ও আরও অনেক কিছু।

দেওয়ালের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত এত সব লেখা ও আঁকার মধ্যে, মালকের ছোট্ট কথা কয়টিই ছিল সবার সেরা। সে এত সুন্দর ও সঠিকভাবে কয়েকটি কোটেশন লিখেছিল, যা পড়ে মনেও হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত আমি একজন ধার্মিক খ্রিস্টান হয়ে, ধর্ম-ব্যাবসা নিয়ে দিন কাটিয়ে দিই। আর যদি সত্যিই তা করতাম, তা হলে:

আজ আমাকে এক সেবা প্রতিষ্ঠানে, সামান্য বেতনের কেরানি হিসেবে কাজ করতে হত না।

হয়তো ব্যস্ত থাকতে পারতাম, যিশুর জন্মস্থান নাথ্সাটের গণতন্ত্র আনা কিংবা ইউক্রেনে খ্রিস্টধর্ম চালু করার চিন্তা-ভাবনা নিয়ে।

অন্তত কমপক্ষে জানতে পারতাম, ফাদার আলবান মহাশয়ের সুদীর্ঘ তদন্ত কমিশনের শুনানিতে ধর্মকে অপমান বা সমালোচনা করার ব্যাপারটি কীভাবে ও কতটা স্থান পেয়েছিল।

হয়তো আমার পক্ষে কোনও কিছু একটা, সে যাই হোক না কেন, বিশ্বাস করতে শেখা সম্ভব হয়ে উঠত। যেমন যিশুর পুনরুত্থানের কাহিনিটি বিশ্বাস করে মেনে নেওয়া।

আর একদিন রান্নাঘরে, রান্নার জন্যে কাঠ কাটার সময়ে, মওকা বুঝে, আমি আমার কুঠারটি দিয়ে, মালকের লেখা কথাগুলি ও তার নাম কেটে সরিয়ে ফেললাম। সেটি ছিল, এক ভয় দেখানো নীতিশিক্ষার কথায় ভরা, প্রায় ভুলে যাওয়া, কোনও এক বস্তাপচা পুরনো কাহিনি। তার বদলে তাজা কাঠের ওপরে লেখা শব্দগুলি অনেক পরিষ্কার অর্থবহ। আর এ ছাড়া মালকের লেখা কথাগুলি, ইতিমধ্যেই মিলিটারি ব্যারাকের প্রতিটি ঘরে, রান্নাঘরে ও সব জায়গাতেই পৌঁছে গিয়েছে। আর রবিবারের অতিথিরা, যাঁরা কর্মহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে সেখানে আসতেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মালকের বাণীটি পড়ে ফেলেছেন।

সামান্য রদবদল থাকলেও, ঘরের মধ্যে পুরনো একই কাহিনিরই পুনরাবৃত্তি চলত। আর এই কাহিনিটি ছিল মালকে নামক একজনকে কেন্দ্র করে, যে আমাদের এই ব্যারাকে আসার আগেই, পাক্কা একটা বছর সুনামের সঙ্গে কাজ করে এবং অনেক কিছু ভাল পরিবর্তনও এনে দেয়।

দু'জন লরি ড্রাইভার, একজন পাচক ও একজন ঘর পরিষ্কার করার লোক— এইসব ব্যারাকের কর্মচারীরা প্রায় সারাক্ষণই সেখানে থাকতেন কাজ করার জন্যে। মালপত্রের ডেলিভারি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার ঘটত তাঁদের চোখের সামনে।

এঁরা সবাই একসঙ্গে, একমত হয়ে, ছাড়লেন মালকে সম্বন্ধে তাঁদের রসালো এই দীর্ঘ অভিমতটি: মালকে নামে বেখাপ্পা ছেলেটি যখন এখানে প্রথমে আসে, তখন তাকে কিম্ভূতকিমাকার দেখতে ছিল। মাথার চুল ইয়া লম্বা, নাপিতের কাছে যাওয়া প্রয়োজন ছিল, অবশ্য গেলেও যে তেমন কোনও লাভ হত তা না। কান দুটি ছিল সাপের মুখের মতো। আর তার গলা— শরীরের এক বেমানান অংশ— এক বিরাট অদ্ভুত লম্বাটে জিনিস।

এরপরে ঘর পরিষ্কার করার কমীটি, মালকের ওপরে সবচেয়ে আশ্চর্য ও চিত্তাকর্ষক ঘটনাটির বিবরণ দিলেন: একদিন আমি যখন গাড়িতে পাঠানো জিনিসপত্রগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্যে, ঝরনার জলের তলায় পাঠিয়ে, ঘরে ফিরে এসে যা দেখলাম তা নিজের চোখেই বিশ্বাস করা যায় না। মালকে দাঁড়িয়ে ও তার বিরাট লম্বা যৌনলিঙ্গটি খোলা— কোমরে জড়িয়ে নিলে লিঙ্গটি সহজেই একটা বেল্টের কাজ করতে পারে। তা দেখে কোন পুরুষেরই বা হিংসে হয় না বল? তাই চুপি চুপি তোদের বলি, যদি ওই যন্ত্রটি একবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তবে কী অসাধ্যই না সাধন করতে পারে!

আর চতুর মালকে করেওছিল তার দীর্ঘ লিঙ্গটির যথার্থ সদ্ব্যবহার। সে ওটির সাহায্য নিয়ে, জুতসই ভাবে ও মজাসে আরাম করে, ঘরের কাজে সাহায্যকারী চল্লিশ বছর বয়সের কমান্ডারের স্ত্রী, এক ডাগর রসালো ভদ্রমহিলাকে বিছানায় ফেলে, পিছন ও সামনে থেকে একটানা যৌনসংযোগ করেছিল। আর ভদ্রমহিলার মূর্খ স্বামীটি, সেই সময়ে বদলি হয়ে ফ্রান্সে কর্মরত ছিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর পরে অন্য এক কাজের, অফিসারদের কোয়ার্টারের সারির সামনের বাগানে, খরগোশ পোষার জন্যে কুঠরি তৈরি করার কাজের অর্ডার এল।

মালকেকে প্রশ্ন করলে সে এ কাজে যোগ দিতে প্রথমে অরাজি হলেও পরে, কাজে যোগ না দেওয়ার যুক্তি হিসেবে, কাজকর্ম সংক্রান্ত মিলিটারি আইনের কিছু কিছু অংশ শান্তভাবে আওড়াতে থাকল। কিন্তু এসব আইন আওড়ানো তাকে মোটেই সাহায্য করতে পারল না। কারণ চিফ নিজে এসে তাকে অ্যায়সা ধমকানি ও পেটানি দিল যে, তারপরে টানা দু'দিন ধরে তাকে বহুবার টয়লেটে গিয়ে বমি করতে হয়েছিল।

পরে আমি বাগানে কাজ করার জুতো পরে, মালকের থেকে একটা ভাল দূরত্ব রেখে এগোতে লাগলাম, কারণ অন্য ছেলেরা কাউকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মালকে তার একগুঁয়েমি ছেড়ে, কাঠের তক্তা ও যন্ত্রপাতির বাক্স নিয়ে কাজে নামল।

কাজটা ছিল কি শুধু খরগোশের আস্তানা তৈরি, না আরও অন্য কিছু? মালকে নিশ্চয়ই ওই চল্লিশ বছরের মহিলাকে নিয়মিত চুদে থাকবে। সপ্তাহখানেকেরও বেশি সময় ধরে ওই ভদ্রমহিলা মালকেকে বাগানের কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। আর মালকেও রোজ ভোরে ক্লান্ত শরীর নিয়ে কাজে আসতে লাগল। কিন্তু খরগোশের ঘর তৈরির কাজ মোটেই এগোলো না, তাই পুরো ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত চিফের হাতে গিয়ে পড়ল।

আমি ঠিক জানি না, আমাদের চিফ কখন ও কীভাবে, যৌনমিলনে রত অবস্থায়, ঘরের কোথাও, খাবার টেবিলের ওপরে বা নীচে কিংবা বিছানার চাদরের তলায়, মালকে ও ভদ্রমহিলাকে দেখে থাকবেন। নিশ্চিত যে তিনি তা দেখেছেন, কিন্তু এ নিয়ে ব্যারাকের কর্মীদের সঙ্গে তিনি একটিও কথা বলেননি। অবশ্য না বলার কারণ বোঝাও শক্ত নয়।

আর পরে আমাদের চিফ কিছু একটা কাজের ছুতোয়, যেমন মেশিনের স্পেয়ারপার্টস আনার জন্যে, মাঝেমাঝেই তাকে পাঠাতে লাগলেন দূরের কোনও অঞ্চলে। আসল উদ্দেশ্যটি ছিল, ব্যারাকের বাইরে পাঠিয়ে, ভেড়া ও তার খাদ্যকে, আলাদা করে ফেলা। কারণ চিফের বয়স্কা স্ত্রীকে নিশ্চয়ই মাথা ঘামাতে হয়েছিল, মালকের লিঙ্গের সাইজটি অনুমান করতে। লোকে এখনও ব্যারাকের অফিস থেকে গুজব শুনতে পায়, আর অফিস বিস্তৃত খবর পাওয়ার আশায় চিঠিপত্র লেখাও চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা হয়তো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শুধুমাত্র সেক্স কেন্দ্রিক ঘটনার চাইতে কিছু বেশি ছিল। আসল কাহিনিটি কেউ কোনওকালেই জানতে পারিনি।

পরে ওই একই মালকে, আমার নিজের চোখে দেখা, একবার তার এক হাতে একটা বড়সড় হাতবোমা ধরে, তাতে আগুন জ্বালিয়ে সেটি ফাটিয়ে দেয়।"

এর পরে আছে আরও একটা গল্প: আমরা একবার, কিছু ফিল্ড ট্রেনিং-এর কাজকর্ম নিয়ে বাইরে কোনও একটি জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক ছোট ছোট জলাশয় ছিল। এরকম একটি জলাশয়ের পাড়ে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখা গেল, আমাদের মালকে, একদৃষ্টিতে জলের তলায় কী যেন দেখার চেষ্টা করছে। হঠাৎ সে বলে উঠল, দেখ দেখ জলের তলায় মাছের মতো কী যেন নড়াচড়া করছে। আমাদের ক্যাপটেন ও আমরা সবাই হেসে ফেললাম। ক্যাপটেন বললেন, ওকে খুঁজতে দাও। কিন্তু আমরা তাকে কিছু বলার আগেই সে তাড়াতাড়ি তার প্যান্ট খুলে, পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এর পরে, পর পর চারবার পাঁকে ভরা জলে নেমে, মাত্র অর্ধেক মিটার জলের তলা থেকে সে খুঁজে আনল, যুদ্ধে ব্যবহার করার, একটি অতি আধুনিক অস্ত্র ভরে রাখার যন্ত্র। সে আরও খুঁজে বার করল, এই বড় আকারের বাক্সর, হাইড্রলিক-চালিত, দরজার ঢাকনাটি। এরপরে আমাদের সবার কাজ হল, সেই বিশাল জিনিসটি জলের তলা থেকে যেমন করে হোক ওপরে তুলে আনা। চিফের ব্যক্তিগত তদারকিতে, চার-চারটি ট্রাক ও পুরো ব্যাটেলিয়ানের কর্মীদের সাহায্য নিয়ে, অবশেষে সেটিকে ওপরে তুলে আনা সম্ভব হল।

এই সাফল্যের জন্যে, চিফ নিজেই হয়তো একটা মেডেলের দাবি করে বসতেন। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না কারণ, এই উদ্ধার করা ডাম্পটি যখন এখানে পাঠানো হয়, তখন আমাদের চিফ মিলিটারির সিভিল বিভাগে কাজ করতেন, ট্যাংকার ডিভিশনে নয়।

এ সবের শেষে, যখন মালকের সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু হল, তখন আমি ও আমার অন্য বন্ধুরা, যেমন, উইল্টার, কুপকা, বানসেমার, আমরা সবাই একটি কথাও না বলে চুপচাপ রইলাম। ফেরার পথে, অফিসারদের কোয়ার্টার পেরিয়ে, স্টোর-রুমের দিকে এগোতে এগোতে, আমরা চারজন কোনও কথা না বলে, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে, কিছু কাজের কথা সেরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ফেললাম। বাঁ দিকের দ্বিতীয় বাড়িটির সামনে, যেখানে খরগোশের ঘর তৈরি করার কথা ছিল, সেখানে আমাদের তেমন কিছু চোখে পড়ল না।

তার বদলে, নতুন কিছু আমাদের চোখে পড়ল: একটি বিড়াল, নরম সবুজ ঘাসের ওপরে বসে, আস্তে আস্তে চেষ্টা করছে, ঘাসের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে। এবারেও আমরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় করে কিছু বোঝাপড়া সেরে ফেললাম। যদিও আমার বন্ধুদের, বিশেষ করে বানসেমারের ওপরে আমি বিশেষ আস্থা রাখিনি, তবুও মনে হল আমরা যেন এক বিশ্বস্ত ছোট দল হয়ে গিয়েছি।

আমাদের কাজ শেষ হওয়ার চার সপ্তাহ মতো আগে, গুজব রটে গেল যে, গেরিলা যোদ্ধারা আমাদের অঞ্চলে তৎপর। আমাদের চব্বিশঘণ্টা সতর্ক থাকতে হল, জুতো ও পোশাক ছাড়া বাইরে যাওয়া নিষেধ হয়ে গেল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমরা কোনও গেরিলা যোদ্ধাকে ধরতে পারলাম না আর আমাদেরও কারও প্রাণ হারাল না।

এদিকে সেই কর্মীটি, যে মালকেকে দেখাশোনা করত ও তার পোশাক সরবরাহ করত, তার ড্রয়ার থেকে কাগজপত্র এনে, আমাদের কিছু নতুন সংবাদ পরিবেশন করতে আরম্ভ করল। সে বলতে থাকল,

প্রথম জিনিসটি হল, এককালীন কমান্ডারের স্ত্রীকে লেখা মালকের একটি চিঠি। এ চিঠিটি যথাসময়েই ফ্রান্সে কর্মরত তাঁর স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি: ওপরওলার কাছ থেকে পাঠানো এক জরুরি চিঠি, যা মালকের সম্বন্ধে নানান প্রশ্নে ভরা ছিল। চিঠিটি শেষ হয়নি, তার বক্তব্য নিয়ে তখনও আলোচনা চলছিল।

আর তৃতীয়টি: আমি আগে থেকেই জানতাম যে, এই সব ব্যাপারের সঙ্গে নিজে জড়িত। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে!

আগে, শুধু গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে, তা সে যতই অদ্ভুত দেখতে হোক না কেন, সে একজন অফিসার সাজতে পারত। কিন্তু এখন, যে কোনও শ্রেণির কর্মচারীই অফিসারের পদের জন্যে আবেদন করতে পারে। অত কমবয়সি ছেলে, এই সব নোংরা কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল!— তার এ সব কাহিনি নিজের কানে শোনাও কষ্টকর—।

এই সব শুনে আমরা আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, বাধ্য হয়ে মুখ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
খুললাম। বন্ধু উইল্টারও আমার সঙ্গে যোগ দিল, বাকি দু'জন বন্ধু কুপকা ও বানসেমার তাদের বক্তব্য তৈরি করতে থাকল।

আমি বললাম: আমাদের বন্ধু মালকেকে আমরা বহুকাল ধরে চিনি।

উইল্টার বলল: আমরা একেবারে স্কুলের সময় থেকেই একসঙ্গে আছি।

কুপকা বলল: মাত্র চোদ্দো বছর বয়স থেকেই সে তার গলার হারটি ঝুলিয়ে রাখতে আরম্ভ করে। এই ঝোলানো হারটি আমরা মজা করে দেখতাম।

বানসেমার বলল: হায় ঈশ্বর! মনে পড়ে, আমাদের লেফটানেন্ট সাহেবের হুকে ঝোলানো মেডেলটি সরিয়ে ফেলার কাজটি সেরে ফেলা হয় ঠিক এইভাবে—

আমি বাধা দিয়ে বললুম: থাম থাম, মালকের গ্রামাফোনের গল্পটাও একটু বলা দরকার।

উইনটার বলল: আর তার জলের তলা থেকে তুলে আনা খাবারের কৌটোগুলোর কাহিনি? সেটাও কি কম?

কুপকা বলল: আর প্রথম দিকে, সে কিন্তু শুধু একটা স্ক্রুড্রাইভারই গলায় ঝুলিয়ে রাখত।

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, জাস্ট এ মিনিট, তোমরা যদি একেবারেই প্রথম থেকে শুনতে চাও, তবে তোমাদের ফিরে যেতে হবে হাইমরীখ ভলিবল খেলার মাঠে, একটি বিশেষ দিনে। দিনটি ছিল এই রকম: আমরা সবাই খেলার মাঠের ঘাসের ওপরে শুয়ে আছি, মালকে ঘুমোচ্ছে। একটা ধূসর রঙের বেড়াল, আস্তে আস্তে মাঠটি পেরিয়ে, সোজা মালকের মুখের কাছে এসে হাজির হল। মালকের গলায় ওঠানামা করা নলিটি দেখে, বেড়ালটি সেটিও একটা ইঁদুর ভেবে, মারল ঝপাং করে এক মস্ত লাফ—

উইল্টার বলে উঠল: তুমি সব ভুলভাল বলছ পিলেন্স— বেড়ালটি ইঁদুরকে কামড়ায়নি, তুমিই তো বেড়ালটিকে ধরেছিলে মালকের গলার সামনে—"

যাই হোক, কিছু দিন পরে আমরা অফিশিয়াল কনফারমেশান পেলাম। সকালের প্যারেডের ঘণ্টাতেই এটি ঘোষণা করা হল:

আমাদের একজন সহকর্মী, যে প্রথমে ব্যাটেলিয়নের সাধারণ লেবার সারভিসের কাজ আরম্ভ করে আর পরে, নিজের ক্ষমতার জোরে, ধাপে ধাপে মেশিনগানার ও তারপরে ট্যাংক বিভাগের সারজেন্টের মতো উঁচু পদে ওঠে। এক বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ, যা তাকে, যুদ্ধের ফিল্ডের মধ্যে, বহু

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
রাশিয়ান ট্যাংকের সামনে দাঁড়িয়ে চালাতে হচ্ছে— তাকে আমরা সম্মান জানাই,— ইত্যাদি।

এর পরে ঘটল অন্য কিছু। আমাদের গ্রুপকে আবার বদলি করার জন্যে ডাক পড়ল। আমরা নিজেদের জামাকাপড়, ব্যাগ ইত্যাদি গোছাতে শুরু করে দিলাম। আর ঠিক এই সময়েই, মায়ের লেখা একটি চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছল। চিঠির মধ্যে ঢোকানো ছিল আমাদের অঞ্চলের কোনও সংবাদপত্রের একটি কাটিং। কাটিংটিতে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল:

আমাদের এই ছোট শহরের সুযোগ্য সন্তান, যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে রাশিয়ান ট্যাংক বাহিনীর বিরুদ্ধে। কাজ শুরু করেছিল একজন সাধারণ বন্দুকধারী সৈনিক হিসেবে, আর এখন হয়ে গিয়েছে একজন কমান্ডার— ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বারো

কাদামাটি, বালির চর, ঝিকমিক করা কালো গাছগাছালি, ছোট ছোট ঝোপঝাড়, উড়ন্ত পাইন গাছের ডালপালা, পুকুরের শান্ত জল, জলে বিচরণশীল মাছের ঝাঁক, গাছপালার ওপরে উড়ন্ত মেঘ, হ্যান্ড গ্রেনেড, ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা গেরিলা সৈন্য, ভ্রমণকারীদের আনাগোনা, টুশ্যেল অঞ্চলের সিনেমা হাউস— এ সবকিছু, এ সবকিছুই রয়ে গেল পিছনে পড়ে। আমি শুধুমাত্র আমার কার্ডবোর্ডের তৈরি সুটকেসটি ও এক বান্ডিল শুকনো ফুল ছাড়া আর কিছুই না নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পরে ট্রেনের মধ্যে বসে, জানলা দিয়ে ওই শুকনো ফুলের কিছুটা রেললাইনের বাইরে ফেলার সময়ে, বাইরে তাকিয়ে, হয়তো কিছুটা অহেতুকভাবে মালককে খুঁজলাম। আর ট্রেনে ওঠার আগেও সেনট্রাল স্টেশনে, টিকিট কাউন্টারের সামনের লম্বা মানুষের সারির মধ্যে, ভিড় করে অপেক্ষারত ছুটি কাটাতে যাওয়া সৈনিকদের মধ্যে, সর্বত্রই তাকে আমি খুঁজেছিলাম।

আর আমি নিজেই পরেছিলাম, এক বেঢপ আঁটোসাটো স্কুলছাত্রের পোশাক। নিজেকেই মনে হচ্ছিল এক বিদঘুটে মানুষ। মনে হচ্ছিল যেন সবাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আমার মনের অবস্থা টের পেয়েছে। বাড়ির দিকে আর গেলাম না। কীসের জন্যে যাব বাড়িতে? বাড়ি আমাকে কী দিতে পারে? ঠিক করে ফেললাম, আমাদের স্কুলের কাছাকাছি স্পোর্ট সেন্টারের স্টপেজে নেমে পড়ব।

নিশ্চিন্ত মনে, কোনও প্রশ্ন না করে, আমার সুটকেসটি কেয়ারটেকারের হাতে দিয়ে দিলাম। সামনের পাথরের সিঁড়িতে দ্রুত লাফ মেরে ওপরে উঠলাম। আশা ছিল এখানে অডিটোরিয়ামে তার দেখা পাব, সে আশা পূরণ হল না। অডিটোরিয়ামের দরজাগুলি সব খোলা। ঘর পরিষ্কার করার মহিলারা, চেয়ার টেবিল সরিয়ে পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত। কিন্তু কাদের জন্যে আদৌ এই পরিষ্কার করা?

এবারে আমি বাঁদিকে ঘুরলাম, বেশ কয়েকটি গ্রানিট পাথরের মজবুত থাম দাঁড়িয়ে। মাথা ঠান্ডা রাখার পক্ষে ভাল স্থান। আর দেখা গেল মার্বেল পাথরের একটি স্মৃতিফলক, ফলকটি বড় আকারের। এর ওপরে দুটি যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের নামের একটি তালিকা, আর তার তলায় রাখা হয়েছে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। দার্শনিক লেসিং-এর ছবি ঝুলছে তার নীচে। সমস্ত ঘরেই এখন ক্লাস চলছে পুরোদমে। ক্লাসরুমের মাঝখানের করিডোরটি বলতে গেলে প্রায় ফাঁকাই ছিল।

শুধুমাত্র একজন রোগা চেহারার কর্মচারী, হাতে একটা রোল করে পাকানো বড় ম্যাপ নিয়ে, সারা করিডোরের এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। ক্লাসঘর ৩এ-৩বি- ৩সি, ড্রইং করার হল আর তারপরের ক্লাসঘর ৩এ- ৩বি-৩সি, সর্বত্রই কাচের বক্সের মধ্যে বন্দি, কাপড় দিয়ে ঠাসা স্তন্যপায়ী জন্তুদের পুতুল। কিন্তু এগুলির মধ্যে আর কোন জিনিসটি লুকিয়ে ছিল? অবশ্যই একটি বিড়াল। আর তাই যদি হয়, তবে ছটফটে দুরন্ত ইঁদুরটি কোথায়?

আরও এগিয়ে, কনফারেন্স হলটি পিছনে ফেলে, করিডোরের শেষপ্রান্তে গেলে দেখা যাবে এক বিরাট ঝলমলে জানলা। এই জানলাটিকে পিছন করে, স্কুল ও প্রিন্সিপালের অফিস ঘরের মাঝখানে, গলার ইঁদুরটি না নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মালকে। ইঁদুরের বদলে গলায় ঝুলছে অনেক কিছু নতুন আকর্ষণীয় জিনিস, যেমন, একটি অপরিচিত ঝুলি, পিঁয়াজের বদলে একটি চুম্বক, প্রখ্যাত স্যাকরা শ্যিস্কেলের নিজের হাতে মেটালের তৈরি একটি অতি সুন্দর ফুল আর লবনচুসে বাঁধা একটি হার ইত্যাদি। এটা সবাইয়েরই জানা যে, মালকে লবনচুস মুখে রাখতে ভালবাসে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর ইঁদুরটি এখন কোথায় লুকিয়ে? তার পাত্তা নেই কেন? কারণ আছে বইকী, সে নিদ্রামগ্ন— শীতের শুরুতে গরম লেপের তলায় ঘুম শুরু হয়েছে, এখনও চলছে একটানা। আসল কারণটি হল অন্য কিছু— তা হল মালকের একটু ওজন বেড়েছে, গলার নলিটা অল্প ঢাকা পড়ে গেছে, আগের মতো নজরে পড়ছে না। আর একথা ভাবলে ভুল হবে যে, একজন জাদুকরই তার ঝুলির ভিতরের ইঁদুরকে পালটে একটি রাজহাঁস করে ফেলতে পারে। তবুও মালকের গলার নলিতে ইঁদুরটিই রয়ে গেল। আর মালকে, যখন ঘুম বা স্বপ্নের মধ্যে নড়াচড়া করত কিংবা ঢোক গিলত, তখন তার গলার ইঁদুরটিও তাল মিলিয়ে ওঠানামা করত। মালকে যতই ধুরন্ধর বা ওস্তাদ হোক না কেন, মাঝেমধ্যে তাকে ঢোক গিলতেই হত।

আর তাকে কেমন দেখাচ্ছিল? অবিশ্বাস্য ব্যাপার! যুদ্ধের হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্যেও তার শরীরের ওজন গিয়েছিল একটু বেড়ে। অবশ্য খুব সামান্যই, এই তিনটের মতো ব্লটিংপেপার জুড়লে যতটা মোটা হয়, ততটা আর কী। সে তার শরীরের অর্ধেকটা জানলার তলায় বসার জায়গাটিতে, আর বাকি অর্ধেকটা নীচের সাদা রং করা কাঠের পাটাতনে রেখে আরাম করে বসে ছিল।

তার পোশাকটি ছিল ধূসর-কালো আর জংলি সবুজ রঙে মেশানো, যা সাধারণত যুদ্ধের ট্যাংক বিভাগের সব কর্মীরাই পরে থাকে। নিকারবোকারে ঝোলানো মিলিটারি প্যান্টটি, তার বড় ঝকঝকে পালিশ করা বুট জুতোটিকে প্রায় ঢেকে ফেলেছিল। আর কালো রঙের অত্যন্ত টাইট-ফিটিঙের জ্যাকেটটি, তার হাতদুটি এমন ভাবে চেপে রেখেছিল, যে তা অনেকটা কাঠের হ্যান্ডেলের মতো দেখাচ্ছিল। যদিও তার ওজন কয়েক পাউন্ড বেড়েছিল, তবুও ওই পোশাকে তার শরীরটি একটু রুগ্‌ণ ও বাঁকাচোরা দেখাচ্ছিল। আর তার জ্যাকেটের ওপরেও কোনও সম্মানসূচক চিহ্ন ছিল না।

অন্যদিকে তার শরীরে কয়েকটা ছোটখাটো আঘাতের চিহ্ন থাকলেও বড় ধরনের কোনও ক্ষতচিহ্ন ছিল না। কুমারী মাতাই তাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করে রেখেছিল। অবশ্য এটা ঠিকই যে, বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণকারী নতুন কিছুই এবারে তার বুকের ওপরে ঝুলছিল না। কোমরে বাঁধা ছিল একটা পুরনো নোংরা ময়লা বেল্ট, যার সঙ্গে কেবলমাত্র খুব ছোটখাটো কিছু একটা ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব ছিল। মিলিটারির এই ধরনের জ্যাকেটগুলি সাইজে সত্যিই খুব

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ছোট ছিল, আর তাই এগুলিকে লোকে মাঝে মাঝে মজা করে বানরের জ্যাকেট বলত।

বেল্টের সঙ্গে ভারী ওজনের একটা পিস্তল বাঁধা ছিল। আর তা ঝুলছিল কোমরের অনেক নীচে। এই পিস্তলের ওজনের ভারে মালকের শরীর হয়ে উঠেছিল কঠিন ও মুখে এনে দিয়েছিল বিরক্তির ভাব। আর তার ধূসর রঙের ক্যাপটি, মাথার ঠিক মাঝখানে, চুলের সিঁথির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে, সোজাসুজিভাবে আঁটা ছিল।

একদা সে একজন ক্লাউন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। তার গলার যন্ত্রণার অসুখটি সেরে যাওয়ার আগে আর এমনকী পরেও, সে আর লম্বা চুল রাখেনি। যদিও লম্বা চুল রাখার ব্যাপারটি, সে সময়ে কমবয়সি সৈন্যদের ও পরবর্তী সময়ে ধূমপায়ী বুদ্ধিজীবীদের, দ্রুত সন্ন্যাসী হয়ে ওঠার জন্যে বিশেষ আকর্ষণ করেছিল। আর আমাদের মালকে করেছিল উলটোটা, সে তার চুলগুলি ছোট করে কেটে ফেলেছিল।

এখনও পর্যন্ত কিন্তু, মহান যিশুর দীর্ঘ কেশধারী মুখটিই সবার প্রিয়। মালকের উঁচু করে আঁটা ক্যাপের ওপরে ঈগলের চিহ্নটি যেন পাখা মেলে, পবিত্র আত্মা হয়ে, তার কপালের পাতলা চামড়ার ওপরে গিয়ে স্থান নিয়েছে। মোটা নাকের ওপরে কালো আঁচিলের দাগ। নীচের চোখের পাতায় দেখা যাচ্ছে লাল শিরার চিহ্ন।

আমি যখন, তার ও কাপড়ের তৈরি বেড়ালটির মাঝখানে, ভয়ে প্রায় দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন, আমার এই হাল দেখে তার মধ্যে কোনও উত্তেজনাই দেখা গেল না।

তাকে ছোট্ট একটি কৌতুককর কথা বললাম: গুড ডে, সারজেন্ট মালকে।

উত্তর এল না। বুঝলাম আমার কৌতুকটি তেমন কাজে লাগেনি। এরপরে অন্য প্রসঙ্গ:

মালকে: আমি মাস্টারমশাই ক্লোশ্যের জন্যে অপেক্ষা করছি, তিনি কি এখানে কোথাও অঙ্কের ক্লাস নিচ্ছেন?

আমি: আজ তিনি নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

মালকে: আমার লেকচার নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

আমি: তুই কি ইতিমধ্যে অডিটোরিয়ামে গিয়েছিলি?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মালকে: আমার বক্তৃতাটি পুরো তৈরি হয়ে গেছে।

আমি: তুই কি ঘর পরিষ্কার করার মহিলাদের দেখেছিস? তাঁরা বেঞ্চি-চেয়ার সব পরিষ্কার করা আরম্ভ করে দিয়েছেন।

মালকে: কিছু পরে আমি ক্লোশ্যের সঙ্গে একবার হলের ভেতরে যাব। স্টেজের ওপরে চেয়ারগুলি সাজানোর ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আমি: আজ তিনি নিশ্চয়ই খুব আনন্দিত হবেন।

মালকে: আমি তাঁকে প্রস্তাব করব, কেবল উঁচু ক্লাসের ছাত্ররাই যেন এই বক্তৃতা শুনতে আসে।

আমি: ক্লোশ্যে কি জানে যে তুই এখানে অপেক্ষা করছিস?

মালকে: সেকরেটারিয়েটের কর্মী মিস হ্যারশ্যিং ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছেন তাঁকে আমার বক্তৃতার খবর জানানোর জন্যে।

আমি: আজ তিনি নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

মালকে: আমার বক্তৃতাটি ছোট হলেও, সেটি অনেক তথ্যে ভরা।

আমি: এবার আমাকে প্রশ্ন কর। এত অল্প সময়ের মধ্যে তুই এসব কাজ কী করে শেষ করতে পারলি?

মালকে: ভাই পিলেন্স, একটু ধৈর্য ধর! আমার বক্তৃতায় অত্যন্ত খুঁটিনাটিভাবে সমস্ত পরিস্থিতিগুলি নিয়েও আলোচনা করা হবে।

আমি: আর তাতে নিশ্চয়ই ক্লোশ্যে বেশ আনন্দ পাবে।

মালকে: আমি তাঁকে এও অনুরোধ করব, তিনি যেন কোনওমতেই আমাকে দর্শকদের সামনে পরিচয় না করিয়ে দেন।

আমি: তবে কি অধ্যক্ষ মালেনব্রান্ট কিছু বলবেন?

মালকে: অধ্যক্ষ মশাইয়ের বক্তৃতা শুরু হবার ঘোষণা করলেই চলবে, তার বেশি কিছু করার তাঁর দরকার নেই।

আমি: মনে হয় তিনিও হয়তো খুশি—

সারা স্কুলের সমস্ত ক্লাসঘরে ঘণ্টা বেজে উঠে ঘোষণা করল যে, সব ক্লাসের পড়ার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন মালকের পালা! তার চোখ দুটি সে এবার ভাল করে খুলল, চোখের ভুরুদুটি অল্প জেগে উঠল। এই সময়ে তার হাবভাবটি স্বাভাবিক ও শান্ত হলেই ভাল হত, কিন্তু তার বদলে সে যেন এক লাফে তড়িঘড়ি মঞ্চে গিয়ে বক্তৃতা শুরু করতে চাইছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার পিছনে কী একটা আমাকে বিরক্ত করায় পিছনে তাকালাম, আর অবাক বিস্ময়ে দেখলাম একটা বেড়াল, সত্যিই একটা আসল জ্যান্ত বেড়াল। গায়ের রং ধূসর নয় বরং কালোর দিকেই।

বেড়ালটি তার ছোট থাবাগুলি দিয়ে হামাগুড়ি মেরে, একটি সাদা রঙের কিছু দেখিয়ে, আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল।

কাপড়ের তৈরি খেলার বেড়ালেরা জ্যান্ত বেড়ালের চাইতে সহজে হামাগুড়ি দিতে পারে। একটা দাঁড় করানো কাডবোর্ডে স্পষ্টভাবে লেখা, "পোষা বেড়াল।"

ঘণ্টার আওয়াজ অনেক আগেই থেমে গিয়েছে, সর্বত্র বিরাজ করছে এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা, ইঁদুরটি জেগে উঠেছে আর বেড়ালটির প্রভাব আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে। আমি জানলার সামনের দিকে তাকিয়ে, মালকেকে উদ্দেশ করে একের পর এক চুটকি ছাড়তে থাকলাম। আমি মালকের মা ও পিসিমার ওপরে কিছু বললাম; আর হয়তো মালকেকে কিছুটা সাহস দেওয়ার জন্যে, তার বাবার ওপরে, তার বাবার লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের সম্বন্ধে, ও তাঁর যুদ্ধে মৃত্যু নিয়ে, তাঁর বীরত্ব সাহসিকতার জন্যে পাওয়া সম্মানজনক পোস্টহুমাস উপাধি পাওয়া নিয়েও বেশ কিছু কথা বললাম।

আর সব শেষে বললাম, আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি কতই না খুশি হতেন।

আমি মালকের বাবাকে নিয়ে কথা বলার ও তার গলার ইঁদুরটিকে বেড়ালের থেকে ভয় না পাওয়ার জন্যে সাহস দেওয়ার আগেই, আমাদের প্রিন্সিপাল ক্লোশ্যে মহাশয়, তাঁর উঁচু পরদায় বাঁধা চাঁছালো কণ্ঠস্বর নিয়ে, আমাদের মাঝখানে এসে হাজির হলেন। ক্লোশ্যে মালকেকে কোনও রকম ধন্যবাদ জানালেন না। এমনকী সারজেন্ট মালকে বা কমপক্ষে মিস্টার মালকে বলেও সম্মান দিলেন না। তাঁর এই ধরনের ব্যবহার আমি তেমন গ্রাহ্য করলাম না।

এরপরে ক্লোশ্যে হয়তো বিশেষ কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, আমার কাছে আমার ট্রেনিং-এর অভিজ্ঞতার কথা ও ওই ট্রেনিং নেবার অঞ্চলটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা জানতে চাইলেন আর আমাকে বললেন, তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে যে ওই ট্রেনিং-এর টুখ্‌লার হাইডে অঞ্চলের মাটিতে ভাল ঘাস জন্মায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তারপরে, মালকের মাথার সারজেন্টের টুপিটির দিকে তাকিয়ে কয়েকটি সাজানো কথা ছাড়লেন, মিস্টার মালকে, আমি আর সবাই দেখতে পাচ্ছি যে আপনি শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছেন। আপনি তো একসময়ে আমাদের হরসট্ ভেসেল হাইস্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। আমার মাননীয় সহকর্মী ড. ভেন্ড আজ আপনাকে দেখে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে, মালকে তুমি, তোমার পুরনো স্কুলের ছাত্রদের জন্যে একটি ছোট বক্তৃতা দিয়ে, আমাদের সামরিক বাহিনীর শক্তির ওপরে তাদের বিশ্বাসকে জোরদার করে তুলতে। ক্লোশ্যে মালকেকে বললেন, আমি কি আমার অফিসে তোমার সঙ্গে অল্প সময়ের জন্যে কথা বলতে পারি? মালকে তার ভাঁজ করা হাতদুটি দিয়ে, টুপিটি ঝেড়ে পরিষ্কার করতে করতে প্রিন্সিপাল ক্লোশ্যের সঙ্গে চলল তাঁর অফিস ঘরে। চুল ছাঁটা খোলা মাথা, ইউনিফর্ম পরা এক স্কুলের ছাত্র, চলেছে তার প্রথম কনফারেন্সে।

আমি এই কনফারেন্সের ফলাফল জানার জন্যে উদ্‌বিগ্ন হয়ে বাইরে বসে রইলাম। আর যা আমি বিশেষভাবে জানতে চাইছিলাম, তা হল, আলোচনার পরে মালকের গলার নলিটি বেড়ালটিকে কী বলবে। বেড়ালটি যদিও কাপড়ের তৈরি পুতুল বেড়াল ছিল, তবুও সে কখনওই হামাগুড়ি দিয়ে চলা থামায়নি।

এক কদর্য জয়োল্লাস! আমি আবার একবার নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে করলাম। একটু অপেক্ষা করে দেখি কী হয়। সে কিন্তু নতি স্বীকার করতে জানে না আর পারেও না। আমি কি তাকে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি? ক্লোশ্যের সঙ্গে কি কথা বলতে পারি? কিংবা এমন কিছু সান্ত্বনার কথা বলতে পারি, যাতে তার মনটা কিছুটা শান্ত হয়?

খুব দুঃখের কথা এই যে, আলোচনাতে পাপা ব্রুনীসকে ডাকা হয়েছিল। কবিতার বই পকেটে রাখা এই ব্রুনীস মশাই নিশ্চয়ই মালকেকে বাচ্চা ছেলে ভেবে জড়িয়ে ধরে সব গণ্ডগোল পাকিয়ে দিয়েছিল।

পরিষ্কার ব্যাপার: মালকেকে সাহায্য করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি যদি একবার ক্লোশ্যের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম, হয়তো কিছু একটা হত। কিন্তু আমি তো তাঁর সঙ্গে কথা বলেই উঠতে পারিনি। টানা আধঘণ্টা ধরে তিনি তাঁর দুর্গন্ধময় নিশ্বাস আমার মুখের ওপরে ছাড়তে থাকলেন।

আমার প্রায় বমি এসে গিয়েছিল, তাই হয়তো আমার জবাবটা ছিল

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কিছুটা কাঁচা, মানবিকতার দিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায় যে, আপনি হয়তো ঠিকই করেছেন। তবুও আমি বলতে চাই, আপনি কি এটিকে একটা বিশেষ ঘটনা ভেবে, একটু আলাদাভাবে বিবেচনা করতে পারতেন না? আমি আপনার অবস্থাটা ভালভাবেই বুঝতে পারছি। তবে হ্যাঁ, আমিও জানি যে, যা ঘটেছে তা অস্বীকার করা যায় না। স্কুলের একটা নিয়মশৃঙ্খলা বলে কিছু থাকা দরকার। আর যা ঘটে গিয়েছে সেটাকেও আর ফেরানো যায় না। কিন্তু, তা সত্ত্বেও বলা যায়, যখন তার বাবা মারা যান, তখন সে এতই ছোট ছিল যে—। আমি ফাদার গুসেভস্কি ও টুলার সঙ্গেও কথা বললাম, যাতে তারা বেকার নামের বখাটে ছেলেটি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলে। আমি এর পরে গেলাম আমার এককালীন বন্ধু, একটি যুবসংঘের নেতার সঙ্গে দেখা করতে। গ্রিসদেশে, যুদ্ধে তিনি একটি পা হারান, তাই তাঁর একটি পা ছিল কাঠের। তাঁর কর্মক্ষেত্রে, উইনটারপ্লাৎস নামক স্থানের এক মিলিটারি হেডকোয়ার্টার্সের অফিসে, চেয়ারে বসে কাজ করছিলেন তিনি।

তিনি আমার সব কথা ও আমার প্রস্তাব শুনে বিশেষভাবে আনন্দিত হলেন। চটে গেলেন স্কুলের শিক্ষকদের ওপরে আর তাঁদের কিছু কটু কথা বলতেও ছাড়লেন না। সোৎসাহে আমাকে বললেন, সহজ ব্যাপার, তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমরা এটা আবশ্যই করব। মালকেকে এখানে নিয়ে এসো। তার কথা আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। তাকে নিয়ে একবার কী একটা গণ্ডগোল হয়েছিল না? সে যাই হোক, এখন এসব চুলোয় যাক। আমি ঢাক পিটিয়ে বহু লোকের কাছে এ খবর পৌঁছে দেব। আমি এখানকার নারী সংসদের ও ছাত্রীদের সমিতির অনেককেই ডেকে আনতে পারব। এ ছাড়া ডাক ও তার বিভাগের একটি হলও ব্যবস্থা করতে পারি, সেখানে শ'তিনেকের মতো লোকের বসার চেয়ার আছে।"

আর ফাদার গুসেভস্কিও চান তাঁর পরিচিত বয়স্কা মহিলাদের ও ডজনখানেক ক্যাথলিক সংস্থার কর্মীদের জড়ো করতে। কিন্তু পাবলিক মিটিঙের জন্যে তিনি কোনও হল পেতে পারেন না।

সম্মাননীয় গুসেভস্কি আমার কাছে প্রস্তাব করলেন, বক্তৃতার বিষয়টি ক্যাথলিক গির্জার আদর্শের সঙ্গে এক করার জন্যে, তোমার বন্ধু যদি বক্তৃতার আরম্ভে সেন্ট জর্জের ওপরে দু'-চার কথা আর বক্তৃতার শেষে, এই ভয়াবহ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সময়ে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ের কথা বলে, তবে খুবই ভাল হয়।

মন্তব্যটির শেষে তিনি এও জানালেন যে, বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তিনি মালকের এই বক্তৃতাটি শোনার অপেক্ষায় আছেন।

এরপরে আমি উল্লেখ করলাম: কিছু কমবয়সি বখাটে ছেলে, যারা কোনওভাবে টুলা ও বেকারের সঙ্গে যুক্ত, জানিয়েছে যে, তারা জলের তলায় লুকিয়ে থাকা একটা গুপ্ত কামরা চেনে, যেটি এই ব্যাপারে মালকেকে সাহায্য করতে পারে।

রেন্‌ভান্ড নামে একটি ছেলেকে আমি অল্প চিনতাম। সে মাঝে মাঝে গির্জাতে এসে উপাসনার কাজে সাহায্য করত। এই ছেলেটি আমাদের কাছে এসে মালকের সম্বন্ধে কিছু রহস্যময় কথা রাখল। সে জানাল যে, মালকের এই সময়ে নিরাপদ থাকা একান্ত প্রয়োজন, আর সেই কারণে তার পিস্তলটি অবশ্যই এখনই ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। সে আরও বলল, আর তাকে এখানে আনার সময়ে, তার চোখদুটি অবশ্যই বেঁধে রাখা হবে। এ ছাড়া আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে কাগজে সই করে অঙ্গীকার করতে হবে, যে এইসব ঘটনা সে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ গোপন রেখে চলবে। আর এসবের জন্যে তাকে নিশ্চয়ই যথাযথ পয়সা দেওয়া হবে, হয় নগদ টাকা দিয়ে নাহয় মিলিটারি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে। আমরা কিছু না নিয়ে কিছুই করি না, তাই আমরাও চাই না যে, সে বিনা পারিশ্রমিকে কিছু করুক।

কিন্তু মালকে এসব প্রস্তাবে রাজি হল না। পয়সাকড়ি নেওয়ার তার কোনও ইচ্ছে নেই। আমি তাকে একটু খোঁচা মেরে বললাম, তোর তো কোনও প্রস্তাবই মনোমতো হচ্ছে না, বল তুই আসলে কী চাস? তুই তো একবার টুশ্যেল-নরড স্কুলে যেতে পারিস। এখন সেখানে নতুন বছরের ক্লাস শুরু হয়েছে, এ ছাড়া সেখানে আছে নতুন পরিচ্ছন্ন হলঘর। আর তুই সেখানকার প্রধান পাচককেও চিনিস। আমার মনে হয়, সেখানে তারা তোর একটা বক্তৃতার আয়োজন করতে পারলে খুশিই হবে।

মালকে আমাদের সমস্ত প্রস্তাবগুলি শান্তভাবে শুনতে থাকল, মাঝে মাঝে মুচকি হেসে, একটু ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেওয়ার মতো ভাব দেখাল আর বক্তৃতার আয়োজন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করল। কিন্তু এ সবই বৃথা। যে মুহূর্তে প্রস্তাব গ্রহণ করার আর কোনও বাধা রইল না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সেই মুহূর্তেই সে অতি সংক্ষেপে ও নির্দয়ভাবে কোনও কিছুই গ্রহণ করতে অসম্মতি জানাল।

কারণ, প্রথম থেকেই তার মাথায় একটাই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আর তা হল, আমাদের স্কুলের অডিটোরিয়াম হলটি। সে চেয়েছিল, এই নিউ গথিক গির্জার, প্রাচীন আধা-অন্ধকার ধুলোয় ভরা হলটির মধ্যে কোথাও দাঁড়িয়ে, শ'তিনেক মতো ছাত্রদের গুঞ্জন ও কোলাহলের মধ্যেই তার বক্তৃতাটি রাখতে। সে চেয়েছিল যে, বক্তৃতার সময়ে, তার পরিচিত শিক্ষক ও জানাশোনা লোকেরা তার চারিদিকে ভিড় করে থাকুক।

সে চেয়েছিল, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ব্যারন কনরাডীর গোলগাল মুখওলা, বিরাট অয়েল-পেইনটিংটি বক্তৃতার সময়ে, তার চোখের সামনে দেখতে। সে আরও চেয়েছিল, গির্জার পুরনো বাদামি রঙের ভাঁজ করা দরজাটি দিয়ে হলের মধ্যে প্রবেশ করে, অল্প সময়ের একটি অর্থবহ বক্তৃতা সেরে, উলটোদিকের দরজা দিয়ে চলে যেতে। কিন্তু হায়! ক্লোশ্যে মশাই, তাঁর নিকারবোকারে বাঁধা চেক-শার্টটি পরে, একইসঙ্গে দুটি দরজার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন।

মালকেকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন: একজন সৈনিক হিসেবে তোমার এটা বোঝা উচিত যে, কাজের মহিলারা কোনও বিশেষ কারণে এই হলঘরটি পরিষ্কার করে না, তোমার জন্যে নয় আর তোমার বক্তৃতার জন্যেও নয়। হতে পারে যে, তুমি তোমার বক্তৃতার প্রস্তুতি ঠিকঠাক করে রেখেছ, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ অনুষ্ঠান আমাদের এই হলে আয়োজন করা সম্ভব নয়। আর তুমি এ কথা মনে রেখো মালকে, পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে, যারা তাদের সারা জীবন ধরে দামি কার্পেট ভালবাসা সত্ত্বেও মারা যায় সাধারণ কাঠের তক্তার মেঝেতে শুয়ে। তোমাকে অবশ্যই ত্যাগ করা ব্যাপারটা জানতে হবে।

এরপরে ক্লোশ্যে মশাই একটু আপসের মনোভাব দেখালেন। তিনি একটি মিটিং ডাকলেন। আর এই মিটিং স্কুলের ডাইরেকটারের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, স্কুলের আইন-শৃঙ্খলার নিয়মাবলি দাবি করে—

স্কুলের শিক্ষাবিভাগ ক্লোশ্যের রিপোর্টটি গ্রহণ করলেন। তাঁদের যুক্তি হল: স্কুলের এককালীন এক ছাত্র যার অতীত ইতিহাসটি, আজকের যুদ্ধ চলাকালীন ভয়াবহ গুরুত্বপূর্ণ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা বিপজ্জনক। তার অপরাধ খুব বাড়িয়ে না দেখেও, এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তার বর্তমান আচরণ তেমন সুবিধের—

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এর পরে ক্লোশ্যে মালকেকে একটি চিঠি লিখলেন, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত চিঠি। মালকে তা পড়ে ভালভাবেই বুঝতে পারল যে, এই মানুষটির মন আসলে যা চায় তা করে ওঠার শক্তি বা স্বাধীনতা তার নেই। দুঃখের বিষয়, সময় ও পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ওঁর মতো একজন দায়িত্বশীল অভিজ্ঞ স্কুলশিক্ষকের পক্ষে নিজের একটি সাধারণ ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। স্কুলের স্বার্থরক্ষার খাতিরে তাঁকে অন্য কোনও মানবিক শক্তির দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। যদিও অন্য দিকে এই ক্লোশ্যেই বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর হরসট্ ভেসেল স্কুলের সব অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে চান। তিনি আশা করেন যে, মালকে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হয়ে, শীঘ্রই স্কুলে তার বক্তৃতাটি দিতে পারবে। আর যদি তা কোনও কারণে সম্ভব না হয়, তবে তিনি অন্তত মালকের বক্তৃতাটির সারাংশটি সংগ্রহ করে পড়ে নেবেন।

মালকেকে দেখা গেল, ঘন ঘাসে ও কাঁটাগুল্মে ঢাকা একটি পথ ধরে, অলিভা নামক বড় পার্ক অঞ্চলটির দিকে হেঁটে হেঁটে যেতে। সেদিকে যাওয়ার এই পথটি ছিল আঁকাবাঁকা একটা সুড়ঙ্গের মতো।

দিনের বেলা সে লম্বা ঘুম দিত, মাঝে মাঝে তার পিসিমার সঙ্গে ব্যাকগ্যামন খেলত অথবা কিচ্ছু না করে আলসে হয়ে শুয়ে, তার ছুটির বাকি দিনগুলি কাটাত। আর সন্ধেতে আমার সঙ্গে চলত তার পায়চারি। দ্রুত হাঁটতে পারত সে, আমি কখনওই তার সামনে আসতে পারতাম না, খুব চেষ্টা করে বড়জোর পাশাপাশি। আমাদের রাতের লম্বা পায়চারি।

কিন্তু একেবারে উদ্দেশ্যহীন ছিল না এই পায়চারি, আমরা বাউম-বাখ্-আলী রাস্তাটি ধরে চলছিলাম। এই নির্জন মনোরম রাস্তায়, গাছের ওপর বসে, রাতের দুটি কোকিল মিষ্টি গান করছিল। আর আমাদের মহামান্য ক্লোশ্যে সাহেব বাস করতেনও এই অঞ্চলটিতে।

ক্লান্ত আমি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ইউনিফর্ম পরা মালকের পেছনে পেছনে চলতে থাকলাম।

একসময়ে বিরক্ত হয়ে তাকে বললাম, তোর পক্ষে একটা বোকা মানুষ হয়ে যাওয়া মোটেই মানায় না। তোর বোঝা উচিত যে, তুই যা করতে চাইছিস, তা করে উঠতে পারবি না। আর এটা করা বা না করার মধ্যে তফাতটাই বা কী? তোর তো এখনও আরও কয়েক দিন ছুটি আছে, বোকার মতো বেশি চিন্তা না করে, ছুটির বাকি ক'টা দিন ভাল করে এনজয় কর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আমাদের মহান মালকে আমার এই অনুরোধ বোধ হয় শুনলই না। মনে হয় ওই সময়ে তার লম্বা উঁচু কানদুটি অন্য কিছু শোনায় ব্যস্ত ছিল। ঘাসে ছাওয়া মাটিতে আমরা দু'জন আর গাছের ওপরে গানে রত কোকিল দুটি, আমরা একসঙ্গে মধ্যরাত পর্যন্ত নিদ্রাবিহীন রয়ে গেলাম।

বার দুয়েকের মতো তাঁকে দেখা গেল। তবে একা নয়, কেউ সঙ্গে ছিল। আমরা তাঁকে পায়চারি করার সুযোগ দিলাম আর কড়া নজরে রাখলাম। অবশেষে চার দিনের দিন, রাত এগারোটা নাগাদ তাঁর দেখা মিলল। একেবারে একা, রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে। আবহাওয়া মোটামুটি গরম ছিল সেই সময়ে। তাঁর প্যান্ট বাঁধা ছিল নিকারবোকার দিয়ে, গায়ে নেই কোট, মাথায় নেই টুপি। বাউম-বাখ্-আলী রাস্তাটি ধরে হাঁটছেন তিনি।

আর ঠিক এই সময়ে, বীর মালকের কঠিন সোজা বাঁ হাতটি এসে, ক্লোশ্যের টাই বাঁধা জামার কলারটা সজোরে চেপে ধরল। অতঃপর মালকে এই স্কুল শিক্ষকটিকে, গোলাপ বাগানের পিছনের, লোহার জালের বেড়ার ওপরে চেপে ধরল। জায়গাটি অন্ধকার ছিল, কোকিল পাখিদের গলার চাইতে জোরদার অন্ধকার।

ক্লোশ্যের চিঠির উপদেশ মতোই মালকে তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। চিঠির ভাল উপদেশটি মনে রেখে, অর্থাৎ একটি কথাও না বলে, স্কুল শিক্ষকের দাড়ি কামানো পরিষ্কার বদনটির দু'পাশে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডাইনে বাঁয়ে, সজোরে থাপ্পড় মারতে লাগল। দুটি মানুষই বাকরুদ্ধ, কঠিন আর দৃঢ়। থাপ্পড়ের আওয়াজই শুধু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কথা বলছিল। ক্লোশ্যে পুরোপুরি বন্ধ করে রেখেছিলেন তাঁর মুখটি। মনে হয় তিনি, গোলাপ ফুলের গন্ধের সঙ্গে তাঁর মুখের পিপারমেন্ট লজেন্সের গন্ধ মেশাতে চাইছিলেন না।

ঘটনাটি ঘটেছিল একটি বৃহস্পতিবার আর এটি চলেছিল মিনিটখানেকের থেকে কম সময়। আমরা ক্লোশ্যেকে, লোহার জালের বেড়াটির সামনে রেখে, চলতে শুরু করলাম। মালকে প্রথমে তার মিলিটারি কমব্যাট বুট জুতোটি, চলাচল করার সরু কাঁকুরে রাস্তার, লাল রঙের মাপেল গাছের তলায় রেখে, ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিল। রাত্রিবেলা এই গাছটির রং লাল ছিল না, গাছটি আমাদের ও আকাশের মাঝখানে, একটি ছায়ার কালো আস্তরণ সৃষ্টি করেছিল।

আমি চেষ্টা করলাম, যাতে ক্লোশ্যে আমার ও মালকের কাছে ক্ষমা চেয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নেন। থাপ্পড় খাওয়া আহত মানুষটি আমাদের প্রস্তাব শুনে, কোনও উত্তর না দিয়ে, চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁকে তেমন আহামরি আহত কিন্তু দেখাচ্ছিল না। একটা ভৌতিক শরীর নিয়ে শক্ত কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ফুলের গন্ধ ও পাখির কণ্ঠের গান এখন তাঁর সঙ্গী। তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর নাম, তাঁর প্রিয় স্কুলটি, এক সদা জাগ্রত আত্মশক্তিতে ভরা, তাঁর প্রাণপ্রিয় স্কুলটি।

এর পরে আমরা একটি নির্জন সংকীর্ণ রাস্তা ধরে, ক্লোশ্যে সম্বন্ধে একটিও কথা না বলে, হাঁটতে শুরু করলাম। এইসময়ে মালকে খুব শান্ত ও ধীরস্থির ভাবে, অন্য এমন কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলল, যা আমার বা তার কাছে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হতে পারে।

যেমন, মৃত্যুর পরেও কোনও জীবন বলে কিছু থাকতে পারে কি না, কিংবা জন্মান্তর বলেও কিছু আছে কি না, এই সব প্রশ্ন। সে আমাকে আরও বলল, আমি কিছুদিন যাবৎ খুব মন দিয়ে কিয়ারকেগারড পড়ছি। তারপরে সে আমাকে অনুরোধ করল, পরে, সময়সুযোগ পেলে, তুই অবশ্যই, ডোসটোয়েভস্কী-র লেখা পড়বি, বিশেষ করে যদি তুই কোনও সময়ে রাশিয়াতে যাস, তবে সেখানে গিয়ে পড়বি। তাঁর লেখার মধ্যে মানুষের চিন্তাভাবনা ও মনের রহস্যের অনেক কিছুই খুঁজে পাবি।

এরপরে অনেকবারই আমরা স্ট্রীসবাখ্ নামে খালটির ওপরের ছোট্ট পুলটির ওপরে দাঁড়িয়েছি, বহমান স্বচ্ছ জলের স্রোতের তলায় দেখেছি রাশি রাশি জোঁক। বেশ মজা লেগেছিল পুলের রেলিঙের ওপরে হেলান দিয়ে, বেড়ালের জন্যে অপেক্ষা করতে। হয়তো এই ধরনের প্রতিটি সেতুই স্কুলের ছাত্রদের, কাঁচা মামুলি ধরনের কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করে গল্পগাছা করতে স্থান করে দেয়।

যেমন, দুনিয়ার যাবতীয় যুদ্ধজাহাজের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নিয়ে, তাদের গতিবেগ, ধর্মকেন্দ্রিক নানান প্রশ্ন, এমনকী মানব জীবনের তথাকথিত শেষ প্রশ্নের ওপরে— ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নয়শ্যোট্‌লান্ড নামে ছোট্ট সেতুটির ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা ক'জন। সবকিছু ভুলে, জুন মাসের স্বচ্ছ নীল আকাশের দিকে, দীর্ঘ সময় ধরে অনিমেষনেত্রে তাকিয়ে রইলাম। তারপরে আমরা সবাই এক এক করে, সামনের স্রোত বইতে থাকা, খালটির পরিষ্কার জলে নেমে পড়লাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মালকে চুপচাপ। অগভীর খালের জলে ডুবে থাকা, পচা জল ভরতি কিছু টিনের কৌটো, আমাদের পায়ের চাপে শব্দ করে ফেটে গিয়ে, দুর্গন্ধ গ্যাসের বুদবুদ সৃষ্টি করতে থাকল। মালকে এবার বলতে শুরু করল, অবশ্যই আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। এ সবই ধাপ্পাবাজি, মানুষকে বোকা বানানোর এক হাতিয়ার মাত্র। আমি একমাত্র যাকে বিশ্বাস করি, তা হল কুমারী মাতা মারিয়া। আর সেই কারণেই আমি কোনওদিনই বিয়ে করব না।

ছোট্ট মন্তব্যটি একটু পাগলাটে ধরনের ছিল, হয়তো সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে গল্পচ্ছলে বলা যায়। কিন্তু তা হলেও এই কথাগুলি আমার মনে দাগ কেটেছিল।

যখনই কোনও সরু খালের ওপরে একটি সেতু দেখা যায়, আর সেই সেতুর নীচে শব্দ তুলে জল বইতে থাকে, আর মূর্খ লোকেরা সেতুর ওপর থেকে খালের জলে টিনের কৌটো ছুড়তে থাকে, তখন— হ্যাঁ তখনই, মালকে তার মিলিটারি জুতো আর জ্যাকেট পরে, আমার পাশে সশরীরে হাজির হয়।

জাঁকালো পোশাক পরা এক আশ্চর্য ক্লাউন। রেলিং-এ আরাম করে হেলান দিয়ে, গলায় হার-মাদুলি-মেডেল প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস ঝুলিয়ে, বেড়াল ও ইঁদুরের প্রতি তার অগাধ আস্থা গর্বভরে ঘোষণা করছে, মোটেই ভগবান নয়— ওসব ধাপ্পাবাজি— একমাত্র কুমারী মা মারিয়া— বিয়ে আমি আর করছি না।

এর পরে সে আরও বহু কথাই বলেছিল, আর সেই কথাগুলি সম্ভবত খালের জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। তারপরে আমরা মাক্স-হাল্ব-স্কোয়্যারে বার দশেকের মতো চক্কর মারলাম, হ্যারেসাঙার রাস্তাটির নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত দশ-বারোবারের মতো ঘুরলাম। ৫ নং ট্রাম লাইনের শেষ স্টেশনে অকারণ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আর পেটে খিদে নিয়ে দেখতে থাকলাম ট্রামের কন্ডাক্টাররা, তাদের নীল রঙের পোশাক পরে, বেঞ্চিতে আরাম করে বসে, বাটার-স্যান্ডুইচ খাচ্ছে আর থার্মফ্লাস্ক থেকে গরম কফি ঢেলে পান করছে।

অবশেষে একটা ট্রাম এসে পৌঁছল। ট্রামটির মধ্যে হয়তো বসে আছে টুলা পোকরিফকে। আমাদের পরিচিত টুলা মেয়েটি বেশ কিছুদিন ধরে মিলিটারিতে হেলপার হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে তার ডিউটি হল,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মাথায় বেঁকা করে টুপি এঁটে, আর যথাযথ পোশাক পরে, টিকিট কন্ডাক্টারের কাজ করা। যদি সে ৫ নম্বর ট্রামে কাজ করত, তবে আমরা নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম, কিংবা আমি নিজেও হয়তো তার সঙ্গে একবার আলাদা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারতাম। আর বাইরে থেকে, ট্রামের অস্বচ্ছ নীল কাচের জানলার ভিতর দিয়ে, তার ছোট্ট মুখটাই শুধুমাত্র আমরা দেখতে পেলাম। পুরোপুরি নিশ্চিতও হওয়া গেল না, ও মুখটি আসলে টুলার ছিল কি না।

আমি মালকেকে বললাম, তোর একবার টুলা মেয়েটিকে পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

মালকে বিরক্তভাবে উত্তর দিল, তুই তো নিশ্চয়ই শুনেছিস যে, আমি জীবনে বিয়ে করব না।

আমি: ওকে পাওয়ার পরে তো মাথায় অনেক অন্য নতুন চিন্তা আসতে পারে।

সে বলল, আর ওকে ছাড়ার পরে কে আমার মাথায় আবার অন্য নতুন চিন্তা এনে দেবে?

আমি ওর সঙ্গে একটু মজা করার চেষ্টা করলাম।

বললাম, চিন্তা নেই, তার জন্যে রয়েছে তোর কুমারী মাতা।

কিছুটা চিন্তিত মালকের জবাব: আর যদি সে দুঃখ পায়?

আমি তাকে আমার সহযোগিতা জানিয়ে বললাম, যদি তুই চাস, তবে আমি আগামীকাল গুসেভস্কিকে উপাসনার কাজে সাহায্য করতে পারি।

অভাবনীয় দ্রুততার সঙ্গে জবাব এল, ভাল প্রস্তাব, আমি রাজি।

এই বলে, টুলা পোকরিফের দেখা পাওয়ার আশায়, ট্রামের দ্বিতীয় কামরাতে ওঠার জন্যে সে এগিয়ে গেল। আর ট্রামে ওঠার ঠিক আগে আমি তাকে একবার জিগ্যেস করলাম, আর কদ্দিনের মতো তোর ছুটি আরও বাকি আছে? আমাদের বিখ্যাত মালকে ট্রামের খোলা দরজাটির সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, আমার ট্রেন সাড়ে চার ঘণ্টার মতো আগে ছেড়ে গিয়েছে, আর সেটি যদি সময় মতো চলে, তবে এতক্ষণে মোডলীনে পৌঁছে গিয়েছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তেরো

মহামান্য গুসেভস্কি ল্যাটিন ভাষায় কিছু মন্ত্র পড়লেন। মন্ত্রের ভাষার শব্দগুলি যেন সাবানের ফেনার বুদবুদের মতো তাঁর মুখের ছুঁচোলো ঠোঁটদুটির মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল। তাঁর মুখটি সামান্য একটু চিন্তিত দেখালেও, রামধনুর সাতটি রঙের মতো জ্বলজ্বল করছিল। অতীতের সব সমস্যা থেকে নিজেকে মুক্ত করে, ইজিচেয়ারে বসে আরাম করে দুলছেন তিনি।

পরে, উঠে দাঁড়িয়ে জানলা খুললেন, জানলার কাচের ওপরে অনেক কিছুর প্রতিবিম্ব পড়ল— উপাসনার বেদির, কুমারী মাতার শরীর, তাঁর নিজের চেহারা, তোমার আমার, সবার প্রতিবিম্ব—।

পরে, ল্যাটিন ভাষায় আশীর্বাদের মন্ত্র পাঠ হওয়ার আগেই, জ্বলজ্বলে আনন্দময় শরীর ও মন প্রস্তুত হচ্ছিল মন্ত্রপাঠের জন্য। আর কিছু আড়ম্বরজনক মন্ত্র, কয়েকজন বিশ্বাসী ভক্তের আমেন-ধ্বনির সঙ্গে পাঠ করে, নিজেকে অতিথিসেবক হিসেবে জাহির করে, মহামান্য গুসেভস্কি তাঁর মুখটি পুরো খুলে, বুদবুদের মতো ছাড়তে লাগলেন কিছু ভারী ভারী বাত।

খানিকক্ষণের জন্যে হলের মধ্যে এক ভয় ও সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হল। তারপরে গুসেভস্কি তাঁর চওড়া লাল জিভের ডগাটি মুখ থেকে বার করে, ক্রমাগত ওপরে তুলতে থাকলেন, আর দ্বিতীয় সারির বেঞ্চির সামনের দিকে মুখ করে, জিভটি আবার ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। মন্ত্রপাঠে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মালকেই সর্বপ্রথম হাঁটুগেড়ে নতজানু হয়ে মাটিতে বসল। আর মন্ত্রদীক্ষার বেঞ্চিতে বসে, দ্রুততার সঙ্গে তিনবার একটি লম্বা মন্ত্র গড়গড় করে আউড়ে গেল সে,

হে মহান ঈশ্বর, আমি তোমার সেবা করার উপযুক্ত নই...।

এমনকী, আমি যখন গুসেভস্কির আগেই, সিঁড়ি দিয়ে নেমে উপাসনার স্থানটিতে হাজির হলাম, তখন তিনি তাঁর মাথাটি পিছনে ফেরালেন, যাতে করে তাঁর রাতজাগা ক্লান্ত মুখটি, লোকচক্ষু থেকে কিছুটা আড়াল হয়ে যায়। তিনি নিজের জিভ দুটি ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরলেন। এরপরে তাঁকে সামান্য সময়ের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হল।

উপাসনার কার্যে রত পাদ্রি মহাশয়, পূজার পবিত্র জল আঙুলে নিয়ে, মালকের কপালে একটি ছোট ক্রসচিহ্ন দ্রুত এঁকে দিলেন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বিন্দু বিন্দু আকারের ঘাম কোনও কারণে মালকের মুখের ওপরে এক হড়হড়ে আস্তরণ সৃষ্টি করেছিল। মালকে তার দাড়ি কামায়নি, তাই, তার দাড়ির খোঁচা খোঁচা চুল ওই ঘামের আস্তরণটি শীঘ্রই সরিয়ে ফেলতে পারল। তার চোখদুটি কিন্তু ভীত আর সেদ্ধ ডিমের মতো দেখাচ্ছিল। হতে পারে যে, তার জ্যাকেটের গাঢ় কালো রঙের জন্যেই, তার চোখ দুটিকে ওইরকম আর তার মুখটি কিছুটা পাণ্ডুবর্ণের দেখাচ্ছিল।

একটি মোটাসোটা জিভের মালিক হওয়া সত্ত্বেও মালকে ঢোক গেলা প্রায় বন্ধ করে দিল। আর তার গলায় ঝোলানো লোহার বস্তুগুলি, যেগুলি আগে বহুবার, নড়াচড়া করে অনেক রাশিয়ান ট্যাংককে প্রশংসা জানিয়েছে, সেগুলি এখন নিস্তব্ধ হয়ে জামার কলারের ওপরের বোতামটির কাছে, শান্ত হয়ে শুধু শুয়ে রইল।

পরে, যখন মহামান্য গুসেভস্কি উপাসনার এক টুকরো পবিত্র রুটি, মালকের মুখে ঢুকিয়ে দিলেন, মালকেকে তা গলাধঃকরণ করার জন্যে ঢোক গিলতেই হল। আর তখনই তার উঁচু লম্বা নলিটির ওঠানামাতে, গলার ঝুলন্ত ধাতুর তৈরি মালাগুলি আওয়াজ করে উঠল।

এবার আমরা তিনজন একসঙ্গে মিলে, একবার একটি উপাসনার অনুষ্ঠান পালন করি।

তুই হাঁটুগেড়ে বসে পড় মাটিতে, আর ঘামতে থাক!

আমি তোর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকি আমার ঘামহীন শরীরটি নিয়ে!

প্রচণ্ড ঘাম ঝরতে থাকুক আবার তোর সারা মুখটিতে!

তোর মোটা জিভটির ওপরে গুসেভস্কি এসে রেখে দিক একটি পবিত্র রুটির টুকরো!

এইভাবে, ছকে বাঁধা মন্ত্র পড়ে আর গির্জার নিয়ম মেনে, আমরা তিনজন শেষ করি আমাদের উপাসনার পালা! আর তোর জিভটি যথারীতি ঢুকে যাক মুখের মধ্যে, ঠোঁটদুটি বন্ধ করে ফেলুক তোর মুখটি!

গলার ইঁদুরটি ওঠানামা করা আরম্ভ করে দিল, চারিদিকে খবর রটে গেল, আর আমিও ভালভাবে বুঝতে পারলাম যে, আমাদের গ্রেট মালকে সদম্ভে সেন্ট ম্যারী চ্যাপেল গির্জা ছেড়ে চলে যাবে। তার গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাবে যথাসময়ে। মুখটা হয়তো চকচকক করতে পারে, কারণ সেটি শুধুমাত্র বৃষ্টির জলেই ভিজে গিয়েছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বাইরে চলছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। গির্জার ভিতরটা শুকনো। সেখানে দাঁড়িয়ে গুসেভস্কি বললেন, সে নিশ্চয়ই বাইরে দরজার সামনে অপেক্ষা করছে, আমাদের কাউকে গিয়ে তাকে ভেতরে ডেকে আনা উচিত, কিন্তু—

আমি বললাম, ফাদার, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ওর খবর নিচ্ছি।

গুসেভস্কি তাঁর দুটি হাত দিয়ে ল্যাভেন্ডার সাবানের প্যাকেটটি আলমারির মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন, এখন মনে হয়, সে নিশ্চয়ই আর কোনও ভুলভাল কাজ করে বসবে না।

আমি এবারে সত্যিই, তাঁকে পোশাক পালটানোর কাজে কোনওরকম সাহায্য করলাম না।

ফাদার গুসেভস্কিকে বললাম, ফদার, আপনি এখন এসব ব্যাপার থেকে যদি একটু সরে দাঁড়ান ভাল হয়।

আর মালকে যখন আমার সামনে তার ভিজে ইউনিফর্মে দাঁড়িয়ে, তখন গুসেভস্কি তাকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি একটা আকাট মূর্খ, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী করতে চাও? এখনই চলে যাও হোখস্ট্রীসের মিলিটারি অফিসে, সেখানে গিয়ে তোমার ট্রেন মিস করার কিছু একটা কারণ বানিয়ে বলো গিয়ে। আমি তোমার এসব ব্যাপারে একেবারেই মাথা গলাতে চাই না।

তাঁর এই কথার পরে আমার আসলে চলে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম আর বৃষ্টিতে ভিজতে থাকলাম। বৃষ্টিই আমাকে এই ব্যাপারের সঙ্গে বেঁধে রাখল।

এরপরে আমি মালককে যুক্তি দেখানোর মতো কয়েকটা কাজের কথা বললাম, তুই যদি তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গিয়ে, যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ বাতলাতে পারিস, তবে তারা তোর নিশ্চয়ই কোনও ক্ষতি করবে না। তুই তো তাদের কাছে তোর মা বা পিসিমার অসুখবিসুখের বা অন্য কিছু দুর্ঘটনার কথা বলতে পারিস।

আমি যখন তাকে এসব কথা বললাম, তখন সে অল্প মাথা নাড়ল, হাঁ করে হাই তুলল আর মাঝে মাঝে অকারণ মুচকি হাসি হাসল।

আর সব শোনার পরে, সে কিন্তু একেবারেই অন্য এক প্রসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল, পোকরিফকে মেয়েটির সঙ্গে কাল রাতটা মন্দ কাটেনি। আমি এমনটি আশাই করিনি। তার কাজকর্ম দেখে যেমন মনে হয়, তেমনটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সে মোটেই নয়। এবার তোকে সত্যি করে বলি, শুধুমাত্র তার জন্যেই এখন আমার পক্ষে পিছনে সরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, আমার তরফ থেকে যা যা করার তা আমি করেছি। তোরও কি তাই মনে হয় না? আমি এখনই মিলিটারি কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করছি। তাঁরা অন্য যা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমাকে যদি দূরে কোথাও, একজন ট্রেনার হিসেবে কাজে পাঠান, তাও আমি মেনে নিতে রাজি আছি। এর ফলে কমপক্ষে অন্যদের মুখে তালা পড়বে। ভাবিসনি যে আমি ভয় পাচ্ছি, মোটেই নয়। আসলে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে। আমার অবস্থা তুই বুঝতে পারছিস তো?

আমি তার কথাগুলি মোটেই মেনে নিতে পারলাম না, বরঞ্চ তাকে কড়া ভাষায় বললাম, বুঝলাম, তা হলে টুলা পোকরিফকে মেয়েটিই হচ্ছে আসল কারণ। সে মোটেই ট্রামের মধ্যে ছিল না। দুনিয়াসুদ্ধু লোক জানে যে, পোকরিফকে ২ নং ট্রাম রুটে কাজ করে, ৫ নং ট্রাম রুটে নয়। তুই সব উলটোপালটা দেখেছিস। আসলে তুই এখন একটা বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিস। বুঝতে পারছিস আমার কথা?

আগেই তার প্ল্যান করা ছিল টুলার সঙ্গে কিছু একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে। মালকে বললে, টুলার কথা তুই বিশ্বাস করতে পারিস, সে আমাকে তার সঙ্গে তাদের এলসেন স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়ে যায়। তার মা কিছুই মনে করেননি। তবে তুই ঠিকই বলেছিস। যথেষ্ট হয়েছে, আর আমি পারছি না। হয়তো আমার একটু ভয়ও ধরেছে। এ ধরনের ভয় গির্জার মধ্যে উপাসনা অনুষ্ঠানের আগে মাঝে মাঝে হত। যাই হোক, এখন অবস্থা একটু ভাল।

আমি: আমি তো ভেবেছিলাম, ঈশ্বর বা ওই ধরনের কোনও কিছুর ওপরে তোর বিশ্বাস নেই।

মালকে: এ সবের সঙ্গে এখনকার ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই।

আমি: ঠিক আছে, তা নয় ভুলে গেলাম। কিন্তু এখন বল তোর আসল ব্যাপারটা কী?

মালকে: হতে পারে যে, বেকার ছেলেটি ও তার বখাটে সঙ্গীরা এর একটা কারণ হতে পারে। তুই তো তাদের ভাল করে চিনিস, তাই না?

আমি: নো মাই ডিয়ার, মোটেই নয়! ওই বজ্জাত ছেলেগুলোর সঙ্গে আমার একেবারেই কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের থেকে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আর নয়। আর এ ব্যাপারে তোর যদি আরও জানতে ইচ্ছে করে, তবে তুই তো তা টুলার কাছেও জেনে নিতে পারিস। তুই তো ওদের বাড়িতে গিয়েছিস, তাই না?

মালকে: আমাকে একবার বোঝার চেষ্টা কর। আমার পক্ষে আমাদের বাড়ির ওই অঞ্চলটিতে আর মুখ দেখানো সম্ভব নয়। ওই ছেলেগুলো তোদের ওখানে এখনও যদি না পৌঁছে থাকে, তবে আমাদের ওখানে যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না। তোদের বাড়িতে কোথাও, হয়তো বেসমেন্টের তলায়, আমি লুকিয়ে থাকতে পারি কি? শুধুমাত্র কয়েক দিনের জন্যে?

কিন্তু আমি মোটেই তার এইসব ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত হতে চাই না। তার ইচ্ছা নাকচ করে বললাম, লুকোনোর অন্য কোনও একটা জায়গা তুই নিশ্চিত খুঁজে পাবি। তোদের তো গ্রামাঞ্চলে আত্মীয়স্বজন আছে, তাই না? এ ছাড়া টুলার কাকারও ছুতোরের কাজকর্মের একটা ছোট কুটির আছে, সেখানেও তো যেতে পারিস। আর কোথাও না হলে, জলের তলায় বজরাটা তো এখনও আছে, লুকোনোর জন্যে সেটাও তো মন্দ জায়গা নয়, তাই না?

আমার কথাগুলি গলাধঃকরণ করতে মালকের বেশ কিছুটা সময় লাগল। সে বললে, এই বৃষ্টিবাদলার জঘন্য আবহাওয়ায়?

আসলে যা ঘটার, তা সব আগেই ঠিক হয়ে ছিল। যদিও আমি অনেক কিছু বলে, তাকে সাহায্য করার ব্যাপারটি স্পষ্ট এড়িয়ে যাচ্ছিলাম, খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে তার সঙ্গে জলে ডোবা বজরাটি পর্যন্ত যেতে অস্বীকার করলাম, তবুও ঘটল ঠিক তার উলটোটা। অর্থাৎ আমাকে তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। বৃষ্টিই আমাদের আর একবার এক করে দিল।

তারপরে, পাক্কা এক ঘণ্টা সময় ধরে আমরা নয়শ্যট্‌লানড ও শ্যেলমুইলে, এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে যাওয়া-আসা করে, তারপরে পোসেডো-স্ট্রিট ধরে একটানা হাঁটতে থাকলাম।

দুটি বড় থামের আচ্ছাদনের তলায় আমরা এরপর কিছুক্ষণ আশ্রয় নিলাম। এইসব বড় থামগুলির ওপরে সবসময়ে একই ধরনের বিজ্ঞাপন লাগানো থাকে, যার বক্তব্য অনিষ্টকর বা ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে মানুষকে সাবধান করে দেওয়া।

এরপরে আবার আমরা আমাদের হাঁটা শুরু করলাম। কিছুটা এগিয়ে সরকারি মহিলা হাসপাতালের প্রবেশপথের কাছ থেকেই আমাদের পরিচিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দৃশ্যটি চোখে পড়ল— দেখতে পেলাম, রেললাইনের সামনের বৃহৎ আকারের বাঁধটির পিছন বরাবর বিশাল বিশাল কাস্টানিয়ান গাছের ডালপালায় প্রায় ঢাকা পড়ে যাওয়া, আমাদের মাধ্যমিক স্কুলের বাড়িটি।

মালকে কিন্তু সেদিকে তাকাল না, কিংবা সে হয়তো অন্য কিছু দেখছিল। তারপরে, আমরা প্রাইমারি স্কুলের কয়েকটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে, একটি বাস স্টপেজের পুরনো ঝরঝরে টিনের ছাদের তলায়, আধ ঘণ্টা মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম।

বাচ্চারা বক্সিং খেলতে ও পরস্পরকে বেঞ্চি থেকে ঠেলে ফেলার খেলায় ব্যস্ত রইল। মালকে তাদের কাজকর্মে বিরক্ত বোধ করে, তাদের দিকে পিছন করে দাঁড়াল। তাতে কিন্তু তেমন কোনও সুবিধে হল না। বাচ্চারা তাদের দৌড়ঝাঁপ সমান তালে চালাতে লাগল। দুটি বাচ্চা তাদের স্কুলের খোলা খাতা নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল।

তারা স্থানীয় ভাষায় কথা বলছিল, আমার খাতা আমায় এখনই ফিরিয়ে দে, এক্ষুনি ফিরিয়ে দে বলছি কিন্তু।

আমি একটি বাচ্চাকে জিগ্যেস করলাম, ব্যাপার কী? তোদের কি আজ কোনও স্কুল নেই?

উত্তর এল, আর আমরা যদি যেতে চাই তবেই তো! সকাল ন'টার আগে এমনিতেই ক্লাস আরম্ভ হচ্ছে না।

মালকের সঙ্গে তাদের কথা জমে উঠল। তাদের ইচ্ছে পূরণ করতে, মালকে তার নাম ও কাজের র‍্যাংক, ছেলেদুটির খাতার শেষ পাতায় লিখে দিল। এতে তারা কিন্তু পুরো খুশি হল না। তারা আরও জানতে চাইল, যুদ্ধেতে ঠিক কতগুলি ট্যাংক মালকে ধ্বংস করেছে।

অগত্যা মালককে নতি স্বীকার করে, তাদের খাতাতে, প্রথমে সংখ্যা দিয়ে ও তারপরে অক্ষর দিয়ে পরিষ্কার করে সব লিখে দিতে হল। পরে, আবার এই একই জিনিস আরও দুটি খাতায় তাকে লিখতে হল।

আমি কিছুটা বিরক্ত হয়ে, আমার ফাউন্টেন পেনটি মালকের কাছ থেকে ফেরত চাওয়ার সময়ে, তাদের মধ্যে একজন আবার মালককে জিগ্যেস করে বসল: আর কোথায় তুমি এই ট্যাংকগুলি ধ্বংস করেছে? বিজলগেরট অঞ্চল কি?

মালকে শুধু মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিয়েই ছেলে দুটিকে শান্ত করতে পারত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তা না করে, সে চাপা গলায় ফিসফিস করে তাদের জানাল, না, সেখানে নয়। আমরা যখন সেনাবাহিনীর প্রথম ট্যাংকটি বুচেয়াস অঞ্চলে ধ্বংস করি, তারপরে এপ্রিল মাসে বাকিগুলো কোভেল, ব্রোডি ও ব্রেসেসনী অঞ্চলে পরপর ধ্বংস করা হয়।

আমাকে আবার একবার আমার ফাউন্টেন পেনটি খুলতে হল! কারণ নাছোড়বান্দা ছেলেদুটি, সবকিছুই লিখিতভাবে চায়। তারা শিস দিয়ে, তাদের আরও দু'জন বন্ধুকে, বৃষ্টির মধ্যেই, বাস স্টপেজের টিনের শেডের তলায় ডেকে আনল। সেই একই জিনিস, ওই নতুন দুটি বন্ধুদের জন্য মালকেকে আবার একবার লিখতে হল।

মালকে তাদের খাতার পাতাগুলি নিজের মতো করে সোজা করে রাখতে চাইল। কিন্তু তারা তা করতে দিল না। এক বাচ্চা খাতার কাগজটি সোজা করে ধরে রইল। মালকে তার কাঁপা হাতে ও অস্পষ্ট অক্ষরে, ট্যাংক ধ্বংস হওয়ার জায়গাগুলি লিখতে লিখতে, কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করল।

এবার প্রশ্ন এল হতবাক হয়ে যাওয়া বাচ্চাদের থেকে, ক্রিভয় রোগ অঞ্চলেও কি একটা ট্যাঙ্ক ধ্বংস—?

সব বাচ্চাদেরই মুখ খোলা, সবারই ফোকলা দাঁত, চোখগুলি ঠাকুরদা-ঠাকুমার মতো উত্তেজিত, কানগুলি দাদু-দিদিমার মতো খাড়া আর নাকের ফুটোগুলি সবারই মোটামুটি একই রকম।

বাচ্চারা অনেক কিছুই জানতে চায়।

আর এখন মিলিটারি তোমাকে কোথায় পাঠাবে?

ও আমাদের তা মোটেই বলবে না, পাগলের মতো এসব জিগ্যেস করছিস কে?

আমি বাজি ধরে বলতে পারি, মিলিটারি ওকে আবার যুদ্ধে পাঠাবে।

মনে হয় যুদ্ধের পরেও মিলিটারি ওকে কাজে জুড়ে রাখবে।

ওকে জিগ্যেস কর, হিটলারের হেড কোয়ার্টারে গিয়েছিল কিনা।

ওখানে তোমার কেমন লেগেছিল কাকু?

দেখতে পাচ্ছিস না, ও কাকু নয়, ও একজন সারজেন্ট।

তোমার একটা ছবি আছে?

আমরা তোমার একটা ছবি আমাদের কাছে রাখতে চাই।

তোমার আর কদ্দিন ছুটি আছে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তুমি কবে আবার কাজে বেরোচ্ছ?

কালকে তুমি কি আবার এখানে একবার আসবে?

কালকে তুমি কখন এখানে আবার আসবে?

মালকের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা! কাঁধের ভারী ঝোলানো ব্যাগটি নিয়ে সে হোঁচট খেতে থাকল। আমার ফাউন্টেন পেনটি পড়ে রইল বাস স্টপেজে। আমরা প্রাণপণে মারলাম এক ম্যারাথন দৌড়। রেহাই পাওয়া গেল!

রাস্তায় জমা বৃষ্টির জলের ওপর দিয়ে দু'জনের পাশাপাশি দৌড়। বৃষ্টি আমাদের আবার এক করে দিল।

বাচ্চাগুলিও আমাদের পিছন পিছন দৌড়োতে লাগল। বেশ কিছুটা দৌড়োনোর পরে, স্পোর্ট সেন্টারের কাছে এসে তারা থামল। কিন্তু তাতেও রক্ষে নেই। চিৎকার করে তারা জানাল যে, তাদের আজ স্কুলে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। আজকেই তারা আমার ফাউন্টেন পেনটি আমাকে ফেরত দিতে চায়।

অনেকটা রাস্তা জোরে দৌড়োনোর পর, একটি মাঠের কাঁটাওলা ঘাসের ওপরে দাঁড়িয়ে, ভাল করে নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিতে থাকলাম। সারা শরীর রাগে জ্বলছিল, রাগটা অবশ্যই ওই নাছোড়বান্দা বাচ্চাগুলোকে নিয়েই। রাগের চোটে আমি আমার একটি হাতের আঙুল দিয়ে, মালকের গলায় ঝুলোনো লজেন্সের হারটি চেপে ধরলাম। মালকে তাড়াতাড়ি ওটি গলা থেকে সরিয়ে নিল।

মালকের গলাতে বেশ কয়েক বছর আগে, এরকম ভাবেই একটা স্ক্রুড্রাইভার ঝুলত। তখন সেটি ছিল একটি জুতোর ফিতে দিয়ে বাঁধা। সে আমাকে সেটি দিতে চেয়েছিল। আমি মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানিয়ে বলেছিলাম, কোনও কিছু না দেওয়ার জন্যে তোকে অনেক ধন্যবাদ।

সে কিন্তু তার ওই লোহার যন্ত্রটি কোনওমতেই ফেলে দেয়নি, তার প্যান্টের পেছনে একটা পকেটে ছিল।

আমি এখন এখান থেকে কী করে বেরোতে পারি? সামনের নিচু বেড়ার ঠিক পিছনের কাঁটা ভরতি গুসবেরি গাছের ফলগুলি তখনও পাকেনি। মালকে সেগুলিই দু'হাত দিয়ে ছিঁড়তে শুরু করে দিল। আমার প্রতিবাদ কোনও ভাষা খুঁজে পেল না। সে ফলগুলি গোগ্রাসে মুখে পুরে চিবোতে লাগল আর থুথু ফেলতে লাগল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা কর, আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি। আমাকে অবশ্যই কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে আমাদের এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হবে না।

আর যদি মালকে বলত, তোকে কিন্তু আবার ফিরে আসতে হবে। তা হলে আমি হয়তো স্বস্তি পেতাম। কিন্তু আমার যাওয়ার সময়ে সে কোনও নড়াচড়াই করল না। ফলগাছের ঝোপঝাড় থেকে, সে তার ফল চিবোতে থাকা মুখটি ওপরে তুলল, আর দু'হাতের দশটি আঙুল দিয়ে, ইশারা করে আমাকে যেতে বারণ করল। বৃষ্টি আমাদের আবার এক করে ফেলল।

মালকের পিসিমা দরজা খুললেন। ভাল যে মালকের মা বাড়িতে ছিলেন না। আমি আমাদের বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু মনে হল, তার মা-পিসিমা রয়েছেন কীসের জন্যে? তাদের ঘরে কি সত্যিই কোনও খাদ্য নেই?

হয়তো কিছু খাবার পাওয়া যাবে, এই ভেবে আমি পিসিমার সম্বন্ধে কিছুটা কৌতূহলী ছিলাম। আমাকে নিরাশ হতে হল। তিনি তাঁর রান্না করার অ্যাপ্রন পরে দাঁড়িয়ে, মুখে কোনও কথা নেই। কিন্তু, রান্নাঘরের খোলা দরজা থেকে কিছু একটা খাবারের গন্ধ আসতে থাকল। মালকেদের বাড়িতে রাবাবা-শাক সেদ্ধ করা হয়েছে।

পিসিমা বললেন, আমরা আজ ইঅখীমের জন্যে একটা ছোট পার্টি দিচ্ছি। পানীয় আছে ঘরে অনেক রকমের, কিন্তু পরে যদি আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ি, তাই—।

আর কোনও কথা না বলে, তিনি রান্নাঘর থেকে, দু'কিলো ওজনের দুটো টিন ভরা মাংস নিয়ে এলেন। আর টিন খোলার যন্ত্রটিও আনতে ভুললেন না। কিন্তু এটা মোটেই মালকের সেই যন্ত্রটি ছিল না, যেটি মালকে ব্যাঙের মাংসের কৌটো কাটার জন্যে একদা ব্যবহার করেছিল।

পিসি রান্নাঘরের এদিক-ওদিক ঘুরে আমার জন্যে হয়তো কিছু খাবার খুঁজছিলেন, যদিও তাঁর রান্নাঘরের আলমারিটি নানান জিনিসে বোঝাই ছিল, গ্রামের আত্মীয়দের পাঠানো অনেক রকমের খাদ্যদ্রব্যে। শুধু কিছু একটা খুঁজে বার করলেই হল। কিন্তু তা তিনি আর করে উঠতে পারলেন না।

আমি অস্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবি দেখছিলাম। ছবিটিতে মালকের বাবা ও তাঁর বন্ধু লাবুডা, একটি লোকোমোটিভ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়িয়ে। ইঞ্জিন থেকে কোনও ধোঁয়া উঠছে না।

পিসি এবার একটি কেনাকাটা করার জালের ব্যাগ ও কিছু খবরের কাগজ হাতে নিয়ে এলেন, আমাকে উদ্দেশ করে বললেন: টিনের শুয়োরের মাংস খাওয়ার আগে, সেটাকে ভাল করে গরম করে নেওয়া দরকার। আর যদি না করা হয়, তবে তা পাকস্থলীর পক্ষে বেশ ভারী হবে, হজম করাও কঠিন হয়ে পড়বে। আমি যদি তাদের বাড়ি ছাড়ার আগে নিজেকে একবার প্রশ্ন করতাম যে, ওখানে এমন কারও সঙ্গে বন্ধু ইঅখীমের সম্বন্ধে কিছু বলা যায় কি না? তা হলে উত্তর হত না। আমি কাউকেই কিছু জিগ্যেস করলাম না, যাওয়ার আগে দরজার সামনে থেকে বললাম, বন্ধু ইঅখীমের জন্যে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

মালকে বন্ধু ইঅখীম-কে কিংবা তার নিজের মাকে, কাউকেই কোনও শুভেচ্ছা টুভেচ্ছা জানাল না।

এরপরে, আমি যখন আবার এক বৃষ্টির মাঝে বাগানে এসে, জালের ব্যাগটি বাগানের বেড়াতে ঝুলিয়ে দিয়ে, ঠান্ডায় অবশ হয়ে যাওয়া আমার হাতদুটি ঘষে গরম করার চেষ্টা করছিলাম, তখন মালকে এসব ব্যাপারে কোনও ভ্রুক্ষেপ করল না। আর করল ঠিক তার উলটো কাজটা: আগের বারের মতোই সে বাগানে দাঁড়িয়ে কাঁচা গুসবেরি খেতে থাকল। আর তার পিসির মতোই, আমাকে সে বাধ্য করতে চেষ্টা করল, তার শারীরিক মঙ্গল কামনা করতে।

রেগে গিয়ে আমি তাকে বললাম, তুই তোর পেটের বারোটা বাজাচ্ছিস! এবার শেষ কর তোর ওই খাওয়ার পালা, চল এখন যাওয়া যাক! এসব শোনার পরেও সে, বাগান থেকে বেশ কিছু কাঁটাওলা গাছগাছালি, কোনও কারণে, তার প্যান্টের পিছনের পকেটে ভরে নিল।

হাঁটা শুরু করে, আমরা যখন ভোলফভেগ ও ব্যেয়ারেনভেগ নামক দুটি অঞ্চলের মধ্যবর্তী কলোনিটি পেরিয়ে একটা বাঁকা পথ ধরলাম, তখনও মালকে তার মুখের কাঁচা গুসবেরি ফলগুলি চিবোচ্ছিল আর মাঝে মাঝে থুথু ফেলছিল। তারপরে আমরা এসে ট্রাম স্টপেজে পৌঁছলাম।

বৃষ্টিভেজা মিলিটারি এয়ারপোর্টের ল্যান্ডিং অঞ্চলটাকে বাঁদিকে রেখে আমরা ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মালকে তখনও পর্যন্ত তার ফল খাওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

তার ওই গুসবেরি খাওয়ার ব্যাপারটা আমাকে নার্ভাস করে তুলল, আর সেই সঙ্গে বৃষ্টি এসেও ঝামেলা বাঁধাল। পরে বৃষ্টিটা একটু ধরল, আকাশের রং কালো থেকে কিছুটা সাদা হয়ে এল। ইচ্ছে হল, তাকে তার গুসবেরী খাওয়ায় ব্যস্ত রেখে সেখান থেকে কেটে পড়তে। তবুও আমি তাকে বললাম, তোর বাড়ি থেকে দু'-দু'বার লোক এসে তোর কথা জানতে চেয়েছে, সিভিল ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক।

আচ্ছা তাই বুঝি। এই বলে মালকে মাটিতে থুথু ফেলতে ফেলতে আমাকে আবার জিগ্যেস করল, আর আমার মা? তিনি কি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন?

বাড়িতে তোর মা ছিলেন না, শুধু তোর পিসি ছিলেন।

মা বোধহয় কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলেন।

আমার মনে হয় না।

তা হলে তিনি মনে হয়, জামাকাপড় ইস্ত্রি করার কাজে প্রতিবেশী শ্যিলকেদের বাড়ি গিয়েছেন।

কিন্তু, দুঃখের কথা হল যে, তিনি সেখানেও যাননি।

তুই কি কয়েকটা গুসব্যেরি ফল খেতে চাস?

তোর মাকে গাড়ি করে মিলিটারি ডিসট্রিক্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ কথাটা আসলে আমি তোকে বলতে চাইনি।

ব্রোয়েসেল অঞ্চলে পৌঁছোনোর একটু আগেই মালকের গুসবেরি ফলের সঞ্চয় শেষ হতে চলল। এরপরে, বৃষ্টির জলে ভেজা একটা বিচের বালির ওপর দিয়ে হাঁটার সময়ে লক্ষ করলাম, মালকে তার সপসপে ভেজা প্যান্টের পকেট থেকে, আরও গুসবেরি ফল খুঁজছে।

এবার আমাদের গ্রেট মালকে যখন নিজের কানে শুনল, সমুদ্রের ঢেউ কী দাপটের সঙ্গে গর্জন করে তীরে আছড়ে পড়ছে, নিজের চোখে দেখল পূর্ব সমুদ্রের জলে, কীভাবে বিশাল আকারের ঢেউয়ের স্রোত বয়ে চলেছে। সে আরও দেখতে পেল, কিছুটা দূরে একটা বজরা নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আর তার অনেক পিছনে, দিগন্তের কাছাকাছি, কয়েকটি বিশাল আকারের জাহাজের ছায়া। এইসব দেখেশুনে সে বলল, নাঃ, আমি সাঁতার কাটতে পারব না।

অথচ আমি ইতিমধ্যে, আমার জুতো খুলে ও প্যান্ট পালটে সাঁতারের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জন্যে তৈরি হয়েছি। তার দুই চোখের তারায় দেখতে পেলাম, বিশাল দিগন্তের এক প্রতিচ্ছবি। হয়তো সে একটু ভীত হয়ে পড়েছে।

তাকে বললাম, ভয়ডর ছাড়! এখন কি তামাশা করার সময়?

সে জবাব দিল, না তামাশা মোটেই নয়, আমার পক্ষে সাঁতার কাটা সম্ভব নয়। আমার পেট ব্যথা করছে, ওই গুসবেরি ফলগুলোই যত নষ্টের গোড়া!

তার এই উত্তর শুনে আমি অন্য কিছু করা মনস্থ করে ফেললাম। জ্যাকেটের পকেটে খোঁজাখুঁজি করে একটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা পেলাম। সেই নিয়ে বৃদ্ধ ক্রেফটের কাছে গিয়ে, তাঁর কাছ থেকে দু'ঘণ্টার জন্যে ভাড়া করলাম একটা নৌকো। এসব করাটা যত সহজ মনে হয় তত সহজ ছিল না। নৌকোর মালিক বৃদ্ধ ক্রেফট বেশি কথা না বলে, আমাকে নৌকোটি ঠিকঠাক তৈরি করে জলে নামাতে সাহায্য করলেন। আর আমি যখন নৌকোটি তীর থেকে জলে নামিয়ে, চালানোর জন্যে তৈরি হলাম, সেই সময়ে দেখতে পেলাম, মালকে তার ইউনিফর্ম পরা অবস্থাতে তীরের বালিতে শুয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

তাকে বালির চর থেকে ওঠার জন্যে, আমাকে পা দিয়ে তার গায়ে ধাক্কা মারতে হল। দেখলাম, তার শরীর কিন্তু কাঁপছিল, গায়ে ও কপালে ঝরছিল ঘাম, দু' হাত পেটের কাছে রেখে ছটফট করছিল সে। খালি পেটে ফল খাওয়ার জন্যে তার এই যন্ত্রণার ব্যাপারটি আজ পর্যন্ত আমি কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি।

অগত্যা তাকে বলতে হল, এভাবে পড়ে থেকে লাভ আছে কোনও? বালিয়াড়ির পেছনে একবার যাচ্ছিস না কেন? উঠে যা একবার পেছনে। দেখ বমি হয় কিনা! সে মুচড়ে পড়া বাঁকা শরীর নিয়ে, লটকাতে লটকাতে পিছনের দিকে চলতে লাগল।

হয়তো চেষ্টা করলে আমি তার মাথার টুপিটা দেখতে পেতাম, কিন্তু আমি তা আর করলাম না। আমাকে লক্ষ রাখতে হল জলের দিকে, সেখানে কোনও কিছু আসা- যাওয়া করছে না। মালকে যখন ফিরে এল, তখনও তার শরীরটা বেশ দুর্বল দেখাচ্ছিল। কিন্তু তবুও সে আমাকে আমাদের নৌকোটি ঠেলে তোলার কাজে সাহায্য করল।

আমি তাকে নৌকোর পাটাতনে বসালাম। তারপরে জালের মধ্যে টিনের কৌটোগুলি ঢুকিয়ে, তার হাঁটুর তলায় রাখলাম। আর সবশেষে কৌটো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
খোলার যন্ত্রটি, খবরের কাগজে মুড়ে, তার হাতে দিলাম।

এরপরে বালি মেশা কাদাটে ঘন জল বড় বড় ফুটোগুলি দিয়ে নৌকোর মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করল। নৌকো সহজে আর চলল না। তখন আমি মালকেকে বললাম, এবার তুই কয়েকবার হাল টেনে আমাকে সাহায্য করতে পারিস।

গ্রেট মালকে মাথা নেড়ে কোনওরকম সম্মতি জানাল না। বাঁকাচোরা হয়ে বসে, হাত দিয়ে কাগজে মোড়া টিন খোলার যন্ত্রটিকে চেপে ধরে, চেয়ে রইল আমার দিকে। নৌকোর ওপরে আমরা মুখোমুখি হয়ে বসে ছিলাম।

এরপরে, যদিও আমি আজ পর্যন্ত কোনও বাইচ নৌকোতে আর বসিনি, তথাপি সবসময়ে ও এখনও পর্যন্ত বসে আছি পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে। আর তার অবস্থাটি হল:

হাতের আঙুলগুলি অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে,

গলা খালি, কিছুই ঝুলছে না,

চরের বালি উড়ে এসে, পাউডারের গুঁড়োর মতো তার ইউনিফর্মটাকে ঢাকা দিয়ে ফেলেছে, কোনও বৃষ্টি নেই, অথচ কপাল থেকে ঝরছে জল,

শরীরের সব পেশিগুলি হয়ে উঠেছে কঠিন,

চোখগুলি কোটর থেকে বেরিয়ে আসার মতো,

তার নাকটাকে চেনাই যাচ্ছে না, কার সঙ্গে ওটি সে পালটে নিয়েছে?

নদীর ধারে কোনও বেড়ালের চিহ্ন নেই, ইঁদুর পলাতক।

সে সময়ে কিন্তু তেমন ঠান্ডা ছিল না। আকাশের মেঘ যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছিল, তখন তার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে, জলের তৈলাক্ত ফেনাগুলির ওপরে পড়ছিল, আর জল ও ফেনা একসঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে এসে আমাদের নৌকোতে ধাক্কা মারতে লাগল। মালকেকে বললাম, দু'-চারবার জোরে হালটা টান, এতে তোর শরীরটাও একটু গরম হবে।

নৌকোর কাঠের পাটাতন ও হাল টানা, এই দুই জিনিসের মিশ্রিত এক ক্যাঁচক্যোঁচ ও গোঙানির আওয়াজ, বিশ্বের সব সেরা সেরা প্রশ্নের জবাব দিতে থাকল।

...সব কিছু থেকেই আমি অনেক পেয়েছি, হয়তো কেউ আগেই এসব বুঝে থাকবে। ওই পাগলামির জন্যে এত হইচই..., সত্যিই খুব খারাপ! এটা একটা নিশ্চয়ই সুন্দর বক্তৃতা হতে পারত, যদি এর মধ্যে মেবাখ-ইঞ্জিন কিংবা শক্তিশালী গ্রেনেড প্রভৃতির ওপরে একটি নিখুঁত বিবরণ থাকত!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মিলিটারিতে আমার কাজ ছিল, সারা সময় ধরে কামান নিক্ষেপ করার যন্ত্রের নাট-বল্টু এঁটে দেওয়া, মাঝে মাঝে এমনকী কামান চলার সময়েও এ কাজ করতে হত। তা সত্ত্বেও আমি কোনও সময়ে নিজের স্বার্থের জন্যে কথা বলিনি।

হয়তো বলার ছিল: আমার বাবা ও তাঁর বন্ধু লাবুডার সম্বন্ধে, যাঁরা দু'জনে একসঙ্গে, একই ফিল্ডে যুদ্ধে রত ছিলেন। ডিরসাও অঞ্চলের দুর্ঘটনা নিয়ে দু'-চার কথা, আমার বাবার— সাহস ও আত্মত্যাগের কথা— নিবন্ধ লেখার সময়ে আমার বাবার কথা ভাবতে থাকা— তাঁর যুদ্ধে আহত হয়ে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকার কথা, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

আর সেই সময়ে, উপাসনার বাতি সংগ্রহ করার জন্যে তোকে ধন্যবাদ জানাই, পিলেন্স।

—হে, তুমি পবিত্র বাতির আলো—তুমি মাতার মাতা!—তুমি প্রেমময়! ক্ষমাময়, করুণাময় প্রাণের সখা!

এইসব পবিত্র ব্যাপারস্যাপার আমাকে নিয়ে এল পোল্যান্ডের কুরস্ক নামে একটি স্থানে, আরম্ভ হল আমার সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রথম দিন:—একেবারে যুদ্ধের ডামাডোলের মাঝখানে, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের সওয়াল-জবাবের মধ্যে।

আর পরে, আগস্ট মাসে ফোরসক্লা অঞ্চলে যাওয়া। দলের সবাই হাসতে শুরু করে দিয়ে ডিভিশন-ম্যানেজারকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। তারপরে কিন্তু আমরা পুরো ফ্রন্টকে চাঙ্গা করে ফেললাম।

দুঃখের বিষয়, আমি হঠাৎ সেন্টার সেকটারে বদলি হয়ে গেলাম, নাহলে এ বাহিনীটি এত তাড়াতাড়ি ভেঙে ফেলা হত না। পরে, কোরোসটেন নামে একটি জায়গাতে, যখন আমরা ৫৯-তম বাহিনীতে যুক্ত, সেই সময়ে সে এসে দেখা দিল। তাঁর কোনও সন্তান ছিল না, ছিল শুধু একটি ছবি, যেটি তিনি সর্বদাই হাতে ধরে রাখতেন। হ্যাঁ, এটি ছিল ডক্টর ক্লোশ্যের ছবি, এ ছবিটি আমাদের স্কুলের করিডোরের দেওয়ালে ঝোলানো থাকত।

তিনি ছবিটি কিন্তু বুকের ওপরে ধরে রাখেননি, তার অনেক নীচে। ওই ছবিটির মধ্যে আমি লোকোমোটিভ ইঞ্জিনটি দিনের আলোর মতো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ছবিটা ধরার সময়ে আমি হাতদুটি আমার বাবা ও তাঁর বন্ধু লাবুডা-র ঠিক মাঝখানে রেখেছিলাম।

পিলেন্স, তুই ছবিটা ভালভাবে দেখ। দেখতে পাচ্ছিস! চারশো গুলি— সরাসরি বুকের ওপরে—। আমি চোখ রেখেছিলাম, জাহাজের ওপর থেকে বয়লারের মাঝখানের অংশটির ওপরে।

না, ডক্টর ক্লোশ্যের সঙ্গে, তিনি কোনও কথা বলেননি। আর সত্যি কথা বলতে কী, চাইতেন, তবে তাঁর ক্লোশ্যের সঙ্গে কথা বলার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। প্রমাণ?

আমি আবার বলি, তিনি ছবিটা ধরে রেখেছিলেন।

আর এখন মালকে, তোমাকে বলি, যদি তুমি অঙ্কের শিক্ষক হও, তবে একটা অঙ্কের বই ধরে রাখতে হবে। যদি তুমি অনুমান করো যে, দুটি সমান্তরাল রেখা কোনও এক সীমাহীন প্রান্তে মিলিত হতে পারে, তখন তোমাকে সেটি একটা অবিশ্বাস্য ব্যতিক্রম হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। আর ওই সময়ে, ঠিক সেইরকমই অবস্থা ছিল ইউক্রেনের খাসাটিন নামক স্থানের যুদ্ধক্ষেত্রে।

সেটা ছিল ক্রিসমাসের তৃতীয় দিন। তার গাড়িটি একটু বাঁদিক ঘুরে, কিছুটা জঙ্গলের দিক হয়ে, পঁচিশ মাইল গতিতে চলতে থাকল। তাকে আমার ভালভাবে নজরে রাখতে হল।

এই পিলেন্স, বাঁদিকে তোকে দুটো স্ট্রোক মেরে নৌকোটাকে সোজা নিয়ে যেতে হবে, নাহলে আমরা জাহাজের থেকে সরে যাব।

প্রথমদিকে, নৌকা চলার শব্দটি, দাঁত চেপে বক্তৃতা দেওয়ার আওয়াজের মতো শোনাচ্ছিল। পরে কিন্তু আস্তে আস্তে দাঁড় টানার কাজটি সে আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলল আর আমাদের গন্তব্যের দিকে ভালভাবেই নজর রাখতে লাগল। তার দ্রুত কথা বলার গতির সঙ্গে তালে তাল রেখে নৌকো চালাতে গিয়ে আমার অবস্থা হল কাহিল! আমার কপালে রীতিমতো ঘাম ঝরতে থাকল। নৌকোর দাঁড় টানার সময়ে, আমি কোনওমতেই নিশ্চিত হতে পারিনি এই ভেবে যে, মালকে ওই বিরাট সেতুটির ওপরে থাকা গাংচিলগুলি ছাড়া বেশি কিছু দেখতে পেয়েছে কিনা।

আমরা ডকে পৌঁছনোর আগেই, মালকে আরাম করে নৌকোর পাটাতনের ওপরে বসে, তার পেটের যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে, কৌটো খোলার যন্ত্রটি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নিয়ে খেলা শুরু করে দিল। এর পরে, ডকেতে আসার পর, আমি যখন আমাদের নৌকোটিকে বাঁধলাম, তখন সে আমার সামনে উঠে দাঁড়িয়ে, দু'হাত দিয়ে, তার গলায় ঝোলানো জিনিসগুলি গোছগাছ করতে থাকল।

এদিকে সূর্যের তপ্ত রোদ ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। মালকে প্যান্টের পিছনের পকেট থেকে তার প্রিয় লজেন্সের মালাটি বার করে, তার গলার সঠিক জায়গাতে ঝুলিয়ে নিল। হাতদুটি পরস্পর ঘষে একটু গরম করে নিয়ে, শরীর ও পা বেঁকিয়েচুরিয়ে নিয়ে, একটু ব্যায়াম করে নিল।

তারপর একজন মালিকের মতো মনোভাব নিয়ে, সে ডেকের ওপরে উঠল। গুনগুন করে গান করে, ওপরে উড়ন্ত গাংচিলদের একটু বিরক্ত করে, একজন মজাদার কাকাবাবুর মতো কিছু একটা খেলা করতে আরম্ভ করে দিল। একজন কাকাবাবু, যিনি বহুদিনের অনুপস্থিতির পরে, এক দুঃসাহসিক অভিযানের শেষে দেশে ফিরে এসে, নিজেকেই এক উপহার হিসেবে খাড়া করে, সবাইকে নিয়ে এক আনন্দোৎসব পালন করতে চান।

মালকে: আমার প্রিয় বাচ্চারা, তোমাদের দেখছি একটুও পরিবর্তন হয়নি।

আমার পক্ষে এই খেলায় যোগ দেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল।

মালকে: এসো, এবার আমরা খেলা আরম্ভ করি।

নৌকোর মালিক ক্রেফট মশাইকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে, আমি নৌকোটা দেড় ঘণ্টার জন্যে ভাড়া নিয়েছি, প্রথমে তিনি মাত্র একঘণ্টার জন্যে দিতে চেয়েছিলেন! এসো, আমরা আর দেরি করব না।

মালকে কণ্ঠস্বর একটু সংযত করে তাদের বলল, ঠিক আছে, একজন যাত্রীকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা ঠিক নয়। তোমরা তো ওখানে একটা নৌকো দেখতে পাচ্ছ, তাই না? হ্যাঁ, ট্যাংকারের ঠিক পাশেই রয়েছে ওটা, আসলে ডুবে আছে কিন্তু জলের বেশ গভীরেই। আমি বাজি ধরে বলতে পারি যে, ওটি সুইডেনের একটি নৌকো। আর তোমাদের এও জানিয়ে রাখি, আমরা আজকেই, সন্ধের অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে হাজির হতে চাই, রাত ন'টার মধ্যেই ওখানে থেকে আবার ফিরে আসতে চাই। আমি তো তোমাদের কাছে এটুকু দাবি করতে পারি, তাই না?

এই অন্ধকারের মধ্যে, নৌকোটি কোন দেশের, তা খুঁড়ে উদ্ধার করা আমাদের কাছে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। এ ছাড়া, মালকে তার পোশাক পালটাতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অনেকটা সময় নিয়ে নিল। আর তার মাঝখানে সে, কিছু অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে অসংলগ্নভাবে কথাবার্তা শুরু করল। যেমন,

টুলার ওপরে তার ছোট্ট মন্তব্য: একটা দুশ্চরিত্রা মেয়ে, আমি হলফ করে বলতে পারি।

মহামান্য গুসেভস্কির বিষয়ে পরচর্চা: লোকে বলে, তিনি বেশ কিছু জিনিস কালোবাজারে বিক্রি করে থাকবেন, গির্জার কাপড়চোপড় ও পাদ্রিদের পোশাক পরিচ্ছদও সরিয়ে ফেলে থাকবেন।

তার পিসির ওপরে কিছু মজাদার কথা: একটা ব্যাপারে তাঁকে প্রশংসা করতেই হবে। তা হল— তিনি সবসময়েই আমার বাবা সঙ্গে থাকতেন আর তাঁকে ভালভাবে বুঝতেও পেরেছিলেন। এমনকী তাঁরা যখন শিশু বয়সে গ্রামে বাস করতেন, তখন থেকেই।

লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের সম্বন্ধে কথা: তুই একবার আমাদের বাড়িতে গিয়ে, ফ্রেমসুদ্ধ অথবা ফ্রেম ছাড়াই আমার জন্যে ওটা নিয়ে আসতে পারিস। নাঃ, থাক, প্রয়োজন নেই, ওটাকে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখাই ভাল। আনলেই আর এক বোঝা হয়ে উঠবে।

মালকে দাঁড়িয়েছিল তার লাল রঙের জিমনাসটিক করার প্যান্টটি পরে। ওই লাল প্যান্টগুলি বরাবর আমাদের স্কুলের প্রায় একটা ঐতিহ্যের ধারক বলা যায়।

মালকে তার ইউনিফর্মটি বেশ যত্নে ভাঁজ করে, মিলিটারির নিয়ম মাফিক প্যাকেটের মধ্যে পুরে, পাইলট হাউসের পিছনের সঠিক জায়গাতে রেখে দিল। তার বুটজুতো জানিয়ে দিল যে, তার যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। তাকে জিগ্যেস করলাম, সব কিছু ঠিকমতো নিয়েছিস তো? আর হ্যাঁ, টিনের কৌটো খোলার যন্ত্রটা যেন ভুলে যাসনি!

সে তার জামায় ঝোলানো মেডেলটি, বাঁদিক থেকে সরিয়ে ডান দিকে নিল, আর স্কুলের ছাত্রের মতো শিশুসুলভ কিছু হালকা প্রশ্ন করা আরম্ভ করল: আরজেন্টেনিয়ার যুদ্ধজাহাজ মোরেনো-র ওজন আর গতি কত ছিল?—জলেতে এটির প্রতিরক্ষা করার ক্ষমতা কত ছিল?— তৈরি হয়েছিল কোন সালে?— পরে কি সেটিকে মেরামত করে কিছু পালটানো হয়েছিল?— যুদ্ধজাহাজ ভিট্টোরিও ভেনেটো-র মধ্যে কতগুলি ১৫০ মিলিমিটার কামান লাগানো ছিল?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এইসব প্রশ্নের অলসভাবে জবাব দিতে দিতে, আমার এই ভেবে আনন্দ হল যে, এসব জিনিস নিয়ে ভাবার ইচ্ছে আমারও এখনও কিছুটা আছে।

তাকে জিগ্যেস করলাম: তুই কি দুটো মাংস ভরা টিনের কৌটো একবারেই নিয়ে যেতে চাস?

মালকে: ঠিক জানি না, দেখা যাক, কী করা যায়।

আমি: কৌটো খোলার যন্ত্রটা যেন ভুলে না যাস, ওটা রয়েছে এইখানে।

মালকে: তুই দেখছি আমাকে নিয়ে, আমার মা'র মতোই ভাবতে শুরু করেছিস!

আমি: আমি তোর জায়গায় হলে, আস্তে আস্তে নীচের বেসমেন্টে যাওয়া শুরু করতাম।

মালকে: ঠিকই বলেছিস, বেসমেন্টের অবস্থাটা নিশ্চয়ই বেশ খারাপ, পরিষ্কার করা দরকার।

আমি: সারা শীতকালটা তোর তো ওখানে কাটানোর কোনও দরকার নেই।

মালকে: আসল কাজের কথা হল যে, লাইটারটা এখনও কাজ করছে, আর নীচে যথেষ্ট স্পিরিট মজুত আছে।

আমি: আমি কিন্তু কোনওমতেই ওই জিনিসটি ফেলে দেওয়ার পক্ষে নয়, তুই তো ওটা পরে সুভেনিয়ার হিসেবে ভাল দামে বিক্রি করতে পারিস। আমরা তো অনেক সময়ে জানি না কখন কোন জিনিসের দাম ওঠে আর নামে।

মালকে জিনিসটি নিয়ে লোফালুফি খেলতে শুরু করল।

এরপরে সে যখন সেতুটির ওপরে আলগা করে পা ফেলে এগোতে থাকল খুব সাবধানে, একসঙ্গে ধরে রাখা দুটি টিনের পাত্র, তার ডান হাতের জালের থলিটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল আর পা দুটিও হয়ে গিয়েছিল বাঁকাচোরা। আর এর মধ্যে, হঠাৎ একবার সূর্যের আলো এসে, মাটির ওপরে তার শরীরের বাঁকা মেরুদণ্ড ও লম্বা গলার, একটি দীর্ঘ ছায়া রচনা করল।

মালকের কথা:

এখন নিশ্চয়ই সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে, কিংবা হয়তো এগারোটাও হতে পারে।

যতটা ভেবেছিলাম, এখন কিন্তু ততটা ঠান্ডা নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বৃষ্টির পরে সব সময়েই এরকম অবস্থা হয়।

আমার মনে হচ্ছে জলের তাপমাত্রা সতেরো আর হাওয়ার উনিশ ডিগ্রি মতো হবে।

বন্দরের প্রবেশপথের কাছেই একটি মাটি খনন করার ড্রেজার দাঁড়িয়ে ছিল। দেখে মনে হয় এটির ভিতরে কাজকর্মও চলছিল। কিন্তু সেখান থেকে আসা আওয়াজটি শুধুমাত্র কল্পনাই, অর্থাৎ, ড্রেজারটির নয়। এটি ছিল আসলে ড্রেজারের ওপরে জোর হাওয়ার ধাক্কা লাগার আওয়াজ। আর মালকের গলার ইঁদুরটিও ছিল তেমনই এক কল্পনামাত্র। কারণ, সে যখন পা দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে দরজার ফাঁকটা খুঁজে পেল, তখন তার পিছনের পিঠটিই দেখা যাচ্ছিল, গলার নলিটি নয়।

কিছু গতানুগতিক প্রশ্ন ক্রমাগত আমার কানের মধ্যে ঢুকে বসেছিল। যেমন, জলের তলায় যাওয়ার আগে মালকে কি আমাকে কিছু বলেছিল? আমি তাকে যতটুকু লক্ষ করতে পেরেছি, তা হল, বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে কোনাকুনিভাবে তার সেতুর ওপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। সেটাও কি ঠিক?

অল্প কিছুক্ষণ বসে, নিজেকে সে জল দিয়ে পরিষ্কার করে নিল। লাল রঙের জিমনাসটিক করার প্যান্টের রং আরও গাঢ় করে ফেলল। ডান হাতের মুঠো দিয়ে, দুটি টিনের পাত্র ও জালের থলিটি জোরে চেপে ধরল।

কিন্তু লজেন্সের মালাটি গেল কোথায়? গলায় তো ঝুলছে না! তবে কি সে, সবার অজান্তে সেটি জলে ফেলে দিয়েছে? আর সেই মাছটিই বা এখন কোথায়, যে তাকে বা আমাকে ওই লজেন্সের মালাটি আবার জল থেকে ফিরিয়ে এনে দেবে? সে কি তার শরীর সম্বন্ধে কোনও কথা বলেছিল? কিংবা উড়ন্ত গাংচিলদের নিয়ে?

মনে হয় না আমি তাকে বলতে শুনেছি, ঠিক আছে, আজ সন্ধেতে আবার দেখা হবে।

মাথা সোজা করে সামনে রেখে, শুয়োরের মাংস ভরতি টিনের কৌটো দুটি হাতে নিয়ে, ডুব মারল সে জলে। গোলাকার পিঠ, কঠিন কাঁধ ও নিতম্ব, সবকিছু ডুবন্ত মাথাটির নির্দেশ মেনে, জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুটি সাদা পা জল থেকে একবার মাত্র ওপরে উঁকি মারল, জাহাজের ওপরের জল, যথারীতি ঢেউ খেলে চলল।

আমি নিজের পাদুটি ক্যান-ওপেনার থেকে সরিয়ে নিয়ে, কিছুটা পিছিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সরে এলাম। শুধু আমি যদি তক্ষুনিই নৌকোতে হাজির হয়ে শেকলটা খুলে দিতাম, তা হলেই সব ঠিকঠাক চলত। মনে মনে বললাম, দুর ছাই! কিছু করার দরকার নেই, ও একা থেকেই সব ঠিক করে নেবে। আমি দাঁড়িয়ে থেকে সময় গুনতে থাকলাম। ড্রেজার যন্ত্রটির চেন গোটানো ও ছাড়ার সময় গোনার কাজটি, ওই যন্ত্রটির ওপরেই ছেড়ে দিলাম।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ওই যন্ত্রটির সেকেন্ড মেপে কাজ করার ব্যাপার, ভালভাবে লক্ষ করতে থাকলাম।

বত্রিশ— তেত্রিশ— চৌত্রিশ সেকেন্ড: ময়লা সৃষ্টি করল।

ছত্রিশ— সাঁইত্রিশ সেকেন্ড: মাটি কাটার কাজ সারল।

একচল্লিশ— বেয়াল্লিশ সেকেন্ড: তেলবিহীন মরচে পড়া যন্ত্র থেকে কর্কশ আওয়াজ শুরু হল।

সাতচল্লিশ— আটচল্লিশ— উনপঞ্চাশ সেকেন্ড: ড্রেজার আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল।

এর পরে, যন্ত্রটি ক্রমাগত ওঠানামা করে, জলের তলা থেকে মাটি কেটে, জাহাজ ঢোকার প্রবেশপথটি প্রয়োজনমতো গভীর করতে লাগল। তার ফলে ড্রেজার যন্ত্রটির কাজ করার নিয়মটিও আমি সঠিকভাবে বুঝে নিতে পারলাম।

মালকে এক হাতে ধরে আছে মাংস ভরা টিনের কৌটো, ওটি খোলার যন্ত্রটি কিন্তু নেই। আর অন্য হাতে ধরে আছে মিষ্টি লবনচুস, যেটি ইতিমধ্যে হয়তো তেতো হয়ে গিয়ে থাকবে। এই অবস্থাতে সে একটি পুরনো, রিবিটভা নামে পোলিশ মাইন সুইপারের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগল।

আমরা কোনও বিশেষ সিগনালের ব্যাবস্থা চালু করে উঠতে পারিনি, কিন্তু মালকের উচিত ছিল, একবার, দু'বার বা অনেকবার জোরে, কোনওভাবে আওয়াজ করে আমাকে সিগনাল দেওয়া। আমি তা হলে ড্রেজার যন্ত্রটিকে ত্রিশ সেকেন্ডের মতো চালাতে পারতাম। আসলে তার বিচক্ষণতার সঙ্গে কিছু একটা করা উচিত ছিল—।

আর ওই সময়ে, বজরার ওপরে নানান কায়দায় উড়তে থাকা সামুদ্রিক গাংচিলগুলির চিৎকারের আওয়াজ, আমাকে বেশ বিরক্ত করলেও ধীরে ধীরে আমার তা সহ্য হয়ে গিয়েছিল। এরপরে হঠাৎ, কোনও কিছু না বলেকয়ে আকাশ থেকে উধাও হয়ে গেল তারা! তাদের এই অনুপস্থিতিটিও পরে আমাকে বেশ কিছুটা একা করে ফেলল।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আর তারপরে, সেতুর ওপরে দাঁড়িয়ে, প্রথমে আমি আমার জুতোর হিল ও পরে মালকের বিরাট বুটজুতোটি, জল দিয়ে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলাম। প্রতিটি পায়ের ধাক্কায় জুতোর সোল থেকে দুর্গন্ধময় জমাট কাদা আর পাখিদের পায়খানা বেরোতে লাগল। পরে, আমি ওপরে গিয়ে, কৌটো খোলার যন্ত্রটি দেখতে পেলাম। সেটিকে শক্ত করে হাতে ধরে, মালকেকে দেখিয়ে, চিৎকার করে বললাম, মালকে, তুই এখনই চলে আয় ওপরে! তুই একটা পাগল, এই যন্ত্রটা ভুলে ওপরে ফেলে রেখে গেছিস আর তলায় ওটাকে গোরু খোঁজা খুঁজছিস!

হাতুড়ির আঘাতের তালে তাল মিলিয়ে, আমার এই চিৎকার কিছুক্ষণ চলার পর একটা বিরতি পড়ল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মোরশ্য গানের বাজনার তালের মাত্রাটা আমার জানা ছিল না। সে যাই হোক, আমি দুই-তিন-দুই মাত্রা লাগিয়ে, একটু সুর করে বলতে লাগলাম, ঢাকা-খোলার-যন্ত্র, ঢাকা-খোলার-যন্ত্র!

এর অনেক পরে, কোনও একটা শুক্রবারে, আমি জানতে পারলাম, আসলে কাকে নিস্তব্ধতা বা নীরবতা বলে। নীরবতা তখনই আসে, যখন গাংচিলেরা আমাদের অঞ্চল ছেড়ে অন্য কোথাও উড়ে চলে যায়, আর কর্মরত ড্রেজার যন্ত্রের ওপরে যখন হাওয়া গর্জন করতে করতে এসে ধাক্কা মারে, তখনই সৃষ্টি হয় আসল নীরবতা। আর আমার চিৎকার করা প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে, মালকেই শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করল সবথেকে গভীর নিস্তব্ধতা।

আমি দাঁড় টেনে ফিরে আসতে থাকলাম। কিন্তু তার আগে আমি ক্যান-ওপনারটা-টা ড্রেজারের দিকে ছুড়ে দিলাম। ওটা মালকের কাছে পৌঁছোয় না। এরপরে আমি সেটাকে সত্যিই জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, দাঁড় টেনে ফিরে এসে, বৃদ্ধ ফিশার ক্রেফট-কে তিরিশটা পয়সা বেশি দিয়ে, তাঁর নৌকোটি তাঁকে ফেরত দিলাম। আর বললাম, হয়তো আমি আজ সন্ধেতে আর একবার এসে নৌকোটি আবার ভাড়া নিতে পারি।

এর পরে আমি কিন্তু মোটেই আর বাড়ির দিকে গেলাম না। ওসটারসাইলে-তে মালকেদের বাড়িতে গিয়ে দরজায় বেল বাজালাম। কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে, আমি তাদের কাছ থেকে শুধু লোকোমোটিভের মডেল ও ছবির ফ্রেমটা চেয়ে নিলাম। আমি কি মালকেকে ও বৃদ্ধ ফিশার ক্রেফট-কে,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হয়তো রাতের দিকে আবার একবার আসতে পারি, এই ধরনের কোনও কথা বলেছিলাম?

তারপরে আমি যখন চৌকো মাপের ছবিটি হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম, মা তখন লাঞ্চ তৈরি করে ফেলেছেন। আমি আর আমার মা'র সঙ্গে রেলওয়ের একটি ফ্যাকট্রির একজন ম্যানেজারও খেলেন। মা মাংস বা মাছ রান্না করেননি। আমার খাবারের থালার পাশে, ডিস্ট্রিক্ট অফিস থেকে পাঠানো, আমাকে লেখা মিলিটারির একটি চিঠি রাখা ছিল।

মিলিটারির কাজে যোগ দেওয়ার এই নোটিশটি আমি বারবার পড়লাম। আমার মা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। ম্যানেজার মশাই মাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। আমি মাকে বললাম, এখনও সময় আছে, আগামী রবিবারের সন্ধের আগে আমি যাচ্ছি না।

এরপরে ওই ম্যানেজার ভদ্রলোকের দিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ না করে, মাকে জিগ্যেস করলাম, বাবার বাইনোকুলারটা কোথায় আছে তা কি তুমি জানো?

এবার ওই বাইনোকুলার, ছবি ও লোকোমোটিভের মডেলটি সুটকেসে বোঝাই করে, আমার গন্তব্যস্থল ব্রোসেনে-র দিকে রবিবার সন্ধেতে না গিয়ে, একদিন আগে, শনিবার ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম। সেই ভোরটিতে চারিদিক ছিল কুয়াশায় ঢাকা, আর বৃষ্টিও শুরু হয়ে গিয়েছিল তার সঙ্গে।

এখন আমি রেলওয়ে স্টেশনে। বাইনোকুলারটি দিয়ে কিছু দেখার উদ্দেশ্যে, অনেক দূরের সৈনিকদের জন্যে উৎসর্গিত মনুমেন্টের সামনের বালিয়াড়ির চরটি বেছে নিলাম। আধঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওই যন্ত্রটি দিয়ে দূরের আরও অনেক জিনিস দেখতে থাকলাম। এরপরে কুয়াশায় সব কিছু ঝাপসা হয়ে এলে, বাইনোকুলার যন্ত্রটি সরিয়ে রেখে, সাদা চোখে, সামনের ফলের ঝোপঝাড় ও গাছপালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনটা একটু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

যাই হোক, এর মধ্যে আমাদের বজরার অঞ্চলটিতে হয়তো তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটেনি। সেখানে এসে নোঙর করা দুটি ছোট আকারের যুদ্ধ-জাহাজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। গাংচিলরাও যথারীতি উড়তে উড়তে তাদের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া এই সব পাখিদের আর অন্য কীই বা করার থাকতে পারত?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নোঙর ফেলার জায়গাতে একই জাহাজগুলি আগের মতোই নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে। এগুলি কিন্তু সুইডেন বা অন্য কোনও নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ ছিল কি না, তা বলা সহজ নয়। আর মাটি কাটার ড্রেজার যন্ত্রটি হয়তো তেমন বিশেষ কিছু কাজ করে উঠতে পারেনি।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলেছে যে, আবহাওয়া ক্রমশ আরও ভাল হয়ে উঠবে। এবার আবার একবার সেই পুরনো যাত্রার নতুন প্রস্তুতি শুরু হল। লোকে বলে, যুদ্ধে নয়, গৃহাভিমুখে যাত্রা। মা আমার কার্ডবোর্ডের সুটকেসটি বাঁধাছাঁদার কাজে আমাকে সাহায্য করতে লাগলেন।

পুরো দমে বাক্স প্যাক করার কাজে লেগে পড়লাম। বাঁধানো কিছু ছবি, ফ্রেম থেকে খুলে ফেললাম। আর যেহেতু এ ছবি নিয়ে যেতে আমাকে কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি, তাই এগুলি ঢুকিয়ে দিলাম বাক্সের একেবারে নীচে। একটা ছবিতে বাবাকে দেখা যাচ্ছে সবার ওপরে, আর নীচে রয়েছে তার প্রিয় লোকোমোটিভ ইঞ্জিনটি, যার থেকে কোনওকালেই ধোঁয়া উঠেনি।

এরপরে এল জামা, গেঞ্জি, আন্ডারওয়ার প্রভৃতির বান্ডিল ঢোকানোর পালা। তার সঙ্গে আছে রোজকার ঘটনা লিখে রাখার ডায়রি, কলম ইত্যাদি, যেগুলি আমি অবশ্য পরে কিছু ছবি ও চিঠির বান্ডিলসুদ্ধ হারিয়ে ফেলি। আরও এসে হাজির হল বেশ কিছু হাবিজাবি জিনিস প্যাক করার জন্যে, সেই একই রকম প্যাকিংয়ের কাজ বারবার চলতে থাকছে। কে আমাকে নতুন কিছু সুসংবাদ সরবরাহ করবে, নতুন কোনও পথ দেখাবে?

আর এরপরে বেড়াল ও ইঁদুরকে নিয়ে যা-সব আরম্ভ হয়েছিল, তা আমাকে আজ পর্যন্ত পাঁকাল পুকুরের এক অসহায় ডুবুরির মতো কষ্ট দিচ্ছে। যদিও আমি প্রকৃতিকে এড়িয়ে চলি, তথাপি সংবাদ-সমীক্ষার ফিল্মগুলি আমাকে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিছু চতুর ও ভয়াবহ মুখ দেখাতে থাকে। আর সাপ্তাহিক সংবাদ পরিক্রমার ফিল্মগুলি, রাইন নদীতে কিংবা হামবুর্গ বন্দরের কাছাকাছি অঞ্চলের, জলে ডুবে থাকা জাহাজগুলি কীভাবে জলের ওপরে তুলে আনার বীরত্বমূলক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে শুধু সেইসব দেখায়।

ফিল্মগুলি সংবাদ দিয়ে জানাচ্ছে যে, কীভাবে সুড়ঙ্গ-বাংকারগুলি ডিনামিট ফাটিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে, আর যেসব কার্যক্ষম মাইন এখনও এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে, সেগুলি কীভাবে উদ্ধার করার কাজকর্ম চলছে। এইসব কাজে রত কর্মীরা, আলো লাগানো হেলমেট মাথায় ঝুলিয়ে বাংকারের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তলায় খোঁজাখুঁজি করার পর ওপরে উঠে এলে, অন্য সহকর্মীরা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে তাদের হেলমেটগুলি খুলে দিচ্ছে। আমাদের মালকেও দেখছে এসব, কিন্তু তার কোনও ইচ্ছে নেই, লাইটারের আগুন দিয়ে সিনেমা হলের স্ক্রিনটা পুড়িয়ে দিতে। এ কাজটি হয়তো অন্য কাউকে করতে হবে।

এর পরে, আমাদের শহরে কোনও সময়ে একটি সার্কাসের দল হাজির হলে, আমার মনে হল এদের সঙ্গে হয়তো একত্রে কিছু একটা করা যেতে পারে। কারণ, আমি এই দলটিকে আগে থেকেই চিনতাম। এই দলের কয়েকজন ক্লাউনের সঙ্গে, আলাদা করে কথা বললাম, একটা প্রস্তাবও দিলাম। কিন্তু কথাবার্তা বলে দেখলাম যে, এই মানুষগুলির মধ্যে কোনও মেজাজ বা হিউমার নেই। আর তারা জানাল যে, মালকে নামে আমার কোনও বন্ধুকে তারা জানে না বা চেনে না, সেই কারণে তারা মালককেকে ক্লাউন হিসেবে তাদের দলে নিতেও চায় না।

এই প্রসঙ্গে আমার বলা উচিত যে, ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে আমি একবার দক্ষিণ জার্মানির রেগেন্সবুর্গ শহরে একটি মিটিংয়ে আমন্ত্রিত হই। সেখানে গিয়ে আমি কিছু অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের সঙ্গে দেখা করি, যাঁরা মালকের মতোই নাইট-ক্রস উপাধিতে ভূষিত হন।

কিন্তু কর্মকর্তারা আমাকে হলের মধ্যে প্রবেশ করতে দিলেন না। তখন হলের মধ্যে জার্মান মিলিটারি ব্যান্ডের বাজনা বাজাচ্ছিল কিংবা বাজনার মাঝখানে একটা বিরতি করছিল। এই রকম একটি বিরতির ফাঁকে, ওখানে কর্তব্যরত একজন লেফটানেন্টকে মালককেকে একবার ডেকে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করলাম। লেফটানেন্ট, মাইক্রোফোনে ঘোষণা করলেন, সারজেন্ট মালককেকে অনুরোধ করা হচ্ছে, দয়া করে হলেতে একবার প্রবেশ করার জন্যে।

মালকে কিন্তু এ অনুরোধ গ্রহণ করল না, সে সেখানে হাজির হল না, আমার সঙ্গে তার দেখা হল না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও